মানব মন

শেষ পাভলভ সংখ্যা

মনোবিজ্ঞান - জীববিজ্ঞান - সমাজবিজ্ঞানের
আধুনিক ধারা পরিচায়ক ত্রৈমাসিক পত্র

অক্টোবর ১৯৬২

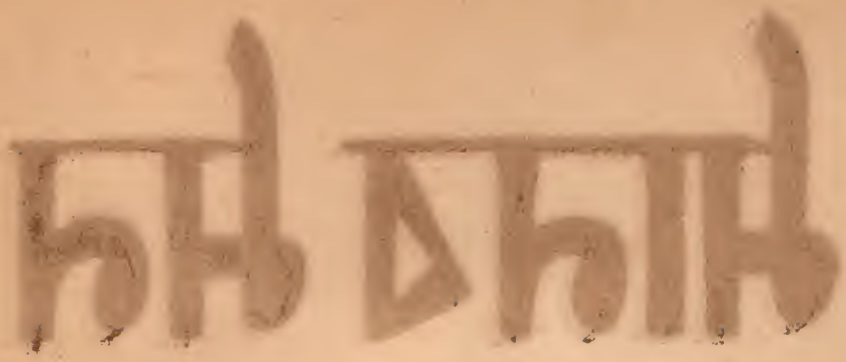

মানবমন
২য় বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা
অক্টোবর ১৯৬২

সূচীপত্র

১। শ্রদ্ধার্ঘ্য ১
২। মানবমনের ক্রমবিকাশ (২) —মনোবিৎ ২
৩। পুরাতনের নব মূল্যায়ণ —সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার ১১
৪। মনের কথা (৩) —দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৯
৫। মনোবিৎ এর ডায়রী থেকে (১) ২২
৬। আমেরিকা ও সোবিয়েত-এর শিক্ষক —প্রমোদ সেনগুপ্ত ২৯
৭। যুদ্ধ, শান্তি ও মানবমন : সম্পাদকীয় - ৪১
মানসিকতার রূপায়ণে ইতিহাসের ভূমিকা (২) —মোহাম্মদ আবদুল করিম ৪৯
৮। শিল্পজ্ঞী সম্পর্কিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও কোয়েলারের মতবাদ —আই, পি, পাভলভ ৬০
৯। মনস্তত্ত্ব ও স্বপ্ন সমীক্ষা সম্পর্কে ফ্রয়েড ও পাভলভ —তরুণ চট্টোপাধ্যায় ৬৪
১০। সম্রাট—নাটক —ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৭০
১১। পরিভাষা . . . . . ৭০-৭২ (১-৪২) কম
১২। ১ম থেকে পঞ্চম সংখ্যায় সূচীপত্র . . . . . স্বগ

নিয়মাবলী

১। মানব-মন ত্রৈমাসিক পত্রিকা। প্রতি বৎসর জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই ও অক্টোবর মাসে ইহা প্রকাশিত হয়।

২। প্রতি সংখ্যার মূল্য ১৲ টাকা। সডাক প্রতি সংখ্যা ১'২০ নয়া পয়সা।

বার্ষিক গ্রাহকগণের ক্ষেত্রে সডাক ৪৲টাকা অগ্রিম দেয়।

৩। চেক্, ড্রাফট, পোষ্টাল অর্ডার, মণি-অর্ডার ইত্যাদি PAVLOV INSTITUTE & HOSPITALS এই নামে প্রদেয়।

৪। এজেন্সি বা ব্যবসায় সংক্রান্তশর্তাদির জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :—

৫। গ্রাহকদের কাগজ অতিরিক্ত রেজেষ্ট্রি খর খরচা না দিলে বুক-পোষ্ট 'আণ্ডার সার্টিফিকেট অব্ পোষ্টিং'এ পাঠান হয়।

পাভলভ ইন্‌ষ্টিটিউট
১৩২/১এ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

অনিবার্য কারণে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখাটি ছাপানো সম্ভব হল না

আগামী সংখ্যা [জানুয়ারী, ১৯৬৩] 'মানব-মন' আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পন করবে। কার্যত আগামী সংখ্যা হবে সপ্তম সংখ্যা। কেননা ১৯৬১তে দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বর্ষের জন্য যে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তার একটা আভাস পাঠকদের জানাচ্ছি। মনরোগের প্রতিরোধ চিকিৎসা—(রোগীর ইতিহাস সমেত)—এই পর্যায়ে ধারাবাহিকভাবে লিখবেন অভিজ্ঞ চিকিৎসকমণ্ডলী। এই সূত্রে ফ্রয়েডীয় সমীক্ষা-পদ্ধতির অসঙ্গতি নিয়ে আলোচনা করা হবে। মস্তিষ্কের কার্যকলাপ ও সংগঠন, (Anatomy & Physiology of Brain) সম্পর্কে নিয়মিত প্রবন্ধ যাতে থাকে—সে চেষ্টা করা হচ্ছে। পাঠক বিভাগ খোলা হচ্ছে,—পাঠকদের জিজ্ঞাসার উত্তর দেবার জন্য। পৃথিবীর বিশিষ্ট জীব-বিজ্ঞানী ও মনো-বিজ্ঞানীদের পরিচিতির জন্য একটি নতুন বিভাগ খোলার কথা হয়েছে।

জানুয়ারী সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ হবে ডাঃ সুন্তোষ কুমার দাসের 'মস্তিষ্কের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ' সম্পর্কিত সহজবোধ্য আলোচনা সবিতা মুখোপাধ্যায়ের—"কলতুর্সি সংবাদ" ও অরুণ চক্রবর্তীর 'টেলিপ্যাথি'। এছাড়া অধ্যাপক সুধীরচন্দ্র রায়ের শিক্ষাবিষয়ক একটি প্রবন্ধ থাকবে। স্থানাভাব বশতঃ এ সংখ্যায় এ লেখাগুলি প্রকাশ সম্ভব হল না।

সম্পাদক, মানব-মন

OUR MEDICAL SPECIALITIES OF

INDIGENOUS DRUGS ARE PRESENTED WITH
THE EARNEST HOPE THAT THEY ADD
TO THE MODERN ARMAMENTARIUM
AGAINST DISEASE

THE HIMALAYA DRUG CO.

BOMBAY-2

তাঁর অফুরন্ত কর্মশক্তি
আমাদের পাথেয় হউক

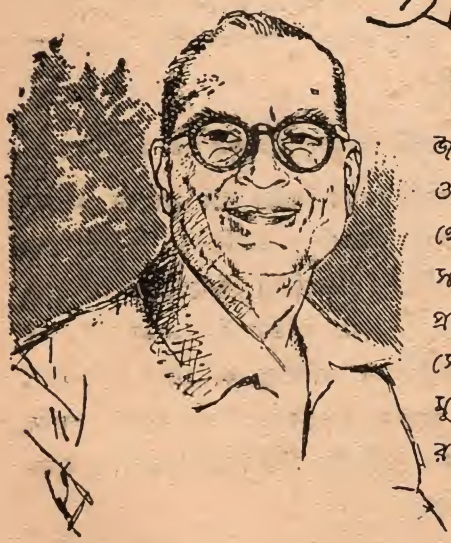

"কঠোর শ্রম ও ধৈর্যের দ্বারা কি লাভ করা যায় তা জন্য যদি কোন উদাহরণের প্রয়োজন হয় আমি সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেডের নাম উল্লেখ করবো। ছোট অবস্থা থেকে এই প্রতিষ্ঠান আজ অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত এক বিরাট কারখানায় পরিণত হয়েছে। বিদেশে প্রস্তুত সবচেয়ে সেরা কালির যে গুণগত উৎকর্ষ সুলেখা সেই গুণের অধিকারী। এই প্রতিষ্ঠান আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণে সাহায্য করছে। আজকে তাঁদের এই রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

বিধান চন্দ্র রায়

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ

স্নিগ্ধ আনন্দঘন দিনের স্বপ্ন সত্যি হোক

আকাশের আগুন-জ
রোষ দেখেছিলে
—খাল বিল সব
শুষে নিল, মাঠের
এক কণা সবুজও
অবশিষ্ট রাখল
না। সেই খ্যাপা
আকাশের মুখে
আবার কে কালি
লেপে দিল—
শ্রাবণের বুকে এত
কান্না ছিল কে
জানত? এবার
দেখো তো,
পেঁজা তুলোর মেঘে
একাকার আকাশ,
মধুমতী নদীর
বুকে ছায়াটিও
কাঁপেনা!
শরৎ এসেছে! সঙ্গে
নিয়ে এসেছে
স্নিগ্ধ, আনন্দ-ঘন
দিনের স্বপ্ন।
ঘরে ঘরে সেই স্বপ্ন
সত্যি হোক।

পূর্ব রেলওয়ে

বহুদিনের ঐতিহ্যপূর্ণ প্রবাসের একমাত্র
বাংলা মাসিক পত্র

উত্তরা

সম্পাদক—সুরেশ চক্রবর্তী

বার্ষিক সডাক—৫৲
উত্তরা কার্যালয়
বারাণসী

সাহিত্য, সঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক সমবায় সমিতি লিঃ
কর্ত্তৃক পূজাসংকলন

আনন্দ ধারা

২·০০

সম্পাদক—
শিশির সেন

প্রাপ্তিস্থান—
আনন্দ পাবলিশার্স
১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২
ফোন নং ৩৪-৬৮৯৬

With the best Compliments of—

DASS PRESS

166, KESHAB SEN STREET,
CALCUTTA-9

With the best Compliments from—

Clarion Book Agency.

Book Sellers, Publishers and
Stationers.
CALCUTTA—4.

বাড়ী থেকে মাল আনা, আবার পৌঁছে দেওয়া

আপনি জানেন কি, যে কলকাতার দক্ষিণ পূর্ব রেলপথের পক্ষ থেকে, বাড়ী থেকে মালপত্র সংগ্রহ করা এবং বাড়ীতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

প্রচলিত ভাড়ার ওপরে সামান্য কিছু অতিরিক্ত মূল্য দিলেই আপনিও এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন।

এই রেলপথের অনুমোদিত প্রতিনিধি — শ্রীবাচরাজ আগরওয়ালা, ১৭, কাশীনাথ মল্লিক লেন, রুম নং ২২, কলকাতা-৭ এই ঠিকানায় (ফোন নং ৩৪-৭১০৩) ২৪ ঘণ্টা আগে একটু লিখে জানালেই সমস্ত ব্যবস্থার সুবিধা আপনার জন্যে তৈরী থাকবে।

বিশদ বিবরণের জন্যে নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ

১। চীফ পার্সেলস এণ্ড লাগেজ ইন্সপেক্টর (পার্সেলস ট্রাফিক), হাওড়া (ফোন ৬৬-৩৪১১, এক্সটেনশন-৯)

২। স্টেশন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট (গুডস ট্রাফিক), শালিমার (ফোন নং ৬৭-২৮০৬)

৩। চীফ কমার্শিয়াল সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের অফিস, রোড ট্রানসপোর্ট সেক্সন, রঞ্জি ষ্টেডিয়াম, ইডেন গার্ডেনস, কলিকাতা-২১ (ফোন ২৩-২৯৩৬)

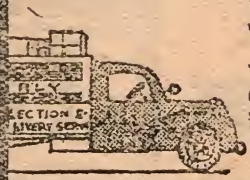

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

medium

অত্যাশ্চর্য্য গুণাবলী

মহাভৃঙ্গরাজ তৈলের বহুবিধ গুণাবলী সত্যই আশ্চর্য্যজনক।

ইহা যে শুধু কেশের পক্ষেই উপকারী তাহা নহে, মস্তিষ্কের পক্ষেও পরম হিতকর।

সাধনার মহাভৃঙ্গরাজ তৈল

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড কলিকাতা- ৫৮

কলিকাতাকেন্দ্র—ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম, বি, বি, এস, (কলিঃ) আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য

SA 5/60

অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ. আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ, সি, এস, (লণ্ডন) এম, সি, এস,(আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

সুঠাম সুন্দর দেহ

গড়ে তুলতে

লক্ষ্মীঘি

অপরিহার্য্য

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী • কলিকাতা-১২ • ফোন ২২-৭২৪৩

— মস্কো থেকে বাংলা বই —

সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ
০·৮৭

কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্
উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে
১·৫০

কার্ল মার্কস
ভারতীয় ইতিহাসের কালপঞ্জী
০·৮৭

ভি, আই, লেনিন
প্রাচ্য জনগণের মুক্তি আন্দোলন
১·৫৬

॥ সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে ॥

সোভিয়েত ইউনিয়ন ঃ আজ ও আগামীকাল
১·৫৬

সোভিয়েত দেশের পরিচয়
২·২৫

সোভিয়েত ইউনিয়নে লোকশিক্ষা
০·২৫

সোভিয়েত ইউনিয়নে স্বাস্থ্যরক্ষা
০·৩১

সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যক্তি স্বাধীনতা
০·৫০

সোভিয়েত সাহিত্য

ম্যাকসিম গোর্কি		এলেক্সি তলস্তয়	
আমার ছেলেবেলা	১·৫০	খোঁড়া রাজকুমার	১·৪৪
পৃথিবীর পথে	২·৫৬	আএলিতা	১·৩৭
পৃথিবীর পাঠশালায়	১·৫০	গল্প ও উপন্যাস	১·৮৭
মানুষের জন্ম	১·১২	রসিদফ	
ইতালির রূপকথা	১·৫০	বিজয়ী	০·৮১

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

১৭২, ধর্মতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা-১৩

নাচন রোড, বেনাছিটি
দুর্গাপুর

পূজোয় চাই

নতুন জুতো

Bata

With best Compliments from—

Central Camera Co. Private Limited.

Bombay - Calcutta - Madras - New Delhi

মালতী সিনেমা যাচ্ছে..

কোনও ভালো ছবি দেখতে সে ভুল করে না। মালতীর পরিচ্ছদ আড়ম্বরহীন, কিন্তু দৃষ্টি-আকর্ষক। অতি সযত্নে সে তার প্রসাধন সামগ্রী নির্ব্বাচন করে, তাই তার স্বাভাবিক কমনীয় গৌরবর্ণের সাথে প্রসাধন তাকে আরও রমনীয় করেছে। মালতী প্রসাধনের ভিত্তি হিসেবে বোরোলীন ব্যবহার করে কারণ সে জানে, বোরোলীন শুধু মাত্র প্রসাধন নয়—ত্বকের উপযুক্ত খাদ্যও!

বোরোলীন

প্রতিষেধক, উন্নততর স্নিগ্ধ ও কমনীয় সৌন্দর্য্য প্রসাধন—ইহা মৃদু সুগন্ধি যুক্ত এবং ল্যানোলীন সংযোগে প্রস্তুত।

প্রস্তুতকারক —

জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাইভেট লিঃ

১১।১, নিবেদিতা লেন,
কলিকাতা—৩

সংক্রমণ প্রতিরোধে নির্ভরযোগ্য

কাটা-ছেঁড়ায়, পোকার কামড়ে আশুফলপ্রদ, কুলকুচি ও মুখ ধোয়ায় কার্যকরী। ঘর, মেঝে ইত্যাদি জীবাণুমুক্ত রাখতে অত্যাবশ্যক।

এ্যানটল

৫৫, ১২০, ৪৫০ মিলি বোতলে

৪·৫ লিটার টিনে পাওয়া যায়।

বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী।

সম্পাদকীয় উপদেষ্টামণ্ডলী

ডাঃ রুদ্রেন্দ্র কুমার পাল
ডাঃ সুধীন বন্দ্যোপাধ্যায়
ডাঃ অজিত দেব
ডাঃ সন্তোষ দাস
ডাঃ সন্তোষ বোস
ডাঃ বিনয় ভট্টাচার্য
ডাঃ নরেশ গঙ্গোপাধ্যায়
ডক্টর অরুণা হালদার
ডক্টর জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য
শ্রীগোপাল হালদার
শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
ডাঃ জ্যোতির্ময় শর্মা
ডাঃ সোমনাথ মুখার্জি

কার্য নির্বাহক সমিতি ঃ

সুভাষ রায়—কর্মসচিব

নৃপেন নাগ — গুরুদাস লস্কর
অজিত নিয়োগী — দেবকুমার দে
দিলীপ ভট্টাচার্য
সবিতা মুখোপাধ্যায়—অফিস সম্পাদিকা

দেশ-বিদেশের খবরের জন্য
নিয়মিত পড়ুন

কথাবার্তা

সমসাময়িক ঘটনাবলী এবং সামাজিক ও অর্থনীতি বিষয়াদি সম্পর্কিত বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা। গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধাদিও নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

বার্ষিক—৩-০০ ঃ ষাণ্মাসিক—১-৫০

বসুন্ধরা

গ্রামীণ অর্থনীতি, কৃষি ও সমবায় সম্বন্ধীয় বাংলা মাসিকপত্র।
বার্ষিক—৩-০০

শ্রমিকবার্তা

শ্রমিক-কল্যাণ সংক্রান্ত বাংলা-হিন্দী পাক্ষিক-পত্রিকা
বার্ষিক—১-৫০

উইকলি ওয়েষ্ট বেঙ্গল

পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ও বিশ্বের সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক—৬-০০ ঃ ষাণ্মাসিক—৩-০০

[বিঃ দ্রঃ—(১) চাঁদা অগ্রিম দেয় ; (২) বিক্রয়ার্থ ভারতের সর্বত্র এজেন্ট চাই ; (৩) ভিঃ পিঃ ডাকে পত্রিকা পাঠান হয় না]

প্রচার অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা-১

এই ঠিকানায় গ্রাহক হইবার জন্য পত্র লিখুন

চতুষ্কোণ

ত্রৈমাসিকী আলোচনী

পূজাসংখ্যার প্রায় তিনশত পৃষ্ঠা খ্যাতনামা লেখকদের রসরচনা সম্ভারে সমৃদ্ধ। দাম—দু টাকা।

ন্যাশনাল পাবলিশার্স
২০৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

আইভান পেত্রভিচ পাভলভ

(সেপ্টেম্বর ১৮৪৯—ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬)

'মানব মন'-এর এই সংখ্যা আইভান প্রেত্রভিচ পাভলভের স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত।

জীবনের সুদীর্ঘ ষাট বৎসর কাল পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তথ্যসংগ্রহ দ্বারা জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ ও সমুন্নয়নের জন্য আইভান পেত্রভিচ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন বিজ্ঞানসেবী মহলে। জীবিত প্রাণীর শারীরবৃত্তিক গবেষণায় পাভলভ-উদ্ভাবিত নতুন পদ্ধতির প্রয়োগে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে; এর জন্য বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গবেষকগণ চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন।

অহংবাদ, রহস্যময়তা, অজ্ঞেয়তা ও অলীক-কল্পনাবাদ—মানবের অগ্রগতির প্রতিবন্ধক ও মানবতাবিরোধী। 'সাবজেক্টি-ভিজম' বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার পরিপন্থী ও মানুষে মানুষে বিভেদসৃষ্টির সহায়ক। তথ্যভিত্তিক পাভলভ বিজ্ঞান এই সমস্ত অবিদ্যা ও অপজ্ঞানকে দূরীভূত করে মানবমনে সহৃ-দয়তা, সহযোগিতা, সমদর্শিতার ভাব উন্মেষণে সক্ষম। জাতি, শ্রেণী ও ব্যক্তিগত প্রাধান্য-প্রচারক মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের অসত্যতা প্রমাণে ও এই সব তত্ত্ববাগীশদের স্বরূপ উদ্ঘাটনে পাভলভ নির্দেশিত পন্থা ও পাভলভ আবিষ্কৃত মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের সূত্র বিজ্ঞানানুরাগী সমাজসেবীদের প্রধান সহায়ক।

পাভলভের জন্মদিনে, এই ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে, পাভলভকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

১৪ই সেপ্টেম্বর, কলিকাতা। 'মানব মন'-এর সম্পাদকমণ্ডলী ও কার্যনির্বাহক সমিতি।

মানব মনের ক্রমবিকাশ

[পাভলভের মতামত]

মনোবিৎ

(২)

পশুমন থেকে মানবমনের ক্রমবিকাশের ধারা নির্ণয়ে পাভলভ পশু-ব্যবহার নিয়ে নানা রকমের গবেষণা করেন। এই প্রসঙ্গে সমসাময়িক বিশেষজ্ঞ আমেরিকান ইয়ারকস্ (Yerkes) ও জার্মান কোয়েলার (Koehler)-এর সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নামতে হয়। এর বিবরণ গত সংখ্যার 'মানব মনে' প্রকাশিত হয়েছে। ইয়ারকস কোয়েলারের বক্তব্য ছিল এই রকম : কণ্ডিশন্ড রিফ্লেক্স তত্ত্ব দিয়ে কুকুরের ব্যবহার আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি বটে, কিন্তু বানরপ্রজাতির জটিল ব্যবহারের ব্যাখ্যায় ঐ তত্ত্ব অচল। শিম্পাঞ্জিদের ব্যবহার শুধু কণ্ডিশন্ড রিফ্লেক্স অনুষঙ্গের অধীন নয়, মানুষের এই নিকট জ্ঞাতি অন্ততঃ আংশিকভাবে মানুষের অন্তর্দৃষ্টি শক্তির অধিকারী। এই শক্তি মানুষের ও উচ্চতর প্রাণীর অনায়াসলব্ধ স্বাভাবিক ধর্ম। এ-ধর্ম বিবর্তন বা ক্রমবিকাশের ফল নয়। কুকুরের উপর পাভলভের পরীক্ষানিরীক্ষার ফলাফল অগ্রাহ্য করার উপায় ছিল না, কাজেই তাঁরা বানর প্রজাতিকে সম্পূর্ণ আলাদা একশ্রেণীর পশুরূপে অভিহিত করার চেষ্টা করলেন। উদ্দেশ্য, দ্বয়বাদী ধ্যানধারণাকে বানর-প্রজাতির ক্ষেত্রে, অন্তত: মানবমনের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করা। তাঁরা বললেন—বিবর্তনমূলক-ব্যাখ্যা [শারীরবৃত্তিক অনুষঙ্গ দিয়ে মনের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ বুঝবার চেষ্টা] এক্ষেত্রে অচল। চৈতন্যের আকস্মিক উন্মেষ বিধিদত্ত অন্তর্দৃষ্টির ফল : এখানে মস্তিষ্ক-ধর্ম অপ্রযোজ্য। 'আত্মা-পরমাত্মার' আধিপত্য বজায় রেখে বিজ্ঞানের অনস্বীকার্য প্রত্যয়গুলোকেও মেনে নিতে গেলে এই ধরনের দ্বয়বাদ দর্শনের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। এই সম্পর্কে পাভলভের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। "The Yerkes-Koehler attack came at a time when we have just begun more or less to liberate ourselves from dualism. The human mind has for la ong time been a prisoner of idealistic concepts." দ্বয়বাদ দর্শনের প্রভাব অপরিসীম। 'ডুয়ালিষ্টিক ওআর্ল্ড আউটলুক' [Dualistic World Outlook] এখনও পর্যন্ত অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের মন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আপাতঃদৃষ্টিতে দেহ-মন, বস্তু-ভাব, জৈব প্রয়োজন ও কান্তিবিদ্যা (aesthetics) ইত্যাদির মধ্যে যোগাযোগ আছে বলে মনে হয় না। মানবজাতির প্রধান ঐতিহ্য হিসাবে এ-ধারণা পুরুষানুক্রমিকভাবে আমাদের মধ্যে প্রবহমান। সুসংগঠিত সমস্ত ধর্মপ্রতিষ্ঠান এই দ্বয়বাদ দর্শনের পরিপোষক। পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রে, মন্দির-মসজিদ-গির্জার চত্বরে এই দ্বয়বাদী ধারণা নানাভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। অনেক মার্কসবাদীর মনেও এই ধারণার প্রভাব বিদ্যমান। এ ধারণার পরিপোষণার্থে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়। কারণ কি? শুধু ব্যক্তিগত বা প্রতিষ্ঠানগত পুরণো সংস্কারের প্রতি মমতা? —না। জনসাধারণকে অজ্ঞান তিমিরান্ধকারে নিমজ্জিত রাখার মধ্যে শ্রেণীবিশেষের স্বার্থ আছে। "The scientist forfeits his claim to the proud title if he forgets that his general world outlook should not be brought into scientific thought" (Pavlov),

কণ্ডিশনড রিফ্লেক্স আশ্রিত পাভলভীয় প্রত্যয় দ্বয়বাদী ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত ও ঐ ধারণাকে যুক্তি-দ্বারা খণ্ডন করতে সক্ষম। পাভলভীয় প্রত্যয় অনুযায়ী মস্তিষ্ক বস্তুর উচ্চতম সাংগঠনিক বিন্যাস ; ক্রম-বিবর্তনের ফলে বস্তুর এই জটিল বিন্যাসে ঘটেছে নতুন গুণের উন্মেষ, যাকে বলি মানসিকতা বা চৈতন্যের অভিব্যক্তি। পাভলভীয় প্রত্যয় একদিকে বস্তুবাদী অদ্বৈতবাদ-এর উপর প্রতিষ্ঠিত আবার অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা অদ্বয়বাদী ধারণাকে পরিপুষ্ট ও প্রমাণিত করতে সচেষ্ট। বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের ভিত্তি আজ পাভলভের গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও তথ্য দ্বারা সমৃদ্ধ ও সুদৃঢ়ীকৃত।

শিম্পাঞ্জীর উপর পরীক্ষানিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে বাধাবিঘ্ন অপসরণ করে খাদ্যবস্তু আয়ত্তে আনতে শিম্পাঞ্জী প্রথম দিকে অনেক ভুলভ্রান্তি করে অবশেষে হঠাৎ এক সময় সঠিক পন্থাটি বেছে নিয়েছে। সঠিক পন্থাটি বেছে নেবার প্রাক্কালে কিছুক্ষণ ধরে শিম্পাঞ্জী আপন মনে চিন্তা করে। ইয়েরক্স্, কোয়েলার ইত্যাদির মতে এই সময়ে শিম্পাঞ্জী সহসা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে—অর্থাৎ সঠিক পন্থাটি আবিষ্কার করে। তার চেষ্টা ও ভুলভ্রান্তির সঙ্গে, এঁদের মতে, এই জ্ঞান উন্মেষের কোন সম্পর্ক নেই। কণ্ডিশন্ড রিফ্লেক্সকে একটা যান্ত্রিক ব্যাপার [মস্তিষ্কের দুটি উত্তেজিত অংশের সংযোজন মাত্র] কল্পনা করার জন্য এই দ্বয়বাদী পণ্ডিতের দল ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তে উপনীত হন। পাভলভতত্ত্বের বিকৃত ব্যাখ্যার ঝোঁক শুধু এঁদের মধ্যে নয়, পরবর্তী কালে আরও অনেক মনস্তাত্ত্বিক ও শারীরতাত্ত্বিকদের মধ্যে দেখা যায়। গুরুমস্তিষ্কের বিশ্লেষণী ক্ষমতা ও নিস্তেজনা পদ্ধতি (Inhibitory process) সম্পর্কে সম্যক ধারণা ব্যতিরেকে উচ্চপ্রাণীর জটিল ও সূক্ষ্ম মস্তিষ্ক ক্রিয়ার, এবং বোধ ও চৈতন্যশক্তির বিকাশের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। পাভলভ নিজের গবেষণাগারে শিম্পাঞ্জীর উপর পরীক্ষা চালালেন, তাদের ব্যবহার ও নতুন বুদ্ধি উন্মেষ পদ্ধতির সমস্ত খুঁটিনাটি নিরীক্ষণ করলেন ও তারপর তাঁর সিদ্ধান্ত বিবৃত করলেন—"We found nothing, absolutely nothing, that had not already been studied by us on dogs. This is a process of association followed by analysis effected with the help of analysers and accompanied by an inhibitory process which facilitates differentiation and rejection of that which does not correspond to the given condition" এর বেশী কিছু নয়—বললেন পাভলভ ;—শিম্পাঞ্জীদের 'বুদ্ধিবৃত্তি' কুকুরদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের—একথার কোন ভিত্তি নেই। ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়ে সঠিক পন্থাটি বেছে নেওয়া—গুরুমস্তিষ্কেরই আনুষঙ্গিক ধর্ম [associative process]। বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ আকস্মিক রহস্যময় ঘটনা নয়। বারবার চেষ্টা করার ফলে ভুলভ্রান্তির সংশোধন ঘটে, মস্তিষ্কের বিশ্লেষণী ধর্ম ও নিস্তেজনা ক্ষমতার জন্য, ভুল পথগুলির ঘটে অবলুপ্তি ও পরে সঠিক অংশগুলির মধ্যেই শুধু সংযোজন স্থাপিত হয়। এ-সম্পর্কে এই সংখ্যার 'মানবমনে' প্রকাশিত পাভলভের নিজস্ব মতামত দ্রষ্টব্য।

পাভলভ কোয়েলারের 'ধ্যান থেকে অন্তর্দৃষ্টি লাভ' তত্ত্বকে নস্যাৎ করেছেন। তার মানে কিন্তু এ নয় যে শিম্পাঞ্জী চিন্তা করে না বা তার বুদ্ধি নেই। শিম্পাঞ্জী চিন্তা করে, কুকুরও চিন্তা করে। মানুষ ত করেই। বুদ্ধিও সবার আছে। চিন্তার ধারা ও জটিলতা এবং বুদ্ধির তারতম্য প্রাণীভেদে বিভিন্ন : এই হচ্ছে পাভলভের অভিমত। বিভিন্নতার কারণও অনুমেয়। শিম্পাঞ্জীর সামনের পা দুটো অনেকটা হাতের কাজ করে। পেছনের দুটো পায়ে ভর দিয়ে খানিকটা ভারসাম্যও বজায় রাখতে পারে শিম্পাঞ্জী। কুকুরের থেকে স্বভাবতঃই প্রকৃতির উপর আধিপত্য তার বেশী ও প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতাও বেশী। কাজেই

তার চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি কুকুরের চেয়ে বেশী বিকশিত। আর দ্বিতীয় সাঙ্কেতিকতন্ত্রের [বাক্‌যন্ত্র] দৌলতে —মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি অন্যান্য সকল প্রাণীর তুলনায় অনেক বেশী বিকাশপ্রাপ্ত। মানুষের চিন্তাশক্তির গুণগত পার্থক্যও লক্ষ্যণীয়। Verbal thinking—অর্থাৎ ভাষাভিত্তিক চিন্তা একমাত্র মানুষের পক্ষেই সম্ভব।

পাভলভ এই বুদ্ধি ও চিন্তাকরার ক্ষমতাকে রহস্যময়তা থেকে মুক্ত করে এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অনুসঙ্গ ও বিশ্লেষণ [association and analysis] করার ক্ষমতা যে-প্রাণীর যত বেশী সেই তত বেশী চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধির অধিকারী। চিন্তার ফলে শিম্পাঞ্জী বুদ্ধিমানের মত ব্যবহার করল—এর শারীরবৃত্তমূলক তাৎপর্য কি ? সংজ্ঞাবহ স্নায়ুর (sensory nerve) সংকেত ফলে গুরুমস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের উত্তেজনা ঘটে ; মস্তিষ্ক কেন্দ্রস্থিত বিশ্লেষণী ক্ষমতার দরুন কেবলমাত্র নির্দিষ্ট সংকেত নির্দিষ্ট অংশের উত্তেজনা ঘটায় ; নিস্তেজনাধর্মের দৌলতে অন্যান্য উদ্দীপ্ত অংশের উত্তেজনা হ্রাস পায়। তখন কেবল-মাত্র প্রয়োজনীয় উত্তেজিত অংশগুলির সংযোজন ঘটে ও ফলে চেষ্টাবহ স্নায়ু (motor nerve) উদ্দীপ্ত হয়ে পেশী ও গ্রন্থিকে সঙ্কুচিত করে। শিম্পাঞ্জী অভীষ্ট ফল লাভ করে। আমরা তার মধ্যে বুদ্ধির বিকাশ দেখতে পাই। কুকুরই হোক কি শিম্পাঞ্জীই হোক্—এদের মধ্যে দুধরনের মৌলিক চিন্তাপদ্ধতি লক্ষ্য করেছেন পাভলভ। প্রথম—কাজের মধ্য দিয়ে চিন্তা (thinking in action),—এ-সময় বহির্বাস্তবের ঘটনা ও বস্তুর সংজ্ঞাবহ প্রতিবিম্ব [sensory images of objects and events in external reality) নিয়ে সংশ্লেষণ বিশ্লেষণ চলে। দ্বিতীয়—স্মৃতির প্রতিবিম্বমূলক চিন্তা (Thinking in memory images)। এ-সময় বহির্বাস্তবে ঘটনা ঘটছে না, বস্তুও চোখের সামনে নেই। শুধু স্মৃতিতে পূর্ব উপলব্ধ অনুভূতির চিহ্নমাত্র আছে। শিম্পাঞ্জী এই স্মৃতির প্রতিবিম্বকে সংশ্লেষণ বিশ্লেষণ করতে থাকে। 'চেষ্টা ও ভুল' (Trial & error) এর মধ্য দিয়ে সঠিক যে পথটি মস্তিষ্কে তৈরী হয়েছিল—সেটি [বা পূর্ব অভিজ্ঞতা লব্ধ কোন পথের চিহ্ন] ভুল পথগুলিকে অবলুপ্ত করে স্মৃতিপথে ভাস্বর হয়ে ওঠে। আমরা বলি চিন্তার ফলে শিম্পাঞ্জীর বুদ্ধি খুলেছে। এই 'thinking in memory images'কেই কোয়েলারের-দল অন্তর্দৃষ্টি আখ্যা দিয়েছেন। উদ্দেশ্য তাঁর যাই থাক্, পাভলভ তাই বলতে বাধ্য হয়েছেন—"Koehler is a confirmed animist, he simply cannot be reconciled to the fact that this soul can be grasped by hand, brought to the laboratory, and the laws of its functioning can be ascertained on dogs. He does not want to admit this." অন্যত্র বলেছেন—"I am fully convinced that thinking is an association and I challenge anyone who disagrees with me to prove the contrary." মানব ও উচ্চপ্রাণী উভয়ের বেলাতেই 'মন' বহির্বাস্তবের ঘটনা ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কিত জ্ঞানের আধার। চিন্তার ফলেই জ্ঞান লাভ হয়। আবার চিন্তা মানুষ ও পশু উভয়ের বেলাতেই অনুষঙ্গ-পদ্ধতির ফল। বুদ্ধি হচ্ছে কাজের মধ্য দিয়ে চিন্তা,—এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী অনুষজ্ঞ, অর্থাৎ পূর্ব অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগানো হয়। মন কোনো substance বা বস্তু নয়। বস্তুবাদীরা কখনও সে-রকম বলেন না। মন একটা function, একটা গুণ বা ধর্ম,—গুরুমস্তিষ্কের ধর্ম। পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন (adaptation) ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই ধর্মের উন্মেষ ও ক্রমবিকাশ। মানবমন পশুমনের ক্রমবিবর্তনের ফল, কিন্তু বাক্‌ধর্মের দৌলতে

পশুদের অলভ্য নবগুণসমন্বিত। 'Mind is a most delicate correlation between the organism and the surrounding world'. পরিবেশের সঙ্গে জীবের প্রতিটি সম্পর্ক গুরুমস্তিষ্ক মাধ্যমে রক্ষিত, প্রতিটি অভিযোজন বা মানিয়ে নেওয়ার ব্যাপার গুরুমস্তিষ্কের উত্তেজনা, নিস্তেজনা, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, সম্প্রসারণ (irradiation) ও কেন্দ্রীভূতকরণ (concentration) ইত্যাদি প্রক্রিয়ার ফল। কাজেই 'মন'-এর মস্তিষ্কাশ্রিত সংজ্ঞা ছাড়া অন্য কোন রকম সংজ্ঞা অসম্ভব। এই হচ্ছে অদ্বয়বস্তুবাদেব মূল কথা ঃ দ্বয়বাদের সঙ্গে মৌলিক বিরোধও তার এইখানে। অদ্বয়বস্তুবাদীরা মানবমনকে কোনোক্রমে সংকীর্ণ বা মানসিক ধর্ম বিশেষভাবে নির্দিষ্ট বা সীমিত ও গণ্ডীবদ্ধ—এ কথা মনে করেন না। প্রযুক্তিবিদ্যা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, নীতিশাস্ত্র, সৌন্দর্যতত্ত্ব, সবই মস্তিষ্কের বিভিন্ন অবস্থার বহির্বাস্তবের সঙ্গে অভিযোজন ক্রিয়াও বহির্বাস্তবকে পরিবর্তিত করার প্রচেষ্টার ফল। জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বহির্বাস্তবকে পরিবর্তিত করে নতুন সমাজ তৈরী করছে, আবার সেই নতুন সমাজ মানব মনে নতুন ধর্ম, নতুন গুণ বিকশিত করতে সাহায্য করছে। সম্প্রসারিত হচ্ছে মানবিক ক্ষমতা, মহত্তর হচ্ছে মানসিকতা।

পাভলভের মতে পশুমন থেকে মানবমনের ক্রমবিকাশ মস্তিষ্কের অভিযোজন ক্রিয়ার ফল। ডারুইনের বিবর্তনবাদকে আর এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছেন তিনি। মানবমনের বৈশিষ্ট্য উন্মেষ—প্রাকৃতিক ও সামাজিক ঘটনা ঃ ঐশ্বরিক করুণা নয়। পূর্ণতাপ্রাপ্ত মানবমনের সূক্ষ্ম জটিলতার ব্যাখ্যাতেও রহস্যময়তা নিষ্প্রয়োজন।

এবার শিশুমন থেকে বয়স্ক মনের ক্রমবিকাশের আলোচনায় আসা যাক। পূর্বসংখ্যায় বলা হয়েছে কতকগুলি আনকণ্ডিশন্‌ড রিফ্লেক্স বা শর্তহীন পরাবর্ত নিয়েই মানবশিশু জন্মগ্রহণ করে। চোষা, গেলা, মলমূত্রত্যাগ—এ ক্ষমতাগুলো জন্মগত। খোঁচা দিলে আহত স্থান সরিয়ে নেওয়া, চোখের কাছে কোন কিছু নিয়ে গেলে চোখ বুঁজিয়ে ফেলা প্রভৃতি আদিম আত্মরক্ষামূলক রিফ্লেক্সগুলোও জন্মায়ত্ত। হাত পা চেপে ধরলে মুক্ত হওয়ার প্রবৃত্তিও আনকণ্ডিশন্‌ড রিফ্লেক্সের অন্তর্গত।

শিশুর প্রথম বোধশক্তির উন্মেষ ঘটে সংবেদন [sensation] থেকে। জন্মের পর প্রথম কয়েকদিন বহির্বস্তু সম্বন্ধে বোধ বা জ্ঞান থাকে না, থাকে শুধু সংবেদন। তারপর থেকে বহির্বাস্তবের অগণিত উদ্দীপনের সঙ্গে পূর্বোল্লিখিত শর্তহীন পরাবর্তের অস্থায়ী যোগাযোগ ঘটতে থাকে। প্রথম দিকটায় এই যোগাযোগ অনেকটা এলোমেলো ভাবে ঘটে। কতকগুলো উদ্দীপকের পুনর্বৃত্তি ঘটে, কতকগুলোর ঘটে না। যে-গুলোর ঘটে না, তাদের দরুন যোগাযোগ ক্রমশঃ নিস্তেজিত হয়ে মিলিয়ে যায় ; পুনরাবৃত্ত উদ্দীপকসৃষ্ট সংযোগসূত্র ক্রমশঃ দৃঢ় হতে থাকে। দুধের বোতল, ঝিনুক, মায়ের স্বর ও স্পর্শ—এগুলো পুনর্বৃত্ত হতে হতে ক্রমশঃ সুদৃঢ় যোগাযোগ স্থাপনে সমর্থ হয়। পরে দৃঢ়ভাবে সন্নিবিদ্ধ অংশগুলো ধারাবাহিকভাবে সংযুক্ত হয় ও গতিময় একটা বাঁধাধরা ছাঁচ গড়ে তোলে। এখন প্রান্তস্থ গ্রাহীযন্ত্র (peripheral receptors) উদ্দীপ্ত হলেই মস্তিষ্কের এই গতিময় সংযোজন প্রণালী কার্যকরী হয়ে ওঠে। এখন আর শুধু সংবেদন সৃষ্টি নয়, সংবেদনের প্রত্যক্ষ-করণের বা উপলব্ধির স্তরে রূপান্তরণ ঘটছে। Sensation থেকে perception। পূর্বার্জিত সংযোজকপ্রণালী প্রতিটি উদ্দীপককে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার সাহায্যে রূপান্তরিত করছে। গ্রাহীযন্ত্রধৃত প্রেরণাসমূহের এবার চলে আপেক্ষিক বিচার অর্থাৎ পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়। শিশু বোতল থেকে দুধ পেয়েছে আবার মায়ের বুক

থেকেও। এদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে সে চেষ্টা করে। একটা লাল ফুল ও একই আকারের লাল বলের মধ্যে মম্পর্ক নির্ণয় চেষ্টাও এই পর্য্যায়ে পড়ে। মা ও মায়ের মত দেখতে অন্যান্য মেয়েদের চেহারার পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় শিশুর অভিযোজন ব্যাপারে অত্যন্ত দরকারী। এরপর চলে বিশ্লেষণ ক্রিয়া ও পূর্ব অর্জিত সংযোজক প্রণালীর সঙ্গে সমন্বয় সাধন। আগে যে সম্পর্ক নির্ণয় প্রচেষ্টার কথা বললাম, সমন্বয় সাধন তারই শেষ ফল। তারপর সংশ্লেষণ (Synthesis)—নতুন সংযোজন; ফলে ঘটে ক্রিয়া বা প্রক্ষোভ অথবা দুইই: লাল ফুলটিকে হাত বাড়িয়ে ধরার চেষ্টা; মায়ের মত দেখতে মেয়েটিকে হাসি দিয়ে অভিনন্দন।

এইভাবে পুরণো অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন অভিজ্ঞতার বিচার ও ব্যাখ্যাই হচ্ছে প্রত্যক্ষকরণ বা উপলব্ধির মূল কথা। উপলব্ধির মারফত বহির্বাস্তবের সঙ্গে পরিচয় ঘটতে থাকে। যতদিন যায় পরিচয় নিবিড় হয়, অর্থাৎ বহির্বাস্তবের জ্ঞান বাড়ে।

মনে রাখা দরকার কথা বলার ক্ষমতা লাভের আগে পর্য্যন্ত মানব শিশু ও পশুর উপলব্ধি সংক্রান্ত নার্ভ-তন্ত্রের প্রক্রিয়া একই রকম। তবে দুজনের পরিবেশের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। মানবসমাজে, বিশেষ করে নিজের পরিবারের মধ্যে শিশু বড় হয় ও এই অবস্থাতেই সমাজ ও পরিবারের অনুমোদিত রীতি-নীতি, ব্যবহার ও ভাবাবেগের অংশীদার হয়ে ওঠে। অবশ্য প্রথম সাংকেতিকতন্ত্রই এ পর্যন্ত শিক্ষার একমাত্র উপায়। বাক্‌শক্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। শিশু প্রথমে কথা বুঝতে শেখে তার পর বলতে শেখে। এইবার সে সত্যিকারের মানবীয় উপলব্ধির ক্ষমতা অর্জন করে। এখন থেকে, ভাষাভিত্তিক রিফ্লেক্স উপলব্ধির ক্ষেত্রে আনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। বাক্‌স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি শক্তির গুণগত ও মাত্রাগত পরিবর্তন ঘটে। পশু ও কথা ফোটেনি এমন শিশু কোনো বস্তুর যে-কোন একটি 'গুণ' বিশ্লেষণের সাহায্যে আলাদাভাবে বুঝতে পারে, কিন্তু তারা সেই গুণকে বিমূর্ত্ত করে অন্য বস্তুর উপর প্রয়োগ করতে অক্ষম। লাল, কাল, নীল তিন রঙের গুলি থেকে যে-কোন একটা রঙের গুলি (যেমন লাল রঙের) এরা বেছে আলাদা করতে পারে। [অবশ্য শেখানো হলে] কিন্তু লাল ফুল বা লাল লাঠি [অন্য ফুল বা লাঠি থেকে] সে আলাদা করতে পারবে না। গুলির 'লাল' রঙকে সে অন্য কোনো বস্তুর লাল রঙের সঙ্গে মেলাতে সক্ষম নয়। বুঝতে পারবে না যে এ দুটো রঙ এক। কোনো বস্তুর কোনো গুণ বা ধর্ম অন্য কোনো বস্তুতে আরোপ করতে পারার প্রধান শর্ত হল সেই গুণকে বস্তু থেকে বিমূর্ত করা। ভাষার সাহায্য ছাড়া এ ক্ষমতা লাভ অসম্ভব। শিশু যখন কথা বুঝতে ও বলতে শিখল, তখনই মাত্র কোনো বস্তুর বিভিন্ন গুণ বা ধর্মকে বিমূর্ত করতে বা পৃথক করতে শেখে। বাচনক্ষম শিশুকে লাল গুলি দেখিয়ে ও লাল ফুল বা লাল কাপড় দেখিয়ে যদি 'লাল' এই কথাটি বারবার বলি—তখন 'লাল' শব্দটি বস্তুর 'লালত্ব'কে বিমূর্ত করে। তখন যে-কোন জিনিসের 'লাল' রঙ সে চিনতে সক্ষম হয়। এক জোড়া তাস দিলে রুইতন ও হরতনকে আলাদা ভাবে গুছিয়ে রাখতে পারে। রঙের বেলায় যেমন বস্তুর—'ওজন' 'গন্ধ' 'আকার' ইত্যাদির বেলায়ও ঠিক তেমন। বার বার শ্রুতবাক্য [অথবা দৃষ্ট] দ্রব্যের গন্ধ-বর্ণ-রস-আকার ইত্যাদির সামান্যীকরণ ও বিমূর্তকরণ করে। গন্ধ-বর্ণ-রূপ-রস পঞ্চইন্দ্রিয়ের উপলব্ধির ব্যাপার, বাক্‌পূর্ব শিশু ও পশুর বহির্বাস্তবকে চেনবার জানবার ও তার সঙ্গে মানিয়ে নেবার উপায় নার্ভপ্রণালীর প্রথম

সাংকেতিক তন্ত্র। ভাষার উন্মেষ মানে মানবীয় গুণের বিকাশ। নার্ভপ্রণালীর ভাষাভিত্তিক তন্ত্রের নাম দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্র—এটা সম্পূর্ণভাবে মানবীয়।

বাক-পূর্ব উপলব্ধি ও বাক-লব্ধ উপলব্ধির পার্থক্য অসীম। এখন পঞ্চেন্দ্রিয় গৃহীত উপলব্ধি ক্ষমতা (ভাষার সাহায্যে বিমূর্ত ও সামান্যীকৃত হওয়ার ফলে) অনেক বেশী শক্তিশালী; বিচারশক্তি উন্নত, অনুভূতি সূক্ষ্মতর। বহির্বাস্তবের বিচিত্র জটিলতা অনুধাবন করা সম্ভব। মানবশিশুর কাছে 'গাছ', 'টেবিল', 'চেয়ার'—এ কথাগুলো দিয়ে কোনো নির্দিষ্ট বস্তু বিশেষকে বোঝায় না। হাজার রকমের গাছের, অনেক রকমের টেবিল চেয়ারের, কতকগুলো সাধারণ বা সামান্য গুণ-সমষ্টি—ঐ শব্দগুলির দ্বারা নির্ধারিত। নতুন ধরনের গাছ দেখলে শিশু এখন চিনতে পারে গাছ বলে। পশু বা বাক্-পূর্ব শিশুর তুলনায় বাক্‌পটু শিশুর-মস্তিষ্কের সংযোজন ক্ষমতা অনেকগুণ বেশী। 'গাছ' কথাটি পৃথিবীর সব গাছের সাধারণ গুণগুলোর সংকেত। কাজেই নির্দিষ্ট একটির স্থলে অনেক বেশী কণ্ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্স তৈরী এখন সম্ভব। শিক্ষার সুযোগ এখন আর সীমিত নয়। পশুত্বের স্তর থেকে মানবত্বের স্তরে উন্নয়নের মূলে এই ভাষার বিকাশ, দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের উন্মেষ। আর এই উন্মেষ কিছু রহস্যময় বা ঐশ্বরিক ব্যাপার নয়। ক্রমবিবর্তনের আশীর্বাদ। আদিম মানুষের দলবদ্ধ হয়ে উৎপাদন প্রচেষ্টার ফল।

মানবমনের ক্রমবিকাশের পর্যালোচনায় একটি কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কোন একটি ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধি ক্ষমতা প্রাণীবিশেষে মানুষের থেকে অনেক বেশী বিকাশ লাভ করতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো বস্তুর একটি গুণ অপর বস্তুতে আরোপ করতে বা অনুধাবন করতে মনুষ্যেতের প্রাণী অক্ষম। ঈগল পাখীর দৃষ্টিশক্তি প্রখর, কুকুরের ঘ্রাণশক্তি তীব্র, তা সত্ত্বেও তাদের উপলব্ধি-শক্তি মানুষের সমকক্ষ নয়। ভাষার দৌলতে মানুষ শুধু যে বস্তুর গুণাবলী বিমূর্ত করে দেখতে পারে তাই নয়, গুণধর্ম অনুযায়ী বস্তুর বিবরণ দিতে পারে, বস্তুকে প্রণালীবদ্ধ করতে ও তাদের গুণাগুণের তুলনামূলক বিচার করতে পারে। মানুষ বস্তুর ও প্রকৃতির বিবিধ ধর্মের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারে, তাদের পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারে ও দরকার হলে পরিবর্তন সাধন করতেও পারে। ইন্দ্রিয়লব্ধ উপলব্ধি বা জ্ঞানের সম্প্রসারণ, সম্মার্জন সম্ভব হয়েছে ভাষার জন্য। মানুষের সমস্ত ধ্যান ধারণা, জ্ঞান বুদ্ধি, বিচার বিবেচনা, দর্শন বিজ্ঞানের মূলে মস্তিষ্কের প্রথম সাংকেতিক তন্ত্র ও দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্রের সমন্বয়সম্ভূত বিশিষ্ট ধর্ম—উপলব্ধি।

উপলব্ধি বা perception অর্জিত ক্ষমতা। জন্মসূত্রে প্রাপ্ত মানবমস্তিষ্কের বিশেষ গঠনপ্রণালী ও ব্যক্তির সামাজিক জীবন, এই উপলব্ধির জনক। উপলব্ধিক্ষমতা 'মানুষ' নামক সকল প্রাণীরই আয়ত্তাধীন। সভ্যতার যে-কোন স্তরে, যে-কোন দেশেই থাকুক না কেন, মস্তিষ্ক স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে মানুষ এ ক্ষমতা অর্জন করবেই। তবে উপলব্ধির মাত্রা ও ধরন নির্ভর করবে প্রধানতঃ দুটি বিষয়ের উপর। একটি হচ্ছে যে-সমাজে শিশু বর্ধিত হচ্ছে, সেই সমাজের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মান, ও দ্বিতীয়টি শিশুর পরিবেশস্থ আকস্মিক ঘটনাসমূহ। এর একটিও কিন্তু অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বা জন্মসূত্রে পাওয়া নয়; একান্তই বহির্বাস্তবস্থিত। বহির্বাস্তবের পরিবর্তন উপলব্ধিকে পরিবর্তিত করে। মানুষে মানুষে বুদ্ধিমত্তার, চারিত্রিক গুণের ও মানসিকতার অন্যান্য যে পার্থক্য ও তারতম্য দেখা যায়—সে কিছু অন্তর্নিহিত বা জন্মদত্ত সূত্রে প্রাপ্ত

পার্থক্য নয়। সম্পূর্ণ পরিবেশগত ও আকস্মিক উদ্দীপকসঞ্জাত পার্থক্য। এ সবেরই পরিবর্তন সম্ভব ও বাস্তব পরিবেশের পরিবর্তন ও শিক্ষার মাধ্যমে এ-পরিবর্তন সাধন অনায়াসসাধ্য না হলেও আধুনিক বিজ্ঞানের আয়ত্তাধীন। পাভলভ অনুগামীরা এ নিয়ে অনেকে প্রাথমিক পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছেন; ফলাফল পাভলভীয় সিদ্ধান্তের অনুকূল। তবে মনে রাখা দরকার, মানব মনের বিবিধ জটিলতা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অভিব্যক্তি, প্রক্ষোভের বৈপরীত্য ইত্যাদি সব কিছু নিয়ে পরীক্ষার শেষ এখনও হয়নি; শেষ ফল পাওয়া যায়নি। বিজ্ঞানের কোন্ বিভাগেই বা তা হয়েছে? অন্ধকারাচ্ছন্ন অনেক বন্দর এখনও রয়েছে। তাই আজ ব্যক্তি-জীবনে আকস্মিক ঘটনাবলীর সংঘাত ও প্রভাবের বিকৃত ব্যাখ্যা সম্ভব; জীবনকে দৈবায়ত্ত কল্পনা করে তাই চলে চারিধারে রহস্য কুহেলি জাল-বোনার চেষ্টা। মানবমনের অশেষ বৈচিত্র্য নিয়েও বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষানিরীক্ষা চলতে পারে ও চলছে। এসবের ফলে পাভলভের মৌলিক সিদ্ধান্ত,—"সকল মানব মস্তিষ্কের শিক্ষাগ্রহণের ক্ষমতা সমান ও উপলব্ধি পরিবেশ সাপেক্ষ"—ক্রমশঃ দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।

মানব প্রকৃতির স্বরূপ জানবার পরীক্ষা প্রণালী আজ পাভলভপন্থী গবেষকদের আয়ত্তাধীন। মনের প্রতিটি ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মস্তিষ্কক্রিয়া আজ অনুধাবন-সম্ভব। মস্তিষ্ক-বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে মনোবিজ্ঞানের অগ্রগতির সম্ভাবনা বিপুল। দ্বয়বাদ কিন্তু দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত; ভাববাদী দর্শনের প্রধান স্তম্ভ হিসেবে মানবজাতির অগ্রগমনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে। যতদিন মনোবিজ্ঞান মস্তিষ্ক বা বস্তুচ্যুত হয়ে থাকবে, ততদিন নানা রন্ধ্রপথে প্রবিষ্ট হয়ে এই অন্ধ সংস্কার, ভ্রান্তবিশ্বাস ও ব্রহ্মবিদ্যা বিজ্ঞানের জয়যাত্রাকে ব্যাহত করবে। প্রাকৃতিক নিয়মে বস্তুর বিবর্তনে জটিল মানবমস্তিষ্কের সৃষ্টি; মনন ক্রিয়া এই মস্তিষ্কের ধর্ম:—আন্তর ও বহির্জগতের প্রতিফলন—এই বৈজ্ঞানিক সত্যের উপলব্ধি ও প্রয়োগের উপর নির্ভর করছে জাতিগত ও শ্রেণীগত বৈষম্যের নিরসন ও ব্যক্তিসম্পর্কের উন্নয়ন।

এবার পুরণো আলোচনায় ফিরে আসা যাক। বাক্‌স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধির গুণগত পরিবর্তন ঘটে একথা বলেছি। কারণ ভাষার বিমূর্ত্ত ও সামান্যীকরণ (য়্যাবস্ট্রাক্‌শন্ ও জেনরেলিজেশনের) ক্ষমতা। এই বিমূর্তকরণ ও সামান্যীকরণ ব্যাপারটি কি; তাও বলবার চেষ্টা করেছি। একটি শব্দ—কয়েকটি সাধারণ সমধর্মী গুণ ও বহু বিষমধর্মী গুণবিশিষ্ট একশ্রেণীর হাজার হাজার বস্তুর পরিবর্তে ব্যবহার হতে পারে। গাছের উদাহরণ দিয়েছি। পাইন গাছ, জাম গাছ, গোলাপ গাছ ও আকন্দ গাছের মধ্যে কিছু কিছু সমধর্মী গুণ বিদ্যমান আবার প্রতিটি গাছের বৈশিষ্ট্যও প্রচুর। গাছ বলতে কি বুঝি? লক্ষ লক্ষ শ্রেণীর গাছের কয়েকটি সাধারণ ও বিমূর্ত্ত গুণ। পাইন, জাম, গোলাপ, আকন্দ বিশেষভাবে কোনটাকেই বুঝি না। একেই বলা হয় ভাষার বা কথার সামান্যীকরণ ও বিমূর্ত্তকরণ। পঞ্চেন্দ্রিয়লব্ধ সঙ্কেতের চেয়ে অনেক বেশী নমনীয় ও সূক্ষ্ম এই ভাষার সঙ্কেত। অনেক রকমের জটিল ও সূক্ষ্ম কণ্ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্স এ দিয়ে তৈরী হয়, কাজেই অভিযোজন (adaptation) ক্রিয়া অনেক বেশী সূক্ষ্ম ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। আর একদিক দিয়ে বিষয়টি বিচার্য। মানুষের বেলায় ইন্দ্রিয় উদ্দীপনা তাৎক্ষণিক ক্রিয়ায় রূপান্তরিত না হয়ে বস্তুনির্দেশক কথার মাধ্যমে অন্যান্য সমার্থজ্ঞাপক বাক্যের সঙ্গে অনুষঙ্গ স্থাপন করে। তাই বাচনিক অনুষঙ্গের নিশ্চুপ ও আত্মগত রূপকে বলা হয় চিন্তা। আর বাচনিক অনুষঙ্গের ফলে বাক্যস্ফুরণকে বলা হয় কথার মাধ্যমে পারস্পরিক ভাব বিনিময়। এই অনুষঙ্গ—নির্বাকই হোক আর সবাকই হোক, মানুষকে চিন্তা বা পরামর্শদান কাজে উদ্বুদ্ধ করে। বাক্য শর্ত্তাধীন

সঙ্কেত হিসেবে মানুষকে একটি বিশেষ ঘটনার সামনে ভাবতে বা পরস্পরের সঙ্গে আলোচনার সময় দেয়। এইভাবে মানুষ অতীতের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে ভবিষ্যতের ফলাফলের কথা চিন্তা করে বর্তমানের কার্যক্রম স্থির করে। শুধু নিজের অভিজ্ঞতা নয়, হাজার হাজার বছর ধরে সঞ্চিত মানবজাতির অভিজ্ঞতাকেও মানুষ এইভাবেই কাজে লাগায়।

বন পথে বাঘের গন্ধ পেলেই হরিণ ভয়ে জ্ঞানশূন্য হয়ে যে-দিক দিয়ে গন্ধ আসছে, তার বিপরীত দিকে ছুটতে থাকবে। আর মানুষ (হরিণের মত স্বভাবভীরুদের কথা তুলছি না) চিন্তা করবে, 'বাঘ' শব্দটির আনুষঙ্গিত চিন্তার ধারা তার মনে আসবে, সঙ্গী থাকলে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবে—তারপর পূর্বঅভিজ্ঞতা অনুযায়ী ও বুদ্ধি বিবেচনা খাটিয়ে নিজেদের সামর্থ্যানুযায়ী একটা বিশেষ পন্থা বেছে নেবে। পালাবার চেষ্টা করতে পারে, গাছে উঠে আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও করতে পারে। আবার হাতিয়ার থাকলে সুবিধা মত জায়গায় দাঁড়িয়ে 'বাঘের' জন্য প্রতীক্ষাও করতে পারে।

বাক্-স্ফুরণ সামাজিক নিয়ম শৃঙ্খলার প্রভাবাধীন। মানুষের সমাজে না থাকলে শিশুর বাক্-স্ফুরণ হতে পারে না। পশুদ্বারা প্রতিপালিত হলে শুধু যে কথা বলতে শিখবে না, তাই নয়, বাচনভিত্তিক চিন্তা (মানুষের মত) করতেও পারবে না। যাকে আমরা 'মানবচৈতন্য' বলি, সে চৈতন্যের উন্মেষ হবে না।

শিশুমনের পরিণতি ঘটতে থাকে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। পরিবেশ ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হতে থাকে, জটিলতর হতে থাকে। মা-পিসীর আওতা থেকে কিণ্ডারগার্টেন, কিণ্ডেরগার্টেন থেকে স্কুল, স্কুল থেকে কলেজ কিম্বা কর্মস্থল। ক্রমশঃ উপলব্ধির ক্ষেত্রও বাড়তে থাকে। হাজার হাজার পুরনো কণ্ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্স ভেঙে পড়ে, নতুন রিফ্লেক্স তৈরী হয়। জ্ঞানের ভাণ্ডার বাড়ে, চৈতন্য বিকশিত হয় নানাদিকে, নানাবস্তু ও ভাবকে আশ্রয় করে।

পাভলভীয় বিজ্ঞানের মূল কথা এই যে: সংবেদন (sensation) বহির্বাস্তব ও মানবচৈতন্যের যোগসূত্র। সংবেদন ছাড়া উপলব্ধি বা চৈতন্য অসম্ভব। সংবেদন গতিশীল বস্তুর নিজস্ব ধর্ম। বস্তু ইন্দ্রিয় মাধ্যমে মস্তিষ্ককোশে স্পন্দন জাগায়। নার্ভ, মস্তিষ্ক, ইন্দ্রিয় সংস্পর্শ ছাড়া সংবেদন ঘটে না। আর এগুলো বস্তুর বিশিষ্ট বিন্যাস। শুরুতে সাব্‌কর্টেক্স (নিম্ন মস্তিষ্ক) ও কয়েকটি আন্‌কণ্ডিশন্‌ড রিফ্লেক্স কার্যকরী হয়। এ-অবস্থায় অভিযোজন ক্ষমতা অতিশয় সীমিত। তারপর গুরু মস্তিষ্কের (অবশ্য সামনের খণ্ড অর্থাৎ Frontal lobe ছাড়া) মাধ্যমে শর্তাধীন রিফ্লেক্স গড়ে ওঠে, ফলে অল্পসংখ্যক আন্‌কণ্ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্সের সংকেত দিতে থাকে বহির্জগতের অসংখ্য উদ্দীপক। বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের সাহায্যে পরিবেশকে নিখুঁতভাবে জানা সম্ভব হয়ে ওঠে ও মানিয়ে নেবার ক্ষমতাও বেড়ে যায়। এরপর গুরুমস্তিষ্কের সামনের খণ্ডে (Frontal lobe) বাচনিক রিফ্লেক্স ক্ষমতার উন্মেষ ঘটে। এর ফলে আমূল ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। জটিল ও সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণের সাহায্যে অভিযোজনের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পায়। এখন আর শুধু নিজেকে বহির্বাস্তবের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া নয়, বহির্বাস্তবকে—প্রকৃতিকে. সমাজকে—নিজের উপযুক্ত করে গড়ে নেবার ক্ষমতা লাভ করে মানুষ।

মানবমনের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে পাভলভীয় এই ধারণার মধ্যে অনুমানের স্থান নেই। সুদীর্ঘ ৩৫ বছরের ব্যক্তি নিরপেক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলের উপর প্রতিষ্ঠিত এই ধারণা। মনের জটিল ও সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম ক্রিয়াকলাপের অনেক দিক এখনও অনাবিষ্কৃত, তবে এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে গবেষণার পথ উন্মুক্ত হয়েছে, অগ্রগমনের বাধা হয়েছে অপসারিত।

ফ্রয়েডীয় ও পাভলভীয় ধারণার বৈসাদৃশ্য ও পার্থক্য আশা করি পাঠকদের কাছে অনেকটা পরিস্ফুট হয়েছে। কেবলমাত্র ফ্রয়েডীয় ধারণার বিপরীত বা বিরোধী ধারণাই নয় পাভলভ-বিজ্ঞান। পাভলভ আবিষ্কৃত মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের তথ্যাদি মনস্তত্ত্বের বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা সম্ভব করেছে। গুরুমস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের জ্ঞানের অভাব থেকেই ফ্রয়েডের অনুমানভিত্তিক নির্জ্ঞানতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ-দিক দিয়ে পাভলভ বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক প্রয়োজন মিটিয়েছেন। এই জ্ঞানাভাবের জন্য এযাবৎ মনস্তাত্ত্বিকরা সাধারণতঃ দুভাবে গবেষণা চালিয়ে এসেছেন। একদল গবেষণাগারে পশু বা মানব ব্যবহার সম্পর্কে অবজেক্টিভ পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে অসংখ্য তথ্য সংগ্রহ করে চলেছেন। এই গবেষণা মূলতঃ বর্ণনামূলক ও শ্রেণীবিভাজনমূলক, বিজ্ঞানের প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ। আর একদল (যাঁরা থিওরেটিকাল) অন্তর্দর্শনের (introspection) সাহায্যে অনুমাননির্ভর অধিবিদ্যামূলক (metaphysical) তত্ত্ব উদ্ভাবন করছেন। প্রথমোক্ত দলের গবেষণালব্ধ তথ্য ও দ্বিতীয়োক্ত দলের তত্ত্বের সঙ্গে প্রায়শঃই সংঘর্ষ বাধছে। প্রাথমিক বর্ণনামূলক স্তর থেকে ব্যাখ্যামূলক স্তরে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন মস্তিষ্কবিজ্ঞানের ও মনোবিজ্ঞানের একীকরণ। মনকে পুরোপুরি মস্তিষ্কাশ্রিত বলে স্বীকার না করা পর্যন্ত এ-সব মনস্তাত্ত্বিকদের অগ্রগতি আর সম্ভব নয়। মনোবিজ্ঞানের নবতর গবেষণার জন্য মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের জ্ঞান ছাড়াও প্রয়োজন আছে সমাজতত্ত্ব ও জ্ঞানতত্ত্বের (Social science & Epistemology) গবেষণাগারে লব্ধ তথ্যাদির।

পুরাতনের নব মূল্যায়ন

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

পুরাতনের নব মূলায়ন বা ঐতিহ্যের পুনর্বিচার প্রগতিশীল সমাজ বিজ্ঞানীদের সামনে একটি গুরু দায়িত্ব। প্রগতিশীল সমাজবিজ্ঞান নিজেকে মানবসংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলে দাবি করে। পৃথিবীর সমস্ত দেশে ও যুগে মানুষের চিন্তা যে সব সম্পদ সৃষ্টি করেছে, তাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিচারের দ্বারা তার মধ্যে যা কিছু ভাল এবং মানবতার অগ্রগতির সহায়ক, তাকে আপন করে নেয়। একই কারণে প্রত্যেক দেশে জাতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ ও জীবন্ত তাকে পুনর্বিচারের দ্বারা নূতন যুগের আলোকে এগিয়ে নেওয়া প্রয়োজন হয়। সমাজবিজ্ঞান যদি নিছক তত্ত্বে সীমিত না থেকে প্রয়োগের উপর জোর দেয় এবং তত্ত্ব ও প্রয়োগের ঐক্যকে বড় করে দেখে তাহলে উপরোক্ত কাজটি তার পক্ষে অপরিহার্য। কেননা সমাজবিকাশের সাধারণ নিয়ম সর্বত্র এক হলেও প্রত্যেক দেশের সামাজিক ঐতিহাসিক পরিবেশের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের দরুন সেই সাধারণ নিয়মই কতকগুলি বিশিষ্টরূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। আর সুদীর্ঘকালের সেই বৈশিষ্ট্যগুলির ফলে দেশের জনগণের মননভঙ্গী এবং মূল্যবোধেও কতকগুলি বিশেষত্ব দেখা দেয়। এই বৈচিত্র্যকে সমাজবিজ্ঞান অস্বীকার করে না। তার সার্বজনীন সত্য সেই বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি এবং বিশ্লেষণের দ্বারা আরো বেশী সমৃদ্ধ হয়।

জনসাধারণের মনের দুয়ারে আধুনিকতম প্রগতিশীল চিন্তা ও ভাবধারাকে পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে এই কাজটির গুরুত্ব আরো বেশী পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কেন না তাদের মননভঙ্গী, চিন্তারূপ ও তার পটভূমির সাথে পরিচিতি প্রয়োজন হয় ত' বটেই ; উপরন্তু নূতন ভাবধারা যদি সেইগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে উপস্থাপিত হয়, তবে তা সহজেই জনগণের অন্তরের অন্তঃপুরে স্থায়ী আসন দখল করে নিতে পারে।

কাজটি অবশ্য খুব সহজ নয়। প্রথমত সেজন্য প্রয়োজন হয় সুদীর্ঘ সহিষ্ণু পরিশ্রম, সমবেত প্রচেষ্টা এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে অনুসন্ধান। ঐতিহ্যের সাথে গভীর এবং বিশ্লেষণমূলক পরিচিতি, উপরের আবরণ ভেদ ক'রে অন্তরবস্তুকে খুঁজে বার করা, তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য নির্ণয় ইত্যাদি হ'ল সে কাজের অচ্ছেদ্য অঙ্গ। তেমনি অন্যদিকে রক্ষণশীল তথা প্রতিক্রিয়াপন্থীদের ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে হয়। তারা চায় ঐতিহ্যের নামে জনগণের দৃষ্টিকে ভবিষ্যতের দিক থেকে ফিরিয়ে অতীতের প্রতি নিবদ্ধ করে রাখতে। তারা পরিবর্তনের সত্য এবং প্রয়োজনকে অস্বীকার করে। জাতীয় বৈশিষ্ট্যের নামে ইতিহাসের সার্বজনীন নিয়ম ও সত্যকে নস্যাৎ করে দিতে চায়। বহুকাল ধরে পুরাতনপন্থীদের ব্যাখ্যাটাই বহুলভাবে প্রচারিত হওয়ায় জনগণের মনে তারই আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। তার বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্নভাবে মতাদর্শগত সংগ্রাম ছাড়া জনচিত্তকে মোহমুক্ত করা যায় না। ঐতিহ্যের প্রগতিশীল প্রাণবস্তুকে তুলে না ধরলে সে সংগ্রামকে সাফল্যের সাথে পরিচালনা করা সম্ভব নয়।

দৃষ্টান্ত হিসাবে রামায়ণ মহাভারতের কথাই ধরা যাক। হিন্দু জনমানসে এই দুই প্রাচীন মহাকাব্য কি আসন দখল করে বসে আছে তার বিস্তৃত উল্লেখ নিতান্তই বাহুল্য। ভারতের সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের

বিকাশের ইতিহাসে তাদের সুগভীর প্রভাব অনস্বীকার্য। কিন্তু সাধারণত রামায়ণ ও মহাভারতের কথাকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে তাতে অধ্যাত্মিকতারই প্রাধান্য। সে ব্যাখ্যা জনচিত্তকে এক লোকোত্তর অতি-প্রাকৃত সত্তার উপর নির্ভরশীল করে রাখে। তাদের জীবনের দুঃখ বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সংগ্রামের সাথে তার যেন কোনো সম্বন্ধ নেই। তাই বলে রামায়ণ ও মহাভারতের সঠিক মূল্যায়নের কাজকে উপেক্ষা করা বা এড়িয়ে যাওয়া চলে না।

প্রগতিশীল সমাজবিজ্ঞানীদের পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত ঐ কাজে হাত দেওয়া হয় নি। অন্ততঃ বর্তমান প্রবন্ধের লেখকের দৃষ্টিতে পড়ে নি। রামায়ণ মহাভারতকে একটা নতুন দৃষ্টিতে বোঝার এবং তুলে ধরার চেষ্টা রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন। তাঁর সে আলোচনা এযাবৎ প্রায় সকলের দৃষ্টির অগোচরে রয়ে গেছে। অথচ তা বিশেষ সম্ভাবনা ও তাৎপর্যপূর্ণ।

এই দুই মহাকাব্যকে অনেক সময় ভারতের অন্তঃকরণের ইতিহাস আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। অধ্যাত্ম-বাদী ও প্রাচীনপন্থীরা কথাটিকে যে ভাবে উপস্থাপিত করেন তার সাথে একমত না হলেও, ঐ বক্তব্যের মধ্যে যে ঐতিহাসিক সত্য প্রতিফলিত হয়েছে তাকে অস্বীকার করা চলে না। রবীন্দ্রনাথ 'জাতীয় সাহিত্য' সম্বন্ধে আলো-চনা প্রসঙ্গে সেই দিকটি বিশেষভাবে তুলে ধরেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মহাকাব্যগুলি বহুকাল ধরে লোকমুখে প্রচলিত কাহিনীকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। রামায়ণ সম্বন্ধেও সেকথা সমভাবে প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথ বলেন যে রাম সীতার কত কাহিনী যা মূল রামায়ণে পাওয়া যায় না এমন সব জিনিস, বহুকাল ধরে গ্রামের গায়ক কথকদের মুখে মুখে ভাঙা ভাঙা ছন্দ এবং গ্রাম্য ভাষাকে আশ্রয় করে বহুল প্রচলিত হয়েছে। তারপর কোনো এক সময়ে রাজসভায় কোনো কবি সেই লোককাহিনীগুলিকে আপনার করে নিয়ে মার্জিত ছন্দে ও ভাষায় রূপ দিয়েছেন। পুরাতনকে নূতন এবং বিচ্ছিন্নকে এক করে দেখালেই সমস্ত দেশ তার ভিতরে যেন আপন অন্তরকে স্পষ্ট এবং বৃহৎভাবে দেখতে পায়। নানামুখে প্রচলিত খণ্ড খণ্ড গানগুলি একটি কাঠামোর মধ্যে বাঁধা পড়ার পর আবার লোকসাধারণের হৃদয়ের দুয়ারে যেয়ে পেঁছায়। যখন সেই কাব্য দীর্ঘকাল ধরে জনসাধারণের সামনে গাওয়া হতে থাকে তখন তার উপর নানা দিক থেকে কালের চিহ্ন পড়ে। তা ক্রমশঃ জনমানস এবং পরিবর্তিত যুগচেতনার নানা স্বাক্ষর বহন করে। দেশের সমস্ত দিক থেকে নিজের পুষ্টি টেনে নিয়ে সেই কাব্য সমস্ত দেশের জিনিস হয়ে ওঠে। পুরাতন কাঠামোকে বজায় রেখেই তার মধ্যে পরিবর্তিত যুগ-মানসের প্রতিফলন স্বরূপ বহু নূতন নূতন কাহিনী সংযোজিত হয়। এক এক সময়ে মূল কাহিনীর এক একটি ভাব প্রাধান্য লাভ করে। ঐ কাঠামোর মধ্যে অনেক নূতন নূতন তত্ত্ব ও ভাবের সংযোজন হতে থাকে। এই ভাবেই মহাকাব্যগুলি সমগ্র জাতির অন্তঃকরণের ইতিহাসে পরিণত হয়। তার মধ্যে এসে মিলিত হয় ইতিহাস, তত্ত্বজ্ঞান, ধর্মবোধ ও কর্মনীতি। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের চেতনায় ধর্মের প্রাধান্য থাকে, ততক্ষণ এই মহাকাব্যকে কেন্দ্র করেও সমাজে পুরাতন ও নূতনের মধ্যে মতাদর্শগত সংগ্রাম আত্মপ্রকাশ করে। পুরাতনপন্থীরা তাকে একভাবে ব্যাখ্যার চেষ্টা করে, আবার তারই বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নূতন যুগচেতনা উপস্থাপিত করে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা তথা মতাদর্শ। জাতীয় মহাকাব্যের বিকাশের এই প্রক্রিয়াটিকে সুষ্ঠুভাবে অধ্যয়ন করলে তার মধ্যে বিভিন্ন সময়ের জনমানসের প্রতিচ্ছবি এবং সামাজিকদ্বন্দ্বের অভিব্যক্তির সুস্পষ্ট স্বাক্ষর খুঁজে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ বলেন যে রামায়ণ রচিত হওয়ার আগে জনসাধারণের মধ্যে রামচরিত সম্বন্ধে যে সব পুরাণ-

কথা প্রচলিত ছিল সেগুলির চিহ্ন আজ হয়ত খুব বেশী খুঁজে পাওয়া যাবে না, কিন্তু সেইগুলির মধ্যেই হয়েছিল রামায়ণের পূর্বসূচনা।

তাঁর মতে সেই পূর্বসূচনা হয়েছিল প্রাচীন যুগের সমাজ বিপ্লবে অর্থাৎ পুরাতন এবং নূতনের বিরোধে। এ সম্বন্ধে তিনি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' শীর্ষক প্রবন্ধে। তাঁর মতে এই বিরোধ বা দ্বন্দ্ব বেধেছিল ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের মধ্যে। ব্রাহ্মণেরা ছিলেন রক্ষণশীলতার এবং ক্ষত্রিয়েরা সামাজিক প্রগতির প্রতিনিধি। আর্য সমাজের সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় আর্য এবং অনার্যের সংঘাতের প্রতিক্রিয়া হিসাবে। অনার্যদের সাথে সংঘর্ষের ফলে আর্যদের মধ্যে যে সংহতিবোধ জাগ্রত হয়, তা ক্রমশ আত্মপ্রতিষ্ঠালাভ করতে সমর্থ হয় আর্য সমাজে পুরাতনের উপরে নূতন শক্তির বিজয়ের ফলে।

আর্যেরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন কালে কালে ও দলে দলে। তাঁদের সকলের গোত্র এবং দেবতা এক ছিল না। বিভিন্ন উপনিবেশগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। ব্রাহ্মণেরা ছিলেন প্রাচীন ধর্ম এবং সমস্ত স্মরণীয় ব্যাপারকে বিশুদ্ধ ও অবিচ্ছিন্ন রাখার কাজে নিযুক্ত। এক এক কুলের আর্যদলের মধ্যে, এক একজন কুলপতিকে আশ্রয় করে বিশেষ বিশেষ স্তব মন্ত্র ও দেবতাদের তুষ্টির বিধিবিধান রক্ষিত ছিল। এই সমস্ত মন্ত্র ও যজ্ঞানুষ্ঠানের বিচিত্রবিধি বিশেষভাবে আয়ত্ত করা সকলের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তা দীর্ঘকাল অধ্যয়ন এবং অভ্যাস সাপেক্ষ। ব্রাহ্মণেরা সেই কাজে বিশেষভাবে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁরা সব ধর্মবিধিকে এক জায়গায় বাঁধের মত দৃঢ় ভাবে বেঁধে রাখেন। কাজেই তাঁরা শুধুই প্রাচীনত্বের নয়, কুলগত বিভেদ এবং পার্থক্যের প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়ান। সকল আর্যের মিলনের বদলে কৌলিক ও প্রথাগত স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করাই ছিল তাঁদের মুখ্য ভূমিকা।

অন্যদিকে ক্ষত্রিয়েরা ছিলেন আত্মরক্ষা, যুদ্ধ বিগ্রহ ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত। বহিরাক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা এবং উপনিবেশ বিস্তারের সংগ্রাম উপলক্ষ্যে সমস্ত আর্যদলের মধ্যকার ঐক্যসূত্রটি তাঁদেরই হাতে এসে পড়ে। সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক ও মানুষিক বাধার সাথে যুদ্ধ করতে হত তাঁদেরই। তাই জীবনের ক্ষেত্রে নব নব ঘাত প্রতিঘাতের অভিজ্ঞতায় পরিবর্তনের তাগিদ তাঁদের মনেই প্রথম জন্ম নেয়। প্রথামূলক বাহ্য-অনুষ্ঠান এবং কুলগত পার্থক্যের বোধ ক্ষত্রিয়ের মনে সুদৃঢ় হয়ে উঠতে পারে না। তাঁরাই প্রথমে বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন যে অনৈক্যের মধ্যে ঐক্যই একমাত্র সত্য পদার্থ। তাই—তাঁরা ঋক, সাম, যজুঃ প্রভৃতিকে অপরাবিদ্যা এবং হোম যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্মকাণ্ডকে নিষ্ফল বলে ঘোষণা করেন। ব্রহ্মবিদ্যা হয়ে ওঠে ক্ষত্রিয়ের বিদ্যা। ক্রমে আর্যদের মধ্যে যতই একটা ঐক্যবোধ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে ততই সমাজে এই অনুভূতি সঞ্চারিত হয়েছে যে দেবতারা নামে নানা, কিন্তু সত্যে এক ; অতএব বিশেষ বিশেষ দেবতাকে বিশেষ স্তব এবং বিশেষ বিধিতে সন্তুষ্ট করে ফল পাওয়া যায়, এই ধারণা ক্ষয় হয়ে এসেছে। দলভেদে উপাসনা ভেদ ঘোচানর চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু গোড়াতে ব্রহ্মবিদ্যা বিশেষভাবে ক্ষত্রিয়কে আশ্রয় করেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং সেইজন্য রাজবিদ্যা নামে পরিচিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের মতে তৎকালীন সমাজের এই আদর্শভেদের প্রতীকস্বরূপ দেখা যায় দুই দেবতাকে। প্রাচীন বৈদিক মন্ত্রতন্ত্র এবং ক্রিয়াকাণ্ডের দেবতা ব্রহ্মা, তাঁর চারি মুখ চারিবেদ। তা চিরকালের মত ধ্যানরত স্থির। আর নব্যদলের দেবতা হলেন বিষ্ণু। তাঁর চারটি ক্রিয়াশীল হস্ত নব নব ক্ষেত্রে মঙ্গলকে ঘোষণা এবং ঐক্যচক্রকে প্রসারিত করে। তা শাসন এবং সৌন্দর্যকে বিকশিত করে।

তেমনি এই পৃথিবীতেও দুইজন নায়ক যথাক্রমে দুই দলের প্রবক্তা বা প্রতীক হয়ে দাঁড়ান। ব্রাহ্মণ পক্ষ বশিষ্ট নামটিকে এবং ক্ষত্রিয় পক্ষ বিশ্বামিত্র নামকে আশ্রয় করে। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের মতাদর্শের সংঘাত এমন একটা সীমারেখায় এসে দাঁড়ায়, যেখানে বিচ্ছেদ সামাজিক বিপ্লবের অগ্নি উচ্ছ্বাসরূপে উদ্‌গারিত হতে থাকে। ব্রাহ্মণ পরশুরামের পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করার কাহিনী হয়ত সেই চরম সঙ্ঘর্ষের স্মৃতিকে জীবিত করে রেখেছে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য ক্ষত্রিয়ের অর্থাৎ নবীনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। রামায়ণে যে তিনজন মহানায়কের দেখা পাওয়া যায় অর্থাৎ বিশ্বামিত্র, জনক এবং রামচন্দ্র—তাঁরা সকলেই ক্ষত্রিয়। জনক ছিলেন আদর্শ রাজা। ব্রহ্মবিদ্যা তাঁকে আশ্রয় করে বিকাশলাভ এবং জীবন্তরূপ ধারণ করে। তিনি একদিকে ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন আর অন্যদিকে স্বহস্তে হল চালনা করতেন। তা থেকে অনুমিত হয় যে কৃষি বিস্তারের দ্বারা আর্য সভ্যতা প্রসারিত করা ক্ষত্রিয়দের অন্যতম ব্রত ছিল। একদিন পশুপালনই ছিল আর্যদের প্রধান উপজীবিকা এবং অরণ্যবাসী ব্রাহ্মণদের প্রধান সম্পদ ছিল ধেনু। ক্ষত্রিয়েরা নতুন উপজীবিকার বাহক হলেন।

রামচন্দ্রকে রাজর্ষি জনকের গৃহে নিয়ে যান ঋষি বিশ্বামিত্র। হয়ত ইতিহাসের দিক থেকে তাঁরা সমসাময়িক নন কিংবা এই সমস্ত কাহিনী হয়ত ঐতিহাসিক অর্থে ঘটনামূলক সত্য নাও হতে পারে। কিন্তু ভাবগত অর্থে তা সত্য, অর্থাৎ বিশ্বামিত্র, জনক এবং রামচন্দ্র একটি ভাবের মূর্ত প্রতীক। সেই ভাবগত অর্থেই তাঁরা পরস্পরের সমসাময়িক।

রণজয়ী ক্ষত্রিয়েরা আর্যাবর্ত থেকে অরণ্য-বাধা অপসারণের দ্বারা পশুসম্পদের স্থানে কৃষিসম্পদকে প্রবল করে তোলেন। তখন দুর্গম বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণভাগে অরণ্য অক্ষত ছিল। সেই দিকে দ্রাবিড় সভ্যতা প্রধান হয়ে আর্যদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল। শিবোপাসক রাবণ ইন্দ্র প্রভৃতি বৈদিক দেবতাকে পরাস্ত করে আর্যদের যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ তিনি বৈদিক দেবতাদের উপাসকগণকে বার বার পরাভূত এবং নিজের দেবতাকে জয়ী করেন।

যে মহাবীর সেই শিবোপাসকদের প্রভাবকে খর্ব করে দাক্ষিণাত্যে কৃষিবিদ্যা এবং ব্রহ্মবিদ্যাকে বহন করে নিয়ে যান, সেই রামচন্দ্র 'হরধনু' ভঙ্গ করেন। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি জনক রাজার মানস-কন্যা সীতাকে লাভের অধিকারী হন অর্থাৎ হলচালন রেখাকে সুদূর প্রসারিত করার গৌরবলাভ করেন। রামচন্দ্রের কাহিনীতে দেখা যায় যে তিনি তরুণ বয়সে তিনটি কঠিন পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হন। প্রথমত ক্ষত্রিয়দলের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের যে বিদ্বেষ অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছিল, সেই ব্রাহ্মণদলকে তিনি নিজ পরাক্রমে পরাজিত করেন। পরশুরামের পরাজয় তারই নিদর্শন। দ্বিতীয়ত তিনি হরধনু ভঙ্গ করতে সফল হন। তার তাৎপর্য আগেই বলা হয়েছে। তৃতীয়ত দাক্ষিণাত্যের যে ভূমি অহল্যা পাষাণরূপে হলচালনের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল, তাকে সজীব করে তুলে কৃষিনৈপুণ্যের পরিচয় দেন।

বশিষ্টবংশ ছিল রামের চির-পুরাতন বংশপুরোহিত এবং বশিষ্টের সনাতন ধর্মই ছিল তাঁর কুলধর্ম। কিন্তু তিনি সে সব ত্যাগ করে বিশ্বামিত্রের শিষ্যত্ব গ্রহণের দ্বারা নূতন দলের পক্ষ অবলম্বন করেন। রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেকে বাধা এবং নির্বাসনের ঘটনা খুব সম্ভবত পুরাতন ও নূতনের মধ্যেকার তীব্র বিরোধকেই সূচিত করে। নির্বাসনে তাঁর সঙ্গিনী ছিলেন সীতা অর্থাৎ কৃষি বিস্তারের ব্রত।

রামচন্দ্র অনার্যদের পরাজিত করেই ক্ষান্ত হন নি। তিনি আর্য-অনার্যের মিলনের সেতু রচনা করেন। নব্য মতের ধারক ও বাহক ক্ষত্রিয়দলের প্রতিনিধিরূপেই তিনি এই মহান কার্যে অগ্রণী হন। যে সময়ে আর্যদেবতা ও বিধিবিধান বিশেষ জাতিগতভবে সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ ছিল তখন এই মিলন সম্ভব হত না। তখন আর্য-অনার্যের সংঘাতের পরিণতি হতে পারত একপক্ষের সম্পূর্ণ বিলুপ্তিতে। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যার শিক্ষায় যখন ক্ষত্রিয়দের মধ্যে দেবতার ধারণা বিশ্বজনীন হয়ে ওঠে তখন বাইরের ভেদবিভেদের ঊর্ধ্বে মানুষের ঐক্যের সত্যটি প্রভাবিত হয়। জ্ঞানের দ্বারা দৈববিভীষিকা বিদূরিত হয়। তখনই সম্ভবপর হয় আর্য-অনার্যের মধ্যে মিলনের সত্যকার সেতু প্রতিষ্ঠা। বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মের দেবতা হয়ে ওঠেন অন্তরের ভক্তির দেবতা। তিনি আর কোনো বিশেষ শাস্ত্র, শিক্ষা ও গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রইলেন না।

ব্রহ্মবিদ্যারই আনুষঙ্গিকরূপে ভারতে প্রেমভক্তি ধর্মের আরম্ভ হয়। এই ভক্তিধর্মের দেবতাই বিষ্ণু। প্রথম যুগের সামাজিক বিপ্লবের অবসানে ব্রাহ্মণেরা বৈষ্ণবধর্মকে আপন করে নিয়েছিলেন বটে। কিন্তু গোড়াতে তা হয় নি। ভক্তিধর্মকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে হয়। এই ভক্তির বৈষ্ণবধর্ম যে ক্ষত্রিয়ের প্রবর্তিত তার আর একটি নিদর্শনরূপে দেখা যায়, পরবর্তী যুগে ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণ এই ধর্মের গুরু। তাঁর উপদেশের মধ্যে বৈদিকমন্ত্র, আচার এবং অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে আঘাতের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীনকাল থেকে ভারতে যে দুইজন মহামানব বিষ্ণুর অবতাররূপে পূজালাভ করে এসেছেন তাঁর দুইজনই ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভুত। একজন হলেন শ্রীরামচন্দ্র এবং অপরজন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁদের উভয়ের জীবন ও বাণীর দ্বারা ভক্তিধর্ম বিশেষভাবে প্রচার লাভ করে।

প্রেম-ভক্তি যেমন ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে ব্যবধান দূর করে, তেমনি মানুষে মানুষে উচ্চনীচ ভেদাভেদ দূর করে পরস্পরকে কাছে আনে। রামচন্দ্র ভক্তের ভগবানরূপে একদিন গুহক চণ্ডালকে কোল দিয়েছিলেন। এই জনশ্রুতি আজ পর্যন্ত তাঁর আশ্চর্য উদারতার পরিচয় বলে চলে এসেছে। পরবর্তী যুগের সমাজ রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে তাঁকে রক্ষণশীলতার প্রতিমূর্তি রূপে চিত্রিত করে এই চরিত্রের মাহাত্ম্য বিলুপ্ত করতে চেয়েছে। সেখানে দেখা যায় যে তিনি শূদ্রককে মৃত্যুদণ্ড দান করেন, সীতাকে বনবাসে পাঠান। তা থেকে মনে হয়, রামচরিতে যে সমাজ বিপ্লবের ইতিহাস ছিল তাকে যথাসম্ভব মুছে ফেলে তাঁকে স্থিতিশীল সামাজিক আদর্শের অনুগতরূপে চিত্রণের দ্বারা বিধিবন্ধনের অনুকূলে ব্যবহারের চেষ্টা হয়েছে।

তবু ভারতবর্ষ একথা কখনও ভোলে নি যে শ্রীরামচন্দ্র চণ্ডালের মিতা, বানরের দেবতা, রাক্ষসের বন্ধু। তিনি শত্রুকে আপন করেছেন, আচারের নিষেধ এবং সামাজিব বিদ্বেষের বাধাকে অতিক্রম করে আর্য অনার্যের মধ্যে প্রীতির সেতুবন্ধ রচনা করেছেন। বহু শতাব্দী পরে আবার রামায়ণকথার এই দিকটিই প্রাধান্য লাভ করে এবং জনচিত্তে নূতন জাগরণের সূচনা করে।

আদিকবি রামকে চিত্রিত করেছিলেন গার্হস্থ্য-প্রধান হিন্দু সমাজের যত কিছু ধর্ম তার অবতাররূপে। তখন ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে আর্য সমাজ সংহতি এবং স্থিতিলাভ করেছে। সেই সমাজের ভিত্তিকে সুরক্ষিত করার জন্য যেসব গুণের প্রাধান্য প্রয়োজন তারই সমাবেশ ঘটানো হয় রাম চরিত্রে। তিনি পুত্ররূপে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের রক্ষাকর্তারূপে, অবশেষে রাজা হিসাবে আপনার লোকপূজ্যতা সপ্রমাণ করেন। সেখানে দেখান হয় যে তিনি রাবণ বধ করেন শুধু ধর্মপত্নীকে উদ্ধার করবার জন্য। আবার প্রজানুরঞ্জনের

অনুরোধে সেই পত্নীকে পরিত্যাগ করেন। তিনি মানুষের সমস্ত সহজ প্রবৃত্তিকে কঠিন শাসন করেন শাস্ত্রের নির্দেশে এবং এইভাবে সমাজ রক্ষার আদর্শ স্থাপন করেন।

কিন্তু বহুশতাব্দী পরে আবার ভারতের জনগণের মধ্যে এক নূতন চেতনার ঢেউ উঠেছিল। শুধুমাত্র সরল ভক্তির দ্বারা আপামর চণ্ডাল সকলে ভগবানকে লাভ করতে পারে, সেজন্য তন্ত্রমন্ত্র বিশেষ বিধি বা বা জ্ঞানী ও পুরোহিতের মধ্যস্থতার প্রয়োজন হয় না, এই কথাটা যেন নূতন আবিষ্কারের মত জন-সাধারণের দুঃসহ হীনতাভার মোচন করে দেয়। জনসাধারণের সেই বিদ্রোহ এবং নূতন গৌরব লাভের চেতনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি পাওয়া যায় কৃত্তিবাসের রামায়ণে। কৃত্তিবাসের রাম ভক্তবৎসল। সেখানে ভক্তির লীলাই প্রধান। তিনি অধম পাপীসকলকে উদ্ধার করেন। অস্পৃশ্য চণ্ডাল, বনের পশু-বানর, শত্রু রাবণ, শরণার্থী বিভীষণ সকলেই তাঁর প্রেমের দ্বারা ধন্য হয়।

যে যুগের কথা বলা হচ্ছে তখনকার মানুষের চেতনায় এই ভক্তিধর্ম সমাজের উচ্চশ্রেণীর বিরুদ্ধে নীচের তলার মানুষের বিদ্রোহেরই বহিঃপ্রকাশরূপে কাজ করে। কবিগুরু সেই তাৎপর্যটিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

মহাভারত সম্বন্ধে তিনি বলেন যে সেখানে আত্মরক্ষণী শক্তি তথা রক্ষণশীলতার প্রাধান্যের পরিচয় পাওয়া যায়। রামায়ণে স্থিতি এবং গতির মধ্যে সংঘাতে গতি তথা, পরিবর্তনের শক্তি প্রবল হয়ে উঠেছে। তারপর একসময়ে সমাজে স্থিতির দিকটাই আধিপত্য লাভ করেছে। অবশ্য স্থিতি এবং গতির ভিতর সংঘাতের প্রক্রিয়া কখনও থেমে যায় নি। ক্ষত্রিয় যখন নূতনের দিকে অগ্রসর হয়েছে ব্রাহ্মণ তাকে বাধা দিয়েছে। কিন্তু ক্ষত্রিয় যখন সেই বাধা অতিক্রম করেও সমাজকে সম্প্রসারণের দিকে নিয়ে গিয়েছে, তখন ব্রাহ্মণ পুনরায় নূতনকে আপন পুরাতনের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে সমস্তটাকে আপন করে নিতে চেয়েছে। সম্প্র-সারণের একটা সীমা নির্দেশ করেছে। দেখা যায় যে সমস্ত বিরোধের পর প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণই বারবার সমাজে প্রাধান্যলাভ করেছে।

ক্ষত্রিয়েরা ধর্মকে এমন একটা ঐক্যের দিকে লাভ করেছিলেন, যাতে অনার্যদের সাথে বিরুদ্ধতাকে তাঁরা মিলননীতির সাহায্যে সহজে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। ব্রাহ্মণেরা এই ধর্ম ও মিলননীতিকে প্রথমে বাধা দিলেও পরে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আর্য-অনার্যের ধর্মের ও রক্তের মিলন ঘটেছে। যতই এইভাবে ধর্ম ও বর্ণশংকর উৎপন্ন হয়েছে, ততই ব্রাহ্মণেরা বারবার সীমানির্ণয় করে সমাজকে রক্ষার চেষ্টা করেছেন। যাকে ত্যাগ করতে পারেন নি তাকে গ্রহণ করে বাঁধ বেঁধে দিয়েছেন।

সেই কঠোর সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া প্রচণ্ডভাবে আত্মপ্রকাশ করে বুদ্ধ এবং মহাবীরের প্রবর্তিত ধর্মের মধ্য দিয়ে। ধর্মনীতি যে একটা সত্য পদার্থ, সামাজিক নিয়ম মাত্র নয়, মানুষ মুক্তিলাভ করে সামাজিক বাহ্যপ্রথা পালনের দ্বারা নয়,—এই বাণী তাঁরা প্রচার করেন। সেই ধর্মনীতি মানুষের কোন ভেদকে চিরন্তন সত্য বলে গণ্য করতে পারে না। সেই বাণী দেখতে দেখতে জাতির চিরন্তন সংস্কার ও বাধাকে অতিক্রম করে সমস্ত দেশকে অধিকার করে নেয়।

আর্য-অনার্যের মিলনের প্রক্রিয়ায় আর্যেরা অনার্যের নিকট থেকে যা কিছু গ্রহণ করেছিল তাকে আর্য করে নিয়ে আপন প্রকৃতির অনুগত করে নিতেছিল। এইভাবে ধীরে ধীরে একটি প্রাণবান জাতীয় কলেবর গড়ে ওঠার সম্ভবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু নিশ্চয়ই সেই মিলন প্রক্রিয়ার মাঝখানে তাকে ঠেকাবার

চেষ্টায় বাঁধাবাধি ও বাহ্যিকতার মাত্রাটা খুব অতিরিক্ত হয়ে পড়ে। সমাজের শ্রেণীতে শ্রেণীতে ও মানুষের অন্তরে বাহিরে একটা বৃহৎ বিচ্ছেদ ঘটে সমস্ত সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে যায়। তাই বুঝি বৌদ্ধধর্মের মত এমন প্রবল ধর্মবিপ্লব দেখা দেয়। তা জাতি ও বর্ণের সমস্ত বেড়া ভেঙ্গে ফেলতে চেষ্টা করে।

বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্যের যুগে কেবল ভারতবর্ষের ভিতরকার অনার্যেরাই নয়, বাইরে থেকেও অনার্যরা সমাগম হয়ে তারা প্রবলতা লাভ করে। ফলে আর্যদের সাথে তার সুবিদিত সামঞ্জস্য রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। যতদিন বৌদ্ধধর্মের বল ছিল ততদিন এই অসামঞ্জস্য অস্বাস্থ্যকর আকারে প্রকাশ পায় নি। কিন্তু যখন বৌদ্ধধর্মের প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়ে তখন তা নানা অদ্ভুত অসংগতির আকারে আত্মপ্রকাশ করে। ফলে যে ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ভারতে জাতিবৈচিত্র্য ঐক্যলাভের চেষ্টা করছিল সেই ব্যবস্থাটিই ভূমিস্যাৎ হয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ বলেন যে এই অবস্থায় সর্বপ্রকার উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে কোন সংগতির সূত্র না থাকায় সমাজের অন্তরস্থিত আর্যপ্রকৃতি অত্যন্ত পীড়িত হয়ে নিজেকে প্রকাশ করার জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে। আমরা কি এবং কোন্ জিনিসটা আমাদের, তাকে চারিদিকের বিপুল বিশ্লিষ্টতার ভিতর থেকে উদ্ধার করার একটা মহাযুগ উপস্থিত হয়। এই যুগেই ভারতবর্ষ নিজেকে ভারতবর্ষ বলে সীমাচিহ্নিত করে। তার আগে বৌদ্ধ সমাজের যোগে ভারতবর্ষ এত দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল যে সে নিজেকে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পায় নি।

এইজন্য আর্যজনশ্রুতিতে প্রচলিত কোন পুরাতন চক্রবর্তী সম্রাটের রাজ্যসীমার মধ্যে ভারত আপন ভৌগলিক সত্তাকে নির্দিষ্ট করে নেয়। তারপর সামাজিক প্রলয়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত নিজস্ব সূত্রগুলিকে খুঁজে নিয়ে জোড়া দেওয়ার চেষ্টা চলতে থাকে। তাই সেই সময় সংগ্রহকর্তাদের কাজই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। তখনকার যিনি ব্যাস তাঁর কাজ নূতন রচনা নয়, পুরাতন সংগ্রহ। এই ব্যাস এক ব্যক্তি না হতে পারেন কিন্তু তিনি সমাজের একই শক্তি। সেই চেষ্টার জের টেনেই তিনি বেদ সংগ্রহ করেন। যথার্থ বৈদিককালে লোক যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রণালী ও মন্ত্রকে যত্ন করে শিখলেও তখন তা ছিল শিক্ষণীয় বিদ্যামাত্র। তখন সকলে তাকে পরাবিদ্যারূপে গ্রহণ করে নি। কিন্তু বিশ্লিষ্ট সমাজকে বেঁধে তোলার জন্য এমন এক জিনিসের প্রয়োজন হয়েছিল যার সম্বন্ধে কেউ কোনো বিতর্ক উত্থাপন করবে না। তা স্বীকৃতিলাভ করবে আর্যসমাজের সর্বপুরাতন বাণীরূপে এবং তাকে অবলম্বন করে বিচিত্র বিরুদ্ধ সম্প্রদায় এক হয়ে দাঁড়াতে সমর্থ হবে। সেই থেকে বেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

তারপরে আর্যসমাজে যতকিছু জনশ্রুতি খণ্ড খণ্ড আকারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল সেগুলিকে একত্র সংগ্রহকরে মহাভারত সংকলিত হয়। একটি কেন্দ্রের প্রয়োজন পূর্ণ করল বেদ। আর একটি ধারাবাহিক পরিধিসূত্র যাকে অবলম্বন করে অতীত ইতিহাসকে মূর্তি দেওয়া যেতে পারে সেই প্রয়োজনে রচিত হল মহাভারত। তাতে শুধু জনশ্রুতি স্থান পায় নি। আর্যসমাজে প্রচলিত সমস্ত বিশ্বাস, ধারণা, তর্কবিতর্ক ও চারিত্র নীতি ইত্যাদিকেও একত্র করে মহাভারতের সংকলনকর্তা সমগ্র এক বিরাট মূর্তি খাড়া করেন।

রবীন্দ্রনাথের মতে মহাভারত নামের মধ্যেই আর্যদের একটি ঐক্য উপলব্ধির চেষ্টা বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আধুনিক সংজ্ঞা অনুসারে তাকে ইতিহাস বলা না চলতে পারে। কিন্তু তা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিবৃত্তান্ত। সেই সংগ্রহের দিনে আর্যদের ইতিহাস তাদের স্মৃতির পটে যেরূপ রেখায়

অঙ্কিত ছিল সেই সমস্তরই প্রতিলিপি মহাভারতে একত্র সংগৃহীত এবং রক্ষিত হয়েছে। তার মধ্যে কিছু কিছু হয়ত লুপ্ত, কিছু স্পষ্ট এবং সুসঙ্গত আর কিছু কিছু হয়ত পরস্পর বিরুদ্ধ। কিন্তু যেমনটি পাওয়া গেছে তেমনি ভাবে সংকলনে স্থান লাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেন যে মহাভারতের যুগকে দেখতে হবে ভাবগত যুগ হিসাবে অর্থাৎ কোনো একটি সংকীর্ণকালে তাকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা চলে না। আর্যসমাজের যে উদ্যম আপনার সামগ্রীগুলিকে বিশেষভাবে সংরক্ষণ এবং বিন্যাস করতে চেয়েছে তা বিশেষ কোন সময়ে সীমাবদ্ধ নয়। সুদীর্ঘকাল ধরে ভিন্ন ভিন্ন পুরান সংকলন করে নিজেদের প্রাচীন পথকে চিহ্নিত করার চেষ্টা হয়েছে। বহুকাল ধরে চলেছে আর্য-অনার্যের সংমিশ্রণের প্রক্রিয়া। সেই সাথে একদিকে হয়েছে আর্যের নিজস্ব জিনিসগুলিকে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা এবং অন্যদিকে অনার্যের অবদানের সাথে সমন্বয়ের প্রয়াস। বৌদ্ধযুগের মহাপ্লাবনের পরবর্তী পরিস্থিতিতে প্রাচীন পথকে চিহ্নিত এবং সুরক্ষিত করার প্রশ্নই বড় হয়ে দেখা দেয়। এই সংগ্রহ তথা সংকলনের সময়েই আর্যদের মধ্যে প্রচলিত সমস্ত বিধিনিষেধকে স্মৃতিশাস্ত্ররূপে সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ করা হয়।

রবীন্দ্রনাথের আলোচনা অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ নয়। বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক বিচারে তার অনেক অসম্পূর্ণতা এবং ত্রুটি হয়ত আবিষ্কৃত হবে। যেমন বলা যেতে পারে যে অনেক আধুনিক গবেষকের মতে মহাভারতে যে সব জনশ্রুতি, পুরানকাহিনী ইত্যাদি সংগৃহীত হয়েছে সে সবই শুধুমাত্র আর্যদের জিনিস নয়। অনার্যদের বহু জিনিস সেখানে স্থানলাভ করেছে। সে যাই হোক্, রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যার পর্যালোচনা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। সে প্রসঙ্গের অবতারণা তাই এখানে অনাবশ্যক। রামায়ণ মহাভারত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি প্রচলিত অধ্যাত্মবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নপথে প্রবাহিত হয়েছে—এই জিনিসটিই আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি রামায়ণ-মহাভারতকে অতিপ্রাকৃত অতিলৌকিক জগৎ থেকে এই ধূলির ধরণীতে টেনে নিয়ে এসেছেন এবং দেবতা বা দেবোপম ব্যক্তিদের লীলার বদলে তাকে চিত্রিত করেছেন এই মাটিরই মানুষদের কার্যকলাপরূপে। তিনি সুপরিকল্পিত ভাবে প্রাচীন ভারতের সমাজে পুরাতন এবং নবীনপন্থী সামাজিক শক্তির সংঘাতের প্রক্রিয়া অনুসন্ধান করেছেন এরূপ মনে করার কোন কারণ নেই বটে। কিন্তু তাঁর উক্ত ব্যাখ্যায় যে দুই পরস্পর বিরোধী সামাজিক শক্তির দ্বন্দ্বই প্রাধান্যলাভ করেছে সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নেই। সেদিক থেকে তাঁর আলোচনা আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির ঐ দুই মহান সম্পদ সম্বন্ধে নূতনভাবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে অনুসন্ধান সুরু করার পক্ষে এক নূতন দিগন্ত নির্দেশ করেছে।

মনের কথা

৩

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ইতিপূর্বে দেখেছি ('মানব মন' : জানুয়ারি, ১৯৬২), আদিম বনমানুষদের কোন এক শাখার পক্ষে গাছের জীবন ছেড়ে সমতল জমিতে নেমে আসা থেকেই প্রাণী জগতের ইতিহাসে এক চূড়ান্ত বিপ্লবের সূচনা। এই বিপ্লবের তাৎপর্য বিচার করা যাক।

জীবজন্তু অবশ্য প্রকৃতিরই অংশ, প্রকৃতিরই অন্তর্ভুক্ত। প্রাকৃতিক উপাদানই সংগঠিত হয়েছে তার দেহসত্তায় ; প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে, প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে সংযোজিত করে বা খাপ খাইয়ে তার পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব। তবুও আলোচ্য ঘটনাটি থেকে প্রকৃতিতে এক অভূতপূর্ব আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের সূচনা অনুমিত হতে বাধ্য। এখান থেকে জীবজগতের একাংশের সঙ্গে—অতএব প্রকৃতিরই একাংশের সঙ্গে—প্রকৃতির সম্পর্কে নূতন সম্ভাবনার সূত্রপাত। সেই নূতন সম্ভাবনা বলতে এই নয় যে প্রকৃতির উপর নির্ভর করার—বা প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে সংযোজিত করার—ইতিহাসের অবসান ; বস্তুত এই নূতন সম্ভাবনা বলতে প্রকৃতির উপরেই নির্ভর করার বা প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গেই নিজেদের সংযোজিত করার রূপান্তর বা গুণগত নূতন পরিবর্তন। সংক্ষেপে তার বর্ণনায় বলা যায়, নিষ্ক্রিয় নির্ভরতার স্তর ছেড়ে সক্রিয় নির্ভরতার স্তরে উঠে আসা, উঠে আসা নিষ্ক্রিয় সংযোজনের স্তর ছেড়ে সক্রিয় সংযোজন স্তরে। এখানে 'সক্রিয়' আর 'নিষ্ক্রিয়' কথা দুটির বিচার প্রয়োজন।

মানবেতর প্রাণীরা নিষ্ক্রিয়ভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এই নিষ্ক্রিয়তাকে ঐকান্তিক অর্থে গ্রহণ করায় ভ্রান্তির আশঙ্কা থাকে। কেননা, মানবেতন প্রাণীরাও প্রকৃতির উপর নিষ্ক্রিয়ভাবে নির্ভর করে জীবনধারণের প্রয়াসেও প্রকৃতিতে পরিবর্তন আনে এবং সে-পরিবর্তনের ফলাফল সুদূরপ্রসারীও হতে পারে। যেমন, গবাদি পশুর পাল কোন অঞ্চল বিশেষে চরতে চরতে নির্মূল করতে পারে সবুজের চিহ্ন ; ফলে প্রকৃতির এক শ্যামল অঞ্চল পরিণত হতে পারে ধূসর মরুভূমিতে। অথচ, প্রকৃতির উপর তাদের এই নির্ভরতা মানবীয় আচরণের তুলনায় অবশ্যই নিষ্ক্রিয়, কেননা এ-নির্ভরতা হল প্রকৃতিতে স্বভাবতই যা ঘটে রয়েছে তার উপর নির্ভরতা—নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে প্রকৃতিতে কোন ঘটনা ঘটিয়ে তার উপর নির্ভর করা নয়। মানুষের পক্ষে কল-কারখানা গড়ে তোলা বা চাষ-আবাদের আয়োজন করার সঙ্গে তুলনা করলে ওই নিষ্ক্রিয় নির্ভরতার সঙ্গে সক্রিয় নির্ভরতার গুণগত পরিবর্তনটি স্পষ্ট হবে। ঘাস না থাকলে, বনজঙ্গল না থাকলে গবাদি পশুর পক্ষে চরে বেড়াবার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু চাষের ক্ষেত রচনা বা কলকারখানা গড়ে তোলার দৃষ্টান্তে অন্য রকম। প্রকৃতিতে যা তৈরি অবস্থায় ছিল না তা গড়ে তোলার আয়োজন। তাই মানুষে, প্রাণীদের তুলনায় মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কে একটা গুণগত পার্থক্য বর্তমান। এঙ্গেল্‌স্ যেমন বলেছেন, In short, the animal merely uses external nature, and effects changes in it merely by his presence. Man changes it so as to make it serve his ends ; he masters it. মানবেতর প্রাণী শুধুমাত্র প্রকৃতিকে ব্যবহারই করে এবং শুধুমাত্র নিজের অস্তিত্ব-প্রভাবে প্রকৃতিতে পরিবর্তন আনে ; মানুষ নিজের

প্রয়োজন অনুসারে প্রকৃতিকে পরিবর্তন করে, প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনে। তবুও মানুষের পক্ষে প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনার বা জয় করার এই দিকটিকে ভুল বোঝবার আশঙ্কা থাকে এবং এই কারণে আমরা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে সক্রিয় নির্ভরতার সম্পর্ক বলে বর্ণনা করেছি। অর্থাৎ, মানুষের এই প্রকৃতি-বিজয় কোন সৃষ্টি ছাড়া ঘটনা নয়; প্রাকৃতিক উপাদানের উপর নির্ভর করেই, প্রাকৃতিক নিয়মের উপর নির্ভর করেই প্রকৃতিতে নিজের চাহিদা মেটাবার আয়োজন। তাই একেও প্রকৃতির উপর নির্ভরতাই বলতে হবে; তবে মানবেতর পশুর মত নিষ্ক্রিয় নির্ভরতা নয়। এঙ্গেল্‌স্ বলেছেন, at every step we are reminded that we by no means rule over nature like a conqueror over a foreign people, like someone standing outside nature—that we with flesh, blood and brain, belong to nature and exist in its midst, and that all our mastery of it consists in the fact that we have the advantage over all other creatures of being able to know and correctly apply its laws.

প্রকৃতিরই অংশ হয়ে এবং প্রাকৃতিক উপাদান ও নিয়মের উপর নির্ভর করেই মানুষ প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনতে শিখেছে; স্থাপন করেছে প্রকৃতির সঙ্গে এক সক্রিয় নির্ভরতার সম্পর্ক। মার্ক্স বলছেন, The soil in the virgin state in which it supplies man with necessities or the means of subsistence ready to hand, exists independently of him, and is the universal subject of human labour. All these things which labour merely separates from immediate connection with environment are subjects of labour spontaneously provided by nature...An instrument of labour is a thing, or a complex of things, which the labourer interposes between himself and the subject of his labour, and which serves as the conductor of his activity. He makes use of the mechanical, physical, and chemical properties of some substances in order to make other substances subservient to his aims...thus nature becomes one of organs of his activity, one that he annexes to his own bodily organs, adding stature to himself in spite of the Bible. As the earth is his original larder, so too it is his original tool house.

প্রকৃতির উপর নির্ভর করেই, প্রাকৃতিক উপাদানের সাহায্যেই মানুষ প্রকৃতিকে নিজের উদ্দেশ্য-সাধনে নিয়োগ করতে শিখেছে, শিখেছে প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনতে, বশীভূত করতে। কী করে? মানুষ তার শারীরিক অবয়বকে বাড়িয়ে নিতে পারে, পারে শারীরিক অবয়বের সঙ্গে যেন নতুন অবয়ব যোগ করতে। মানবেতর প্রাণীদের সঙ্গে তুলনা করা যাক। পৃথিবীর বুকে টিকে থাকার জন্য,—বাঁচবার জন্য,—আয়োজন বলতে, সাজ-সরঞ্জাম বলতে, যা-কিছু তার সবটুকুই তাদের শরীরের অঙ্গীভূত, নিজেদের দেহের সঙ্গে তারা তাদের সাজ-সরঞ্জামকে বহন করে বেড়ায়। ইঁদুরের প্রধান সরঞ্জাম তার দাঁতের ধার, খরগোসের কাছে মাটি খোঁড়ার সরঞ্জাম তার নখের ধার, সিংহের প্রধান অস্ত্র তার থাবার জোর, দ্রুত গমনের জন্য হরিণের সম্বল তার পায়ের পেশী; কাছিম তার পুরো বাড়িটিই শরীরের সঙ্গে বয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু মানুষের বেলায় একেবারে অন্য রকম: দাঁতের ধার, থাবার জোর, ক্ষিপ্র গমনের পেশী প্রভৃতি শুধুমাত্র শারীরিক সরঞ্জাম বলতে মানুষের যেটুকু সম্বল পশুদের তুলনায় প্রায়ই তা নগণ্য। শুধুমাত্র এ-জাতীয় শারীরিক সরঞ্জামের উপর নির্ভর করে অন্যান্য পশুদের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হলে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বই সংকটাপন্ন হত; হয়ত নিশ্চিহ্ন হত

মানুষ। কিন্তু তা হয়নি। বরং ঘটেছে এর বিপরীত ঘটনাই। প্রাণীজগতে প্রতিপন্ন হয়েছে মানুষের শ্রেষ্ঠতা, প্রাকৃতিক শক্তি এসেছে মানুষের আয়ত্তে। অপর পক্ষে, শারীরিক শক্তির সরঞ্জাম হিসাবে আদিম অবস্থায় মানুষ যার উপর নির্ভরশীল ছিল ক্রমশই তার অনেকখানি বর্জিত হয়েছে। যেমন, আদিম মানুষের দাঁত আর বড় জোয়াল শারীরিক অস্ত্র হিসাবে নিশ্চয়ই অনেক শক্তিশালী ছিল ; তুলনায় আধুনিক মানুষের দাঁত আর জোয়াল অস্ত্র হিসাবে অনেক দুর্বল। তবুও এ-ভাবে শারীরিক শক্তির অস্ত্রকে বর্জন করেও মানুষ অধিকারী হয়েছে অসামান্য শক্তির। তার কারণ, প্রকৃতি-ভাণ্ডার থেকে মানুষ নানা উপাদান সংগ্রহ করে সেগুলিকে যেন নূতন অবয়ব হিসাবে নিছক শারীরিক অবয়বের সঙ্গে সংযুক্ত করতে শিখেছে! এই বাড়তি অবয়বই হল মানুষের হাতিয়ার, কিংবা, যা একই কথা, হাতিয়ার গ্রহণ করতে পেরেছে বলেই মানুষের শারীরিক অবয়বগুলির সামর্থ্য ও সম্ভাবনা ক্রমশই অবিশ্বাস্য হয়ে উঠেছে। মাটি খোঁড়ার জন্যে মানুষ আর নখের ধারের উপর নির্ভরশীল নয় ; তার হাতে ধারালো হাতিয়ার। এই হাতিয়ার মানুষের হাতের স্বাভাবিক শারীরিক শক্তিকে এমনই অবিশ্বাস্যভাবে বাড়াতে পেরেছে যে পাহাড় ফুঁড়ে সুড়ঙ্গ পথ রচনাও আজ আর তেমন বিস্ময়কর ঘটনা বলে মনে হয় না। গতির দ্রুততার জন্য মানুষ নির্ভরশীল নয় শুধু তার শরীরের পেশীর উপর, পাখার মত ডানা না থেকেও মানুষ আকাশ—মহাকাশ—ঘুরে আসছে পারে। এ-তালিকা বাড়াবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল মানুষ কী ভাবে নিজের শারীরিক অবয়বের সম্ভাবনাকে এমন অসম্ভব বাড়াতে পারল? উত্তরে বিশেষ করে মানুষের দুটি অবয়বের উল্লেখ প্রয়োজন। হাত আর মস্তিষ্ক। এবং এই দুটি অবয়বেরই বিকাশ নির্ভর করছে গাছের বাসা ছেড়ে সমতল জমিতে সোজা হয়ে চলাফেরা করতে শেখার উপর। তাই প্রাণীজগতের ইতিহাসে এই ঘটনা এমন যুগান্তকারী।

হাতের আর মস্তিষ্কের বিকাশ পরে আলোচিত হবে।

মনোবিৎ-এর ডায়েরি থেকে

(১)

পাভলভীয় পদ্ধতিতে নিউরোসিসের চিকিৎসা

নিউরোসিসের ব্যাপকতা ও প্রসার আমেরিকার হারে না হলেও আমাদের দেশেও ক্রমবর্ধমান। আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের মত এখানেও চিকিৎসার ব্যাপারে খুবই অব্যবস্থা। রোগীর চিন্তা ও ক্রিয়াকলাপকে ভিত্তি করে যে চিকিৎসা করা হয়, তার চলতি নাম 'সাইকো থেরাপি'। ওষুধ পত্র বা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ছাড়া এ চিকিৎসা চলতে পারে বলে এ ক্ষেত্রে হাতুড়ের প্রাদুর্ভাব ও আধিপত্য খুব বেশী। আছেন সাধু, সন্ন্যাসী, যাজক, পুরোহিত, জ্যোতির্বিদ থেকে আধ্যাত্মিক শক্তির আধার গুরুদেব ও গুরুদেবী, আছে অসংখ্য জলপড়া, ধূলোপড়া, মাদুলী কবচ মুষ্টিযোগ। এদের হাত পেরিয়ে চিকিৎসকের হাতে আসতে সমস্ত রোগীর বেশ খানিকটা সময় লাগে। অবশ্য অনেক সময় এদের হাতেও কিছু কিছু রোগীর উপসর্গের সাময়িক উপশম ঘটতে দেখা যায়। এতে এদের পসার বাড়ে আর মানসিক রোগের কারণ অলৌকিক রহস্যে ঘেরা বলে সাধারণের বিশ্বাস জন্মে! এরপর সমধিক প্রচারিত 'সাইকোথেরাপী' পদ্ধতির নাম "সাইকো এ্যানালিসিস," ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষা পদ্ধতি। আমেরিকা, ফ্রান্স ও আমাদের দেশে এর প্রচলন বেশী। আমেরিকায় অবশ্য আজকাল নিউ-ফ্রয়েডিয়ানের দলের আধিপত্য বেশী। এরা নিজেদের বলেন cultural Pycho-analysts। এদের পুরোধায় ছিলেন ফ্রম, হর্নি, আলেকজাণ্ডার। এদের মধ্যে ডাক্তার ছাড়া কিছু সংখ্যক lay psycho-analysts ও আছেন। আমাদের দেশে এরা সাধারণতঃ দর্শন বা মনস্তত্ত্বের অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত। সমাজ-তান্ত্রিক দেশ ছাড়া আর কোথাও পাভলভীয় তত্ত্ব ও চিকিৎসা পদ্ধতি এ যাবত প্রসার লাভ করে নি।

'মানব মন' এর পূর্ববর্তী সংখ্যায় 'মনরোগের কারণ নির্ণয়' প্রসঙ্গে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের নানাদিক নিয়ে বিচার ও মনরোগের কারণ সম্পর্কিত পাভলভীয় গবেষণার উল্লেখ করা হয়েছে। এবার পাভলভীয় চিকিৎসা-পদ্ধতি নিয়ে সাধারণের বোধগম্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

বলা উচিত কুকুরের মধ্যে নিউরোসিস উৎপাদন করে, পাভলভ ও তাঁর সহকর্মীরা নিউরোসিস ও অন্যান্য মনরোগের কারণ সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করেন। চিকিৎসা সম্বন্ধেও এই উপলক্ষে তাদের অভিজ্ঞতা বাড়ে। পাভলভের সময় কেফিন ও ব্রোমাইড—এই দুটি ওষুধ খুব ব্যবহৃত হত। কুকুরের নার্ভতন্ত্রের টাইপ অনুযায়ী ওষুধের সঠিক মাত্রা নির্ণয় করে তাঁরা ফলও পেয়েছিলেন। কেফিন উত্তেজনাক্রিয়া ও ব্রোমাইড্ প্রধানতঃ নিস্তেজনার ক্রিয়াকে শক্তিশালী করে। এ-ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে অসুস্থ প্রাণীকে সমস্যা সমাধানের দায় থেকে মুক্তি দিয়েও [বিশ্রাম] তাঁরা ফল পেয়েছেন। বলা বাহুল্য সাইকোথেরাপী শুধু মানুষের বেলায় প্রযোজ্য। আমাদের আলোচনা পাভলভীয় সাইকোথেরাপী পদ্ধতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

হিস্টিরিয়া

বর্ধমান জেলার এক ছোট শহর থেকে স্বামী স্ত্রীকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে এলেন। ভদ্র মহিলার নাম ধরুন সরমা। বয়স ৩৫, তিনটি সন্তানের জননী। খুবই শীর্ণকায়, দেখতে মোটামুটি সুশ্রী। চোখ দুটোতে

বিহ্বল দৃষ্টি। এক রকম ধরাধরি করেই নিয়ে আসা হল। খুবই দুর্বল। দাঁড়াতে পারে, যদিও চলাফেরা দুষ্কর। মাস খানেক নাকি জলটুকু পর্যন্ত গলা দিয়ে নামছে না। মাঝে মাঝে "মা মা" করে চীৎকার করে উঠছে। খাওয়ানোর অনেক কিছু চেষ্টা হয়েছে—সবই বিফল। স্বামী শিক্ষিত মাঝারিগোছের সরকারী কর্মচারী। অবস্থা মোটামুটি ভাল। তিনি এসেই আমাকে চুপি চুপি বললেন—একজন তান্ত্রিক সন্ন্যাসী অবশ্য বলেছেন, এক বিদ্রোহী আত্মা ওকে ভর করেছে। আমি ওসব ভুতুড়ে ব্যাপারে বিশ্বাস করি না। তবে দ্রব্যগুণ নিশ্চয়ই আপনারা মানেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওকে কেউ কিছু খাইয়েছে। আচ্ছা স্যার বিষের ক্রিয়ায় এমনটি কি হতে পারে না। আমি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানতে চাইলাম। তিনি বলতে সুরু করলেন।

"আমাদের সুখের সংসার। প্রায় ২০ বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে। ভগবানের আশীর্বাদে অভাবের মুখ কোনোদিন দেখিনি। ছোট শহরে থাকি, কাজেই পাঁচজনে জানে ও মানে। এখানে আছি তিন বছর। বছর দুয়েক হল শাশুড়ী ঠাকরুন আমার কাছে আসেন চিকিৎসার জন্য। তাঁর অন্ননালীতে ক্যান্সার হয়েছিল। প্রায় আট মাস হাসপাতালে রাখি আমারই খরচায়; শ্যালকটি আমার একেবারেই যাকে বলে অপদার্থ। হাসপাতাল থেকে এক রকম জবাব দেবার পর ওর মেয়ের অনুরোধে শাশুড়ীঠাকরুন আমার ওখানেই এসে রইলেন। বুঝলেন স্যার, চিকিৎসার কিছু ত্রুটি আমি হতে দিইনি। বছর খানেক ধরে টিউব বদলানো, ইঞ্জেকশন দেওয়া, সবই আমি ডাক্তার দিয়ে করিয়েছি। গত ছয় মাস আগে খাওয়া বন্ধ হল। নাক দিয়ে খাওয়ানোর চেষ্টা চলতে লাগল। আমি কোনো ব্যাপারে কোনোদিন কার্পণ্য করিনি। যদিও সরমার মনে হচ্ছিল আমি নাকি ওর মাকে নিয়ে অসুবিধায় পড়েছি। মাঝে মাঝে ও বলত, দেখ না বাইরে কোথাও রাখা যায় নাকি? দুর্গন্ধে তোমার ত খাওয়াই হচ্ছে না।

"সংক্ষেপে বলুন"—না বলে পারলাম না।

একটু লজ্জিত হয়ে ভদ্রলোক বললেন "ডাক্তার রুদ্র আমাকে আনুপূর্বিক সব কথা খুলে বলতে বলেছেন কিনা, তাই……। আচ্ছা এবার আমি সংক্ষেপেই বলছি। মরবার আগে শাশুড়ীঠাকরুন কেমন যেন হয়ে গেলেন। ষাট বছর বয়স, বিধবা, দু'বছর ধরে মৃত্যু কামনাই করে এসেছেন। আর ঐ রকম যন্ত্রণা, দুর্ভোগে কেই বা বাঁচতে চায় বলুন। কিন্তু মরবার দিন তিনেক আগে থেকে খালি বলতে লাগলেন—"আমি যাব না, সরো আমি যাব না। আমার বড় ভয় করছে, আমি মরতে পারব না। তোকে ছেড়ে আমি যাব না।" তাঁর মৃত্যুতে সরমা খুব বেশী শোকার্ত হয়নি। বরঞ্চ তাঁর কষ্টের লাঘব হল বলে স্বস্তির নিঃশ্বাসই ফেলেছিল। মাসখানেক আগে পাশের সরকার বাড়ী সত্যনারায়ণ পুজো ছিল। সরকারদের সঙ্গে আমার কিছুদিন হল সদ্ভাব নেই। সে-অনেক কথা…। ওদের একটি ছেলের চাকরী যায়। সরকারী অস্থায়ী চাকরী। ওদের ধারণা আমি নাকি তার নামে রিপোর্ট করেছি বলে চাকরী গেছে। আমি স্যার একটু স্ট্রিক্ট বটে, কিন্তু ওসব কাজ, মানে কারুর অন্ন মারবার কাজ, আমাকে কেটে ফেললেও আমার দ্বারা হবে না। তবে আমি চাই না যে,-আমার স্ত্রী-ছেলেমেয়ে ওদের সঙ্গে মেলামেশা করে। উনি আমাকে লুকিয়ে গিছলেন। টের পেলাম যখন রাত্রে ওঁকে বার দুয়েক উঠতে দেখলাম। বললেন, সরকার বাড়ীর সিন্নি খেয়ে পেট ঘোলাচ্ছে। পায়খানাটা একটু দূরে। তন্দ্রা এসেছে, এমন সময় ওঁর চীৎকার শুনলাম।—হন্তদন্ত হয়ে গিয়ে দেখি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন ঠিক পায়খানার বাইরে। জ্ঞান হবার পর থেকে এই রকম অবস্থা। 'মা-মা-তুমি এখান থেকে চলে যাও'—থেকে থেকে খালি এই কথা বলছেন। তাও জড়িয়ে জড়িয়ে অতি কষ্টে। ঠিক যেমন করে ওর মা শেষের দিকে বলতেন। এরপর থেকে খাওয়া বন্ধ হতে লাগল। প্রথমে শক্ত জিনিস—এখনত জল

পর্যন্ত গলা দিয়ে নামে না। প্রথমটায় রোজা এল। ঝাড় ফুঁক চলল। ফল হল না। তারপর এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী এসে যজ্ঞ করলেন। সবার এক কথা: ওর মায়ের আত্মা ওকে ভর করেছে। আমি স্যার, সায়েন্স গ্রাজুয়েট। বুজরুকিতে বিশ্বাস করি না। তবে জানেন ত' সেই শেক্‌স্‌পীয়ারের কথা—"দেয়ার আর মেনি থিংস অন্ আর্থ। হোরেশিও.....।" তাছাড়া চেষ্টা সবদিক দিয়েই করা উচিত। শুধু সাধু সন্ন্যাসী নিয়েই আমি বসে নেই। ডাক্তারও দেখাচ্ছি। আজ তিনদিন হল কোলকাতায় এনে স্পেশালিস্ট দেখিয়েছি। তাঁরা ত' বললেন —না ক্যান্সার নয়; যদিও গেলার কষ্ট শাশুড়ি ঠাকরুনেরই মত। কোথাও কোন দোষ খুঁজে পাচ্ছেন না। রক্ত পরীক্ষা করেও দোষ পাওয়া গেল না। দ্রব্যগুণে পাগল হয়—আমি বিশ্বাস করি, স্যার। আমার মনে হয়—সরকারদের সিন্নিতে কিছু একটা তারা মিশিয়ে দিয়েছে।.....
এমনি সময় রোগিণী অস্পষ্ট ভাসা গলায়..."অই...অই!...না আমি যাব না...মা, আমি যাব না..." বলে চেঁচিয়ে উঠল।

পরীক্ষা করলাম। রক্তচাপ কম। নাড়ীর গতি মৃদু। এ-ছাড়া বিশেষ কোনো উপসর্গ ধরা পড়ল না। শুধু বাঁদিকের হাতে ও পায়ে অসাড়তা লক্ষ্য করলাম। শুনলাম—ভদ্রমহিলা চিরকালই দুর্বলমনা। অল্পতেই উত্তেজিত হতেন। অল্পে আহত হতেন। কবিতা লেখার বাতিক ছিল। যেমন, বেশী হাসতেন, হৈ-চৈ করতেন, ঠিক তেমনি অল্পেতেই মুষড়ে পড়তেন, কাঁদতে তাঁর খুব বেশী সময় লাগত না। হাসি-কান্না কখনও কখনও একই সঙ্গে ফুটে উঠত তার চোখে। মাকে খুবই ভাল বাসতেন। বিয়ের-পর অনেক রাতে লুকিয়ে লুকিয়ে নাকি মায়ের জন্য কেঁদেছেন।

বেশী ইতিহাস শোনবার প্রয়োজন ছিল না। সব মানসিক রোগের চিকিৎসকই এ-রোগী ভালভাবে জানেন। উনিশ শতকের শেষ দিকে পশ্চিম ইয়োরোপে এই হিস্টিরিয়ার রোগী খুব বেশী দেখা যেত। সাহিত্যে আবেগপ্রবণ, কোমল, অসহিষ্ণু—প্রায়ই ফিট হয়, এমন নায়িকার সাক্ষাৎ মিলত খুব বেশী। শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের ব্যবহার ও চরিত্রেও হিস্টিরিয়ার লক্ষণ বেশ স্পষ্ট। ফ্রয়েডের চিকিৎসাজীবন শুরু হয় এই রোগী দিয়ে। হিষ্টিরিয়ার কারণ সম্বন্ধে ফ্রয়েডীয়দের মতামত অনেকের কাছেই সুবিদিত, সে নিয়ে এখানে আলোচনা করব না।

পাভলভীয় বিচারে মেয়েটির নার্ভতন্ত্রের টাইপ "নিস্তেজনাধর্মী" বা (Inhibitory) সোজা কথায় মেয়েটি দুর্বল, তার সহ্য ক্ষমতা কম। অবার এর মস্তিষ্কে প্রথম সাংকেতিকতন্ত্রের প্রাধান্য, মানে অনুভূতি প্রবণতা বেশী: পাভলভের ভাষায় "আর্টিষ্ট টাইপ"। হিষ্টিরিয়া—এই আর্টিষ্ট টাইপের রোগ। মেয়ে-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই হিষ্টিরিয়া রোগী আছেন।

হিষ্টিরিয়ার ফিটের (fit) সঙ্গেই সাধারণের পরিচিতি। হিষ্টিরিয়ার উপসর্গ কিন্তু শুধু ফিটেতেই সীমাবদ্ধ নয়। সর্বাঙ্গের আক্ষেপ ইংরাজিতে যাকে বলি convulsion , আর আজকাল খুব বেশী চোখে পড়ে না। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্যারালিসিস্, অসাড়তা, অত্যধিক বেদনাবোধ, বধিরতা, অন্ধত্ব, বাক্‌শক্তিহীনতা—এগুলি হিষ্টিরিয়ার খুব সাধারণ লক্ষণ। প্রথম মহাযুদ্ধের সংগ্রামী ফৌজের মধ্যে এই রোগের প্রসার ঘটেছিল ব্যাপক-ভাবে। আকস্মিক মানসিক আঘাত ও বিপৎপাতের আশু সম্ভাবনা থেকে হিষ্টিরিয়ার উৎপত্তি। বিশেষ ধরনের নার্ভতন্ত্র বিশিষ্ট নরনারীর ক্ষেত্রে অবশ্য একথা প্রযোজ্য।

সুস্থ মানুষের বেলায় গুরুমস্তিষ্ক। বাইরের জগতের সঙ্গে লেনদেন করে, সব কিছুর সঙ্গে মানিয়ে নেবার ব্যবস্থা করে। মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশকে নিয়ন্ত্রিত করে ও তাদের সুশৃঙ্খল ক্রিয়াকলাপের দায়িত্ব

গুরুমস্তিষ্কের। গুরুমস্তিষ্কের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে বাক ও চিন্তার স্তর, বিবর্তনের সিঁড়ির সব থেকে উঁচু ধাপ। এই বাক ও চিন্তাশক্তি আসলে সুস্থ মানুষের জাগ্রত অবস্থার সব কিছু ক্রিয়াকলাপ ও ব্যবহারের নিয়ামক ও শৃঙ্খলারক্ষক।

সরমার মত অধিকাংশ হিস্টিরিয়া রোগীরই মস্তিষ্কে নিস্তেজনাধিক্য থাকে, মানে তারা অল্প আঘাতেই নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং তারা স্বভাবতঃ অনুভূতি প্রবণ। এই নিস্তেজনা তার দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্রকে মানে বাচন ও চিন্তার স্তরকে করে আক্রান্ত, ফলে ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির তীব্রতা আরও বাড়ে ও সেখানে বিশৃঙ্খলা দেখা যায়, ব্যবহার ও চিন্তার সংহতি বিনষ্ট হয়।

সরমার ইতিহাস থেকে বোঝা গেল অন্ননালীর ক্যান্সারের ভয় তার মনের মধ্যে সঞ্চিত ছিল। সরকার বাড়ীর সত্যনারায়ণের সিন্নি সে খুব প্রসন্ন মনে গ্রহণ করে নি। স্বামীর বারণে মনে হয়েছিল বাধার সৃষ্টি। তাছাড়া ঐ সময় ক্যান্সার সংক্রামক ব্যাধি কিনা এই রকম প্রশ্ন তুলেছিলেন একজন। সরমার গলা দিয়ে সিন্নি নামতে চাইছিল না এই সব কারণে। গলাধঃকরণের অসুবিধা তার মনের গোপন ভীতিকে জাগিয়ে তুলল—মায়ের-মৃত্যু-পূর্ব প্রলাপ মনে পড়ল, কল্পনায় নিজেকে মায়ের মত ব্যাধিগ্রস্ত বলে মনে করে বসলো। ভয় ও দুশ্চিন্তায় মস্তিষ্ক আরও দুর্বল হয়ে পড়ল। এই অবস্থায় জ্যোৎস্নারাতে নিজের ছায়া দেখেও মানুষ ভয় পায়। এই ভয় মস্তিষ্কের কিছু কোশকে একেবারে অসাড় করে দিল। বিশেষ করে কণ্ঠনালীর ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রক কোশগুলোকে। ফলে, ঘটল কণ্ঠনালীর মাংসপেশীর অনৈচ্ছিক আক্ষেপ—Spasm. ভয় আরও বেড়ে গেল। বাক্‌যন্ত্রেও আংশিকভাবে সংক্রামিত হল অসাড়তা। রোজা, সন্ন্যাসী, পরিবারের লোকদের কথাবার্তায় সরমার মনে 'মায়ের আত্মা তাকে ভর করেছে'—এই ধারণা হল বদ্ধমূল।

পাভলভের মতে হিস্টিরিয়া রোগে—দুটি সাংকেতিক তন্ত্র [যারা সাধারণতঃ পরস্পর নির্ভর] একদম বিশৃঙ্খল হয়ে যায় ; পরস্পর নিরপেক্ষ হয়ে পড়ে। যেমন ঘটে মাদক দ্রব্যের প্রভাবে অথবা হিপনটিজম-এর প্রয়োগে। Charcot-এর মত পাভলভ-ও মনে করেন হিস্টিরিয়া রোগী সর্বদাই আংশিক ভাবে সম্মোহিত। অনেক কারণেই এ রকম ঘটে। আত্মীয় বিয়োগ, ব্যর্থ প্রেম, আর্থিক বিপর্যয়, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, আত্মসম্মানে আঘাত, অসুখী বিবাহিত জীবন ইত্যাদি দরুন নিষ্ক্রিয়তা প্রবণ, আর্টিস্ট টাইপের মধ্যে সহসা বা ধীরে ধীরে রোগ লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। প্রতিকূল সমাজ ব্যবস্থা, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতাবোধ নিউরাসিসের জনক—একথা "মনরোগের কারণ নির্ণয়" নিবন্ধে উল্লিখিত হয়েছে।

ভয় জীবন রক্ষার সহজাত প্রবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করে, সেইজন্য প্রক্ষোভ (emotion) প্রভাবে ভয় আরও জীবন্ত, আরও তীব্র হয়ে ওঠে। গুরু মস্তিষ্ক থেকে ভয়ের স্রোত নীচুর দিকে নামতে থাকে। ফলে একদিকে নিম্ন মস্তিষ্কের প্রাণরক্ষক কেন্দ্রগুলি চঞ্চল হয়ে ওঠে, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দ্রুত হয়, রক্তচাপ বাড়ে, পেশীর মধ্যে অনুভূত হয় চাপা উত্তেজনা। অন্যদিকে দ্বিতীয় সাংকেতিকতন্ত্রের দুর্বলতা ও নিস্তেজনার দরুন বিচার বিবেচনা শক্তি কমে যায় ; ভয়কে প্রতিহত করার শক্তি লোপ পায়।

সরমার কথায় ফিরে আসা যাক। "সম্মোহিত অবস্থায় অভিভাবন" (suggestion under hypnosis) এক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত। আত্মসম্মোহিত অবস্থাতে সে রয়েছে, নিজের দেওয়া ক্ষতিকারক অভিভাবন থেকে তাকে মুক্ত করাই প্রাথমিক কর্তব্য। সম্মোহিত করতে খুব বেগ পেতে হল না। বেশীর ভাগ হিস্টিরিক

রোগীকে সম্মোহিত করা সহজ। পর পর দুদিন সম্মোহিত অবস্থায় তাকে বলা হল যে তার ক্যান্সার হয়নি, সে অনায়াসে গিলতে পারবে, তার গলা দিয়ে সব রকম খাবার নামবে; সে কথা বলতে পারবে; তাকে বিষ খাওয়ানো হয়নি। তিন দিনের দিনে দুধ রুটি ও চতুর্থ দিন থেকে সে সব রকম খাবার খেতে শুরু করল। দৃষ্টি কিন্তু পুরোপুরি স্বাভাবিক হল না, কথাও বলতে চায় না। এক সপ্তাহ পরে এবার অভিভাবনে বলা হল, তার মা স্বর্গে গেছেন, তিনি পুণ্যাত্মা, তিনি মেয়ের কোনো ক্ষতি করবেন না। আরও বলা হল, তার কোনো রোগ হয়নি, এখনও দীর্ঘ দিন সুস্থ ভাবে সে বাঁচবে। এর পর চোখমুখের চেহারা বদলে গেল, স্বাভাবিক কথাবার্তা ও সাংসারিক কাজ কর্মে মন দিতে পারল। মোটামুটি ভাবে সুস্থ হয়ে উঠল। এইভাবে রোগ সারানোর পদ্ধতি নতুন নয়। সম্মোহিত করে রোগ সারানো ব্যবস্থা আড়াই হাজার বছরের পুরনো। উনিশ শতকের শেষ দশকে ফরাসী দেশে প্যারী ও ন্যান্সীতে এই চিকিৎসার খুবই প্রসার ঘটেছিল। ফ্রয়েড হিপ্‌নটিজম প্রয়োগে হিস্টিরিয়া চিকিৎসা করেছেন।

কিন্তু পাভলভের আগে হিপনটিজম্‌-এর বৈজ্ঞানিক শারীরবৃত্তগত ব্যাখ্যা কেউউ দিতে পারেন নি। কাজেই ম্যাজিসিয়ান ও শারলাটানদের হাতে পড়ে হিপনটিজম্‌ মায়াবাদী রহস্যে আবৃত্ত হয়েছিল। হিপনটিজম আলোচনা বর্তমানে মুলতবি থাক। সময়ান্তরে আলোচনা হবে। হিপনটিনজম্‌ কোনো অধ্যাত্মশক্তির খেলা নয়, মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করার এক বিজ্ঞানসম্মত উপায়—এইটুকু মাত্র এখানে বলতে চাই।

অনেক দিন চিকিৎসা পদ্ধতিকে অপাঙ্‌তেয় রেখে কয়েক বছর হল বৃটিশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন একে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এমন কি গোঁড়া ফ্রয়েডিয়ানরাও এই পদ্ধতির প্রয়োগ করছেন আমেরিকায়। হিপ্‌নো-অ্যানালিসিস্‌—কথাটি ও তার প্রয়োগ সিনেমা, নাটকে, উপন্যাসে খুবই চালু। তবে এখনও, বেশীর ভাগ লোক এই ধারণা পোষণ করেন যে-হিপনটিজম পদ্ধতিতে উপসর্গ দূর হয় বটে, তবে রোগ সারেনা। আবার কিছুদিন পরে অন্য ধরনের উপসর্গ বা একই উপসর্গ দেখা দিয়ে থাকে। কথাটা সত্যি, আবার সত্যি না।

রোগের মৌলিক কারণ নির্ণয় করার চেষ্টা না করে কেবল উপসর্গ উপশমের suggestion দিলে—রোগ সারবে না। সাময়িকভাবে উপশম ঘটবে। রোগী তার ভ্রান্ত সংস্কার ও ধারণা ও অপরিণত ব্যক্তিত্ব নিয়ে পুরণো পরিবেশের মধ্যে যদি ফিরে যায়, তবে এটাই স্বাভাবিক, আবার আঘাত লাগলে তার নতুন করে উপসর্গ দেখা দিবে। এ আর কোন রোগের বেলায় ঘটে না?

সরমার বেলায় কি ঘটল বলি। পাঁচ, ছটা সেশনের পরই ডাক্তারের মতামত অগ্রাহ্য করে তারা বাড়ী ফিরে গেল। রোগ লক্ষণ নেই কিন্তু সরমার নার্ভতন্ত্র যে-দুর্বল সেই দুর্বলই রয়ে গেল, রয়ে গেল তার পুরণো সংস্কার আর অন্ধ বিশ্বাস। এই সমাজ সম্পর্কে, ব্যক্তি ও সমাজের বিরোধ সম্পর্কে তার জ্ঞানের অভাব। বছর খানেকের মধ্যেই চিঠি পেলাম তার স্বামীর। আবার সেই অবস্থা, শুধু অন্ননালী নয়, এবার কণ্ঠস্বরও সম্পূর্ণভাবে বন্ধ।

এখানে আর একটি রোগীর কথা তুলব। সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার শক্তি ও সমাজ-সচেতনতা লাভ করেছিল চিকিৎসার ফলে। তার চিকিৎসা সম্পূর্ণ করার সময় দিয়েছিল। আমার এক বন্ধু স্থানীয় এক হাসপাতালের Chest Depertment-এর সঙ্গে অনেক দিন ধরে সম্পর্কিত। প্রায় ১০ বছর আগে তিনি একদিন গল্পচ্ছলে বললেন—প্রায় মাস ছয়েক হাসপাতালের একজন রোগীর স্বর বন্ধ হয়ে গেছে,—মনে হয় হিস্টিরিয়া। সমস্ত ডিপার্টমেন্ট ঘুরিয়ে আনা হয়েছে। কোনো কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। দেখবে না কি একবার?

আমি রাজী হলাম। বিভাগীয় বড় কর্তার যথারীতি অনুমতি নেওয়া হল। ছেলেটি হাসপাতাল থেকে পরদিন সকালে আমার কাছে এসে হাজির। কথা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়েছে বলা চলে না। খুব চেষ্টা করে ফিসফিস করে কথা বলতে পারে। কয়েক হাত দূর থেকে সে কথা শোনা যায় না। Aphasia ঠিক নয়, Aphonia বলা চলে। রোগী তার বক্তব্য লিখে এনেছিল। পাস-টাশ কিছু করেনি ছেলেটি। তবে বেশ চালাকচতুর।

তার ফ্রোনক নার্ভ-এর উপর অপারেশন চলছিল, সেই অবস্থায় অপারেশন টেবিলেই তার স্বর বন্ধ হয়। ছেলেটি বছর পাঁচেক ফুসফুসের যক্ষ্মা রোগে ভুগছিল। এ-রোগের ওষুধপত্র, চিকিৎসাবিধি দেখলাম মোটামুটি তার জানা। ফ্রেনিক্ নার্ভ-এর অপারশন ও তার ফলাফল ওর সুবিদিত। অপারেশনটি অতি সাধারণ পর্যায়ের, তাই বহির্বিভাগের রোগীদের উপর এ অপারেশন চলে। এ-অবস্থায় ছেলেটির ভয় পাবার কথা নয়। বিশেষজ্ঞের অভিমত Functional paralysis of Vocal Chord—অর্থাৎ স্বরতন্ত্রীর কার্মিক [বিকলতা জনিত] অসাড়তা। ভয় ছাড়া এই অসাড়তার আর কি কারণ থাকতে পারে? ছেলেটি লিখে জানাল সে ভয় পেয়েছিল। কেন? অপারেশন করা হচ্ছিল স্থানীয় অনুভূতির বিলোপ করে, তাকে অজ্ঞান করা হয়নি। সে সজাগ ছিল, ডাক্তারদের কথা বার্তা শুনছিল একাগ্র মনে। নার্ভটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—এবং বড় বেশী রক্তপাত হচ্ছে—এই রকম কথাবার্ত্তা শুনছিল। তার মনে হল বোধ হয় তার উপর আনকোরা সদ্য পাস করা ডাক্তার কিম্বা ছাত্র হাত পাকাবার বন্দোবস্ত করেছে। সে উদ্বাস্তুদের হাসপাতালের বাসিন্দা, তার প্রাণের বোধ হয় কোনো দাম নিশ্চয়ই নেই। সে নিশ্চয়ই মরে যাবে—এ রক্তপাত বন্ধ হবে না...। এ ধরনের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে একটা হিমপ্রবাহ তার শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে এল। সে চীৎকার করে প্রতিবাদ করতে চাইল। আবার মনে হল প্রতিবাদ করলে হাসপাতাল থেকে বরখাস্ত করে দেবে নিশ্চয়ই। কোথায় সে যাবে? সত্যিকারের সে সময় এ শহরে তার মাথা গোঁজবার ঠাঁই ছিল না। তার আত্মীয় স্বজনরা তাকে পোষণ করতে রাজী নয়, সে ভালভাবেই তা জানত। নিজের এক পয়সার সামর্থ্য নেই। একদিকে প্রাণর ভয়ে চীৎকার করে প্রতিবাদ করার ইচ্ছা, আর একদিকে নিরাশ্রয় হবার ভয়ে সেই ইচ্ছাকে দমন করার চেষ্টা। এ সংঘাতে নিশ্চল অসাড় হয়ে গেল তার স্বরতন্ত্রী!

হিপনটিক চিকিৎসাতে কয়েকদিনের-মধ্যে সে কণ্ঠস্বর ফিরে পেল। হাসপাতালের চিকিৎসকদের সামনে তাকে প্রদর্শন করে তার রোগ উপসর্গের ব্যাখ্যা করলাম। কিন্তু সেখানেই চিকিৎসা শেষ হল না। বৈজ্ঞানিক বিধিমত চিকিৎসায় তার ফুসফুসের রোগ সারছিল না। এর মূলে ছিল তার রোগী হয়ে থাকবার বাসনা। ভাল হলে কোথায় থাকবে, কি খাবে কিছুরই ঠিক ছিল না। ঐ বয়সেই বঞ্চিত হয়ে মানুষের উপর এসে গিয়েছিল তার ঘৃণা ও বিদ্বেষ। আত্মবিশ্বাস ও অন্যের উপর বিশ্বাস—দুইই হারিয়ে বসেছে। তার আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে না আনলে, তার নার্ভতন্ত্রের সহনশীলতা না বাড়াতে পারলে, শুধু যে আবার হিস্টিরিক উপসর্গ দেখা দেবার সম্ভাবনা থাকবে তাই নয়, তার টি.বি'ও সারবে না—এ-বিশ্বাস আমার জন্মাল। চিকিৎসা আরও মাস চারেক চলল। সে হাসপাতাল ছাড়ার পর পুনর্বাসনের জন্যও আমাকে সামান্য কিছু করতে হল। আমি তার খবর রাখি। এখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ, বিবাহিত, সন্তানের পিতা ও সরকারী কাজে নিযুক্ত। সরমার মত তাকে চিকিৎসার জন্য আর আসতে হয় নি।

ছেলেটির পূর্ণাঙ্গ রোগ ইতিহাস ও সরমার দ্বিতীয় দফায় চিকিৎসার বিবরণ আগামী সংখ্যাতে থাকবে।

নিউরোসিস যে একান্তভাবে সামাজিক রোগ তার প্রমাণ এবং এই নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতামূলক ও বঞ্চনাভিত্তিক সভ্যতা কিভাবে সুস্থ মনকে অসুস্থ করে তোলে তার পরিচয় এদের ও অন্যান্য রোগীদের ইতিহাস। পাভলভীয়ান সাইকোথেরাপির আসল উদ্দেশ্য বস্তুবাদী বিশ্লেষণের সাহায্যে সমাজের প্রকৃত চিত্র উদ্‌ঘাটন। সমাজ ও ব্যক্তি সম্পর্কের বিরোধ যতটা সম্ভব দূরীকরণ ও ব্যক্তির ভয়ও বিভ্রান্তি-নিরসন, সর্বোপরি অভিভাবন ও আশ্বাসের সাহায্যে সহনশীলতা বর্ধন। এ-ছাড়া পাভলভীয় শারীরবৃত্তমূলক ব্যাখ্যার সাহায্যে কার্মিক উপসর্গ—functional symptom গুলোর তাৎপর্য নিরূপণ ও চিকিৎসার অঙ্গ। এখানে চিকিৎসকের ভূমিকা সক্রিয় ও গঠনমূলক ভাবে রোগীর জ্ঞান ও চৈতন্যকে প্রভাবিত করা; ফ্রয়েডীয় পদ্ধতির বিপরীত বলা চলে।

আমেরিকা ও সোভিয়েতের শিক্ষক

প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত

"মানব মন"-এর গত সংখ্যায় (জুলাই-সেপ্টেম্বর) আমেরিকা, ভারত ও সোভিয়েতের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই সংখ্যায় আলোচ্য বিষয় সোভিয়েত ও আমেরিকার সমাজে শিক্ষকদের স্থান, তাঁদের ভূমিকা, তাঁদের শিক্ষা ও বেতন ইত্যাদি।

সোভিয়েত ইউনিয়নে মোট জনসংখ্যার অনুপাতে এক চতুর্থাংশ লোক কোনো-না-কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতি বৎসর শিক্ষালাভ করে থাকে। আমেরিকার শিক্ষার অনুপাতও প্রায় এই রকম। কিন্তু এত অধিক সংখ্যক লোককে শিক্ষার সুযোগ দেওয়াটাই শেষ কথা নয়; শিক্ষার সফলতাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। গণতন্ত্রের আদর্শই হচ্ছে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার। বহু সংখ্যক লোকের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রয়োজন বহু সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষক, এবং এই শিক্ষকদের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করে শিক্ষার সফলতা। আবার শিক্ষকদের উপযুক্ততা নির্ভর করে সমাজে তাদের স্থান, তাদের নিজেদের শিক্ষা, তাদের বেতন ইত্যাদি বিষয়ের উপর। শিক্ষার সফলতা বা বিফলতার সঙ্গে শিক্ষকদের অবস্থার প্রশ্নটিও ওত-প্রোতভাবে জড়িত।

আমেরিকায় যে বিরাট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তার প্রধান দুর্বলতা হল প্রথমত, শিক্ষার্থীর তুলনায় শিক্ষকের অভাব; দ্বিতীয়ত, সাধারণভাবে সব বিষয়ের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব; তৃতীয়ত, বিজ্ঞান বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। সোভিয়েতের প্রথম স্পুৎনিকের পর আমেরিকান সিনেটে আমেরিকার শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষভাবে যখন তদন্ত করা হয় এবং বহু সংখ্যক শিক্ষাবিদের মতামত গ্রহণ করা হয়, তখন প্রত্যেকে উপরিউক্ত ভয়াবহ গলদগুলির উল্লেখ করেন।

বস্তুত আমেরিকার শিক্ষা-সংকট ও শিক্ষকের অভাব দিনের পর দিন যেভাবে তীব্রতর হয়ে উঠছে তাতে আমেরিকার চিন্তাশীল ব্যক্তিরা খুবই শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। সাপ্তাহিক New Leader-এর সম্পাদক গভীর দুঃখ প্রকাশ করে লিখেছেন (১৬ই জুন, ১৯৫৮): "Most revealing is the way the once proud profession of teaching is being shunned. An additional 228,000 teachers are needed this. Year in elementary and secondary schools to meet enrollment increases and to replace teachers leaving the schools. Yet only 98,000 college graduates qualified for teaching last year and of those, only 70% actually went into the schools. More than 100,000 left the profession last year. The pay offered to teachers is certainly one reason. One of every four teachers receives less than $ 3,500 a year and about 46,000 get less than $ 2,500." শুধু যে স্কুলগুলিতেই শিক্ষকের অভাব তাই নয়, কলেজ ও ইউনিভার্সিটিগুলিতেও এই অভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। New Leaderএর সম্পাদক বলেন: "At 829 colleges & universities recently queried, 1,196 teaching positions were unfilled. And while 40%

of all college teachers had doctoral degrees in 1953-54 within three years the figure had dropped to 23% more over, during the same period the percentage with less than a M.A. has risen from 18 to 23."

বিজ্ঞানের অধ্যাপক Irving Adler বিখ্যাত Nation পত্রিকায় (১০ই মে, ১৯৫৮) দেখিয়েছেন যে, আমেরিকায় ১৯৫০ সালে যেখানে ৯০০০ বিজ্ঞানের শিক্ষক পাস করে বেরিয়েছিলেন, ১৯৫৬ সালে সেখানে ৪,৩০০ জন পাস করেছিলেন ও তার মধ্যে মাত্র ৬০% শিক্ষকতা গ্রহণ করেছিলেন ; আর গণিত শিক্ষকদের সংখ্যা নেমেছিল ৪,৬০০ থেকে ২,৫০০তে। অধ্যাপক এ্যাড্‌লার এ অবস্থার জন্য তিনটি কারণ দিয়েছেন—১) আমেরিকার সামরিক বাহিনী অসম্ভব রকমে বেড়ে যাওয়াতে, তা আমেরিকার শিক্ষিত গণশক্তিকে (trained man-power) শোষণ করে নিয়ে যাচ্ছে, ২) প্রচুর ঐশ্বর্যশালী সামরিক শিল্পগুলি বেশী বেতন দিচ্ছে, ৩) মুদ্রাস্ফীতির ফলে শিক্ষকদের প্রকৃত বেতন খুবই কমে গিয়েছে ; ১৯৩৫ সালে আমেরিকান শিক্ষকের গড়পড়তা আয় ছিল একজন সুনিপুণ শ্রমিকের সমান—যাকে ধরা যায় ১০০ ; ১৯৫৭ সালে শ্রমিকের আয় বেড়ে দাঁড়াল ৪৫০এ, কিন্তু শিক্ষকের ভাগ্যে ৩৫০-এর বেশী উঠল না।

Dr. Lee A. Du Bridge (President of California Institute of Technology) বলেন : "Teaching is clearly one of the most important, most challenging and most difficult and demanding task in a modern society. Yet we pay school teachers less than labourers, clerks and salesman....The low salaries are but a symbol of the low regard in which the teacher is held by the community. ...This I regard as a disgraceful situation."

গত মহাযুদ্ধের সময় তিন লক্ষের উপর আমেরিকার শিক্ষক শিক্ষকতা পরিত্যাগ করে বেশী বেতনের অন্য চাকুরী গ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির এই বিরাট ক্ষতি আজও পূরণ হয়নি, ভবিষ্যতে হবার সম্ভাবনাও কম। আমেরিকার দুইজন বিশিষ্ট অধ্যাপকের মতে—"California, wirh 100,000 full-time teachers, began the 1957-58 school year with a shortage of 28,000 and its State Department of Education warned that the teacher-recruitment problem would be "critical" for the next decade. Prof. Bolinger, examining the national shortage, says, 'Even if we could recruit them, we could never train them in time.' And Peter F. Dructeer estimates that college and university faculties are losing 4,000: more teachers annually than they are acquiring—at a time when they will need an increase of 250,000 in the next 20 years." (Mortimer Adler and Milton Mayer : *Revolution in Education*, Chicago University Press, 1958, pp. 134-35).

বর্তমানের এই গুরুতর শিক্ষক-ঘাটতি ভবিষ্যতে আমেরিকায় যে আরও ব্যাপকতর হবে সে বিষয়ে শিক্ষাবিদদের বিশেষ সন্দেহ নেই। ভবিষ্যতে উচ্চ শিক্ষালয়গুলির শিক্ষক-ঘাটতি সম্বন্ধে J. P. Elder (Dean of Graduate School of Arts and Sciences, Harvard University) বলেন যে "guesses about how many Ph. D. 's we shall produce between now and 1970 vary from 135,000 to 235,000-...either number is pathetically inadequate. Worse, about half of the number

estimated will not go into college-teaching." (*Journal of Higher Education*, March, 1958, Ohio State University.)

কেবলমাত্র সংখ্যাগতভাবেই নয়, গুণগতভাবেও আমেরিকান শিক্ষকদের অবস্থা দিনের পর দিন অবনতির দিকে যাচ্ছে। আমেরিকান শিক্ষকদের উৎকর্ষতা সম্বন্ধে অধ্যাপক এল্ডার উপরোক্ত প্রবন্ধে সংক্ষেপে বলেছেন : "Let us not be too sanguine here. At best as I look ahead, I foresec a drop in quality. This is bound to happen.',

Iwoa বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Arnold Rugow এ প্রসঙ্গে বলেছেন : "A good number of teachers are not much more intelligent than the brighter sections of their students... reading nothing more serious than *Readers Digest* and *Life*." (Nation, January 26, 1958.)

আমেরিকান শিক্ষকদের অযোগ্যতা সম্বন্ধে কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে Dr. Du Bridge বলেছেন : "I have seen too many students of good intellectual capacity withdraw from preparing for teaching, because they did not feel that the teacher-training programmes were of enough intellectual calibre. A teacher who aspires to teach mathematics in high schools get very little time to take mathematics in college, He has to take too many vocational and teacher-training methodology courses. I think the states have gone too far in their requirement for methodology and technique courses rather than in substantive courses."

আমেরিকার বিখ্যাত আণবিক পদার্থবিদ Dr. Edward Teller-ও এই একই অভিযোগ করেছেন— "High school teachers are being trained solely in one particular subject : how to teach. They are not well-trained in the subject matter they have to teach. The most important thing in a teacher is that he should love his subject and that he should be able to show that he loves his subject matter."

আমেরিকায় শিক্ষক হতে হলে শিক্ষক-কলেজে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা বিষয়ে কয়েকটি কোর্স নিতে হয়। অনেকেই, বিশেষ করে ছাত্রীরা এ বিষয়ে আকৃষ্ট হয় এইজন্য যে এতে পাস করা খুব সহজ। American Association for the Advancement of Science-এর প্রেসিডেন্ট ১৯৪১ বলেছিলেন : "Pedagogy has been calleda racket, a pressure group which has forced legislation more in the interest of the pedagogical profession than in the interest of the individual students. Schools of education are accused of padding their curriculum in an attempt to compete in standing with other disciplines." (*Science*, Jan 4, 1952)

আমেরিকার শিক্ষা কলেজগুলিতে এত বেশী ঐচ্ছিক বিষয় (electives) বেছে নেবার জন্য ছাত্রদের দেওয়া হয় যে, মৌলিক বিষয়গুলিকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে ছাত্ররা ডিগ্রী নিতে পারে। আমেরিকার শিক্ষা কোর্সের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, বিষয় বস্তু, অর্থাৎ যা শেখাতে হবে তার ওপর জোর পড়ে না, জোর পড়ে শিক্ষা-প্রণালী অর্থাৎ কি ভাবে শেখাতে হবে, তার উপর। আমেরিকার একজন শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাবিদ

Prof. Hutchins এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে "In general they (the teachers) are not expected to know very much about their subjects." শিক্ষক ট্রেনিং আমেরিকায় কতখানি হাস্যকর স্তরে নামতে পারে তা দেখাতে গিয়ে অধ্যাপক হাচিন্স হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও র‍্যাডক্লিফ কলেজ কর্তৃক সংকলিত ও হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক ১৯৫০ সালে প্রকাশিত *A Hand book for College Teachers* থেকে এই উদ্ধৃতিটি দিয়েছেন : "Finally, at times you can very well use some harmless 'histrionics'···suppose you are standing in front of your audience and you have in your lecture three very distinct parts. Why not for the first paragraph, stand slightly on the left side of your desk, quite naturally, and when the moment comes, say, 'Well, now, so much for the first point,' and then more gracefully to the right, and proceed with your second point ? And when you reach your climax, I mean your conclusion, you go back to the centre of the desk." (*Some Observations on American Education*, 1956, pp 85-87)

আমেরিকার শিক্ষকদের শিক্ষা সম্বন্ধে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত প্রেসিডেন্ট Nicholas Murrey Butelr বহুবৎসর পূর্বে ১৯২৭ সালে তাঁর বাৎসরিক রিপোর্টে বলেছিলেন : "...save those exceptions which here as always prove the rule, in school, in college, or in university, are and for some time past have been, in large part quite uneducated in any large and justifyable sense of that word. The elaborate training which they have so often received is a sorry substitute for education."

আমেরিকায় একটি চলতি কথা আছে—"যদি আর কিছু না করতে পার, শিক্ষক তো সব সময়ই হতে পারবে।" বোধ হয় আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থা দেখেই বার্নার্ডশ বলেছিলেন—যারা কিছু করতে পারে, তারা করে। যারা কিছু করতে পারে না তারা শেখায়। যারা শেখাতে পারে না তারা অন্যদের শেখাতে শেখায়। Prof Kandel আমেরিকান শিক্ষকদের সম্বন্ধে যা বলেছেন তা শ'র কথাটাই সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করে, "The standards of admission to the (teaching) occupation were so low that they almost seemed to bear out the notion that anybody could become a teacher." *American Education in the Twentieth Century.* 1957, p. 198)

John Deweyর প্রয়োগবাদী শিক্ষার পদ্ধতি (যে সম্বন্ধে "মানব মনে" জানুয়ারী ১৯৬২ সংখ্যায় আলোচিত হয়েছে) প্রবর্তনের ফলেই আজ আমেরিকার শিক্ষায় এই অবনতি ঘটেছে। প্রয়োগবাদী শিক্ষা প্রচলনের পর থেকেই শুরু হল বিষয়বস্তু, তত্ত্ব, সাধারণ শিক্ষার অবহেলা এবং জোর পড়ল Educational Psychology, Inlelligence Testing and Measuring, specialized Courses, School Administration ইত্যাদির উপর। এখন থেকে শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব হল শিক্ষার্থীর বুদ্ধি ও নীতিবোধের বিকাশ ঘটান নয়—আমেরিকানরা যার নাম দিয়েছে, total growth of the whole child.[১] এই প্রয়োগবাদী শিক্ষা নীতিকে ভিত্তি করেই লেখা হয়েছে psychology ও methodologyর উপর বহু সংখ্যক

(১) "As progressivism reached its full tide, the cliches, "we teach children ; not subjects," "education is the growth of the whole child" and "education is life," came to replace clear thinking and an increasing number of educators began to say that knowledge of subject matter was not really essential to the teacher, or at least it was much less important than other skills which the teacher must have." (Paul Woodring : *A fourth of a Nation*, 1957, p. 89)

বৃহৎ বৃহৎ পুস্তক—যার দ্বারা আজ আমেরিকার শিক্ষক শিক্ষাভারাক্রান্ত ও বিপথগামী। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এবং আংশিকভাবে এই সব পুস্তকের কিছু মূল্য থাকলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলি অবৈজ্ঞানিক এবং সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই বইগুলিই অন্যান্য দেশে এবং ভারতবর্ষেও শিক্ষক-শিক্ষায় সমাদর লাভ করছে!

শিক্ষকদের দিক থেকে এই প্রয়োগবাদী শিক্ষাপদ্ধতির মূল কথা হল শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বৈষম্য। তাঁরা আবিষ্কার করলেন যে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী পৃথক, তার IQ, তার প্রকৃতি, তার মেজাজ, তার সামাজিক অবস্থান, তার আশা আকাঙ্ক্ষা সবই অন্যদের তুলনায় পৃথক। মানুষের ঐক্যকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হল, তার পৃথকত্বের উপরই অবৈজ্ঞানিকভাবে সব জোর পড়ল। এইভাবে আমেরিকার শিক্ষাক্ষেত্রেও ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধের চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করল।

শিক্ষকদের ট্রেনিংএর ক্ষেত্রে এই শিক্ষাদর্শনের ফল হল এই যে বিষয়বস্তুর জ্ঞান, বুদ্ধির বিকাশ, নীতিবোধ, শিক্ষার মানদণ্ড উপেক্ষিত হতে লাগল এবং শিক্ষকরা মূলবিষয়গুলি বাদ দিয়ে বহু unacademic বিষয় শিখতে লাগলেন। আমেরিকার শিক্ষক ট্রেনিং কলেজগুলিতে ৩০০ থেকে ৪০০ কোর্সের ব্যবস্থা আছে; একটি কলেজে ৭০০ কোর্স আছে। (Woodring, পৃঃ ২০৩)। যে কলেজে কোর্স যত বেশী, সেই কলেজের সম্মান ও জনপ্রিয়তা সেই অনুপাতে বেশী এবং তার ছাত্র সংখ্যাও সেই পরিমাণে বেশী।

এই শিক্ষাপদ্ধতির ফলে ছাত্রদের শেখাবার মতো কোনো মৌলিক বিষয়েই শিক্ষাকরা যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেন না। দুইজন আমেরিকান শিক্ষাবিদ বলেছেন: "It is this expansion and proliferation which has weakened the professional courses and opened them to the charge that all courses in education teach the same thing and that all are 'vagued up'. ...the trend is in the direction of preparation in broad subject *fields* rather than in specific subjects. Science teachers prepare in *science* with some work in each several branches, rather than in just chemistry, or physics, or biology." (Grieder and Romine : *American Public Education*, 1955, p. 32)

এইভাবে যাঁরা শিক্ষক-কলেজ থেকে পাস করেন তাঁরা সব বিষয়েই পড়াবার অধিকারী হন। ওয়াশিংটন রাজ্যে শিক্ষকদের একটা সাধারণ সার্টিফিকেট দেওয়া হয় যার জোরে শিক্ষকরা যে কোন স্তরে যে কোনো বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারেন। যে শিক্ষক গণিত কিম্বা পদার্থবিদ্যা জানেন না, তাঁকে ঐ বিষয়তেই ক্লাস নিতে বলা হয়—এরূপ ঘটনা আমেরিকার স্কুলগুলিতে প্রায়ই ঘটে থাকে।

এই প্রসঙ্গে আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ Rocky Cove Teachers College-এর সহ-অধ্যক্ষ অধ্যাপক উড্‌রিংকে যে চিঠি লিখেছিলেন তা থেকেই আমেরিকার শিক্ষকদের শিক্ষার রূপটা অনেকখানি বোঝা যাবে: "Rocky Cove really does not worry much about minimums and requirements, for we have a flexible curriculum and the best system of guidence to be found anywhere.... We also require more practice teaching, or as we call it, "professional laboratory experience" than any other college in the country so there is less need for academic courses—our students learn by doing, It is easy to understand why Rocky Cove is applauded by students....The new Dean, Dr. Tyland K. Foone, really believed in democracy. He asked all faculty members and students to call him Ty and Ty Foone soon was accepted as a real pal by students and townspeople as well. In his speeches he spoke humourously of the academicians, intellectuals and stuffed shirts who inhabited

the ivory towers of the campus....'Ten years after you graduate', he told his students, 'you will have forgotten every thing you learned from books but if the college has taught you how to get along with people you will do all right.' Ty often said : 'We are interested in children, not theories.'...If you keep on talking about things like values, phylosophy, intellectual discipline, and subject matter, everybody will know you are an old fuddy-duddy, After all, if you are not for us you are against us;" (Woodring. pp 190-202).

আমেরিকায় শিক্ষক-ঘাটতির অন্যতম প্রধান কারণ শিক্ষকদের স্বল্প বেতন। শিক্ষকদের বেতন এক এক রাজ্যে এক এক রকম। বড় বড় শহরগুলিতে একটু বেশী। প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের গড়পড়তা বেতন বৎসরে $ ২,০০০ থেকে $ ৩,০০০ হাজার। নিগ্রো শিক্ষকদের বেতন আরও কম। হাই স্কুল শিক্ষকদের বেতন $ ৩,০০০ থেকে ৫ অথবা ৬ হাজার। অন্যান্য পেশার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে, শিক্ষকদের আয় অনেক কম—যেমন শিল্প-শ্রমিকদের গড়পড়তা বেতন $ ৪,০৪৯, খনি শ্রমিক $ ৪,৩৫০, যানবাহন $ ৪,৩৯৮, পাবলিক ইউটিলিটিজ $ ৪,০৩৯।২

Charles P. Hogarth কলেজ ও ইউনিভার্সিটির শিক্ষকদের বেতন সম্বন্ধে আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে অন্যান্য ক্ষেত্রে গত ১৫ বৎসরে যে হারে বেতন বৃদ্ধি হয়েছে শিক্ষকদের ক্ষেত্রে তা মোটেই হয়নি। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে একজন উচ্চশ্রেণীর প্রফেসারের বেতন হচ্ছে $ ৬,০০০, এসোসিয়েট প্রফেসারের $ ৫,০০০ এসিসটেন্ট প্রফেসারের $ ৪,০০০, আর ইন্‌সট্রাকটারের $ ৩.৫০০। (Crisis in Higher Education, 1957, pp 23-27)

অধ্যাপক Ruml ও Tickton অন্যান্য পেশার বেতনের সঙ্গে শিক্ষকদের বেতনের যে তুলনা করেছেন তা থেকেই বোঝা যায় আমেরিকার ধনতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষকদের স্থান কত নিম্নে :

	Average Yearly Income	Real Purchasing Power
Tobacco Manufacturing Worker—	$ 2,700	100
Elementary School Teacher (large city)—	$ 4,817	163
High School Teacher (large city)—	$ 5,526	184
Associate Professor (large State University)—	$ 5,600	185
Railroad Fireman—	$ 6,180	204
Railroad Conductor—	$ 6,676	219
Full Professor (large State University)—	$ 7,000	229

এই তথ্যগুলি দিয়ে অধ্যাপকদ্বয় মন্তব্য করেছেন যে "The deterioration of the top (ie highest professional ranks in education) is so great that it affects the attractiveness of the academic career as compared to other professional and occupations." (Teaching Salaries Then and Now, Bulletin No. 1. p. 10)

Minnesota Universityর বিখ্যাত শরীরতত্ত্ববিদ Prof. Maurice Visscher এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, "Support of Scholarship in the Western Hemispheres has nearly always been stinted, and that it has deteriorated badly over the last two decades despite the general prevalence of an unprecedented prosperity... the relative economic status of the academic profession has gone down rather steadily over the last half century....To-day,

the academic profession's economic status is little better than half as good as it was in 1900." (Nation, Nov 9, 1957)

সমাজতাত্ত্বিক Vance Packard তাঁর *Status Seekers* New York, 1960, যে অন্যান্য বৈজ্ঞানিক-দের মতো একজন এনথ্রোপোলজিস্ট-এর গড়পড়তা বাৎসরিক আয় হচ্ছে $ ৪,৭০০। তার সঙ্গে তুলনা করে প্যাকার্ড দেখাচ্ছেন যে একজন মেকানিকাল বা ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়র তাঁর চাকুরী আরম্ভ করেন $ ৫,০০০ এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি বৎসরে $ ৭,০০০ উপায় করেন (এবং অনেক সুনিপুণ শ্রমিকের আয়ও এই রকম।) তারপর প্যাকার্ড বলেন : "Young physicists with Ph. D. often start to work with private firms at higher pay than their professors back at the university are making, who have been working more than 20 years—and who taught the neophytes most of what they know'. (p.104)

প্যাকার্ড নিউ ইয়র্কের ৩০/৪০টি বিজ্ঞাপনদাতা কোম্পানির কর্মচারীদের বাৎসরিক বেতনের নিম্নের উদাহরণগুলি দিয়ে—

Copy writers... $ 12,500 to 30,000
Copy chiefs.....$ 27,500 to $ 60,000
Account Executives.....$ 15,000 to $ 75,000
Research Directors.....$ 15,000 to $ 35,000
Art chiefs ... ... $ 30,000 to $ 50,000

বলেছেন যে এই উদাহরণগুলি "might make a $ 5,000-a-year College Professor with a Ph. D. drool" (P. 105)

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ শাস্ত্রের অধ্যাপক Seymour Harris একটি প্রবন্ধে ("Who Gets Paid What ?" Atlantic Monthly, May 1958) বলেছেন যে যেখানে একটি মদ্য প্রস্তুতের কারখানার ম্যানেজারকে দেওয়া হয় বৎসরে $ ৪০০,০০০, সেই দেশেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ বেতনভোগী প্রেসিডেন্টের বাৎসরিক বেতন $ ৪৫,০০০, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টদের গড়পড়তা বেতন $ ১১,০০০। আমেরিকার বড় বড় ব্যাঙ্ক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের বহু উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের বেতন বৎসরে $ ২৫,০০০ থেকে $ ৫০০,০০০।

এগুলি হচ্ছে ধনতান্ত্রিক সমাজের মূল্যবোধের কয়েকটি মাত্র জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ। মুনাফালোভী সমাজের এইটাই নিয়ম—একজন অধ্যাপক, যিনি অনেক বেশী বুদ্ধিমান. যিনি সমাজের হিতকারী, ও যিনি অনেক বেশী পরিশ্রম করেন, তাঁর তুলনায় একজন মদ্য প্রস্তুতকারী ও অন্যান্য ব্যবসায়ীরা বহুগুণ বেশী উপায় করেন, সমাজে ও দেশে তিনি অনেক বেশী সম্মানিত ও প্রভাবশালী!

Prof. Korol তাঁর বইতে (Soviet Education for Science and Technology) সোভিয়েতে ও আমেরিকায় বিভিন্ন পেশা ও তার বেতন সম্বন্ধে বিভিন্নভাবে গবেষণা করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা হল এই :

Category	USA	USSR
Labourer	1·0	1·0
Truck Driver	1·3	2·3
School Teacher	1·6	3·3
Professor	2·5	16·0

এই দুই দেশের শিক্ষকদের বেতন তুলনা করে Prof. Eurich বেশ উষ্ণতার সঙ্গেই বলেছেন যে "the critical tercher shortage in the United States, although foreseen a decade ago, has become more acute each year. The increase in number of inadequately prepared teachers, the relative deterioration of teachers' salaries, crowded class rooms—these are frightening symptoms, for the richest nation on earth. ···The dramatic ways in which Russia has laid claim to world supremacy in science may well prove to be a spur to our own greatest period of educational advance. (*Atlantic Monthly*, April, 1958)

স্পুৎনিকের পর ১৯৫৮ সালে শিক্ষার উন্নতি সাধন করার জন্য আমেরিকা সরকার একটি কমিশন বসিয়েছিলেন। এই কমিশন তাদের রিপোর্টে (Report of Educational Policy Commission, 1958, p. 11) বলেছেন যে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি গড়পড়তা মহিলা কলেজ গ্র্যাজুয়েটদের $ ৪৩৩৬, আর পুরুষ গ্র্যাজুয়েটদের $ ৫০০০ করে বেতন দেয়, শিক্ষকরা এর তুলনায় অনেক কম বেতন পেয়ে থাকেন, তাই শিক্ষার উন্নতির জন্য শিক্ষকদেরও এই হারে বেতন দেওয়া সর্বপ্রথম প্রয়োজন। হিসাব করে দেখা গেছে এই হারে সরকারী স্কুলের শিক্ষকদের বেতন দিতে হলে আমেরিকান সরকারের প্রয়োজন হবে ৮ শত কোটি ডলার। আমেরিকান সরকার অনায়াসে শিক্ষার জন্য এই অর্থ ব্যয় করতে পারত যদি তারা ঠাণ্ডা যুদ্ধ চালনা করার জন্য সহস্র সহস্র কোটি ডলার খরচ করা বন্ধ করত। Prof. Eurich-এর মতো আরও বহু আমেরিকান তাই আশা করেছিলেন ; কিন্তু শীঘ্রই তাদের নিরাশ হতে হল। শান্তির পথে আমেরিকান সরকার অগ্রসর হল না, তারা ঠাণ্ডা যুদ্ধের উপর আরও জোর দিল। তাই অধ্যাপক ইউরিখ উপরি উক্ত প্রবন্ধে আক্ষেপ করে বলেছেন : "As a result prospect of federal aid to education are as dim as ever."

১৯৫৭ সালে আমেরিকার রাজ্য সরকারগুলির অধীনে ১৩,৯৪,০০০ শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। স্কুল কলেজের এই শিক্ষকরা শতকরা কতজন বৎসরে কত ডলার বেতন পান তা নিম্নে দেওয়া হল (Statistical Abostract of the US, 1959, p. 420)

7,000	or	0·5%	get	less than $1,200
55,000	or	3·9%	get	$1,200—2,399
319,000	or	22·8%	get	$2,400—3,599
505,000	or	36·1%	get	$3,600—4,799
297,000	or	21·2%	get	$4,800—5,999
134,000	or	9·6%	get	$6000—7199
80,000	or	5·7%	get	$7200 and more.

আমেরিকান শিল্পপতিদের বিখ্যাত সাপ্তাহিক মুখপত্র Business Week (8, January, 1955) হিসেব করে দেখিয়েছিল যে যুদ্ধের পর মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে অনেক, কিন্তু শিক্ষকদের বেতন বাড়েনি, তার ফলে ১৯৪১ সালের তুলনায় তাঁদের আয় ১২% কমে গিয়েছে, যদিও এই সময়ের মধ্যে শ্রমিকদের প্রকৃত আয় (real wages) ৫৫% বেড়ে গিয়েছে।

আমেরিকান শিক্ষকদের বেতনই যে শুধু কম তা নয়, তাঁদের চাকরীর বিশেষ কোনো নিরাপত্তাও নেই। খুব সামান্য কারণেই তাঁদের চাকরী যেতে পারে। সকলেই জানেন যে unAmerican activities-এর অজুহাতে অনেক শিক্ষকের চাকরী গিয়েছে। এসব ছাড়াও আমেরিকান শিক্ষকদের বহু অভিযোগ রয়েছে।

পূর্বে উল্লিখিত বইতে Charles P, Hogarth কেন উপযুক্ত আমেরিকানরা শিক্ষকতার প্রতি আকৃষ্ট হয় না তার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করে বলেছেন যে স্বল্প বেতন ও নিরাপত্তার অভাবই একমাত্র কারণ নয় ; আরও একটা বড় কারণ হল শিক্ষকদের ব্যক্তি-স্বাধীনতার অভাব। "College and school teachers cannot live their own lives to the extent that people in business or people in other professions can. They realise that in some cases college teachers have to make their lives conform to the standards of politicians or ministers or others who consider it their responsibility to say what is and what is not acceptable conduct for college teachers. The heads of some colleges are subjected to considerable pressure to employ friends and acquaintances of people who feel that the college is obliged to them in some way." আমেরিকার গণতন্ত্র free socity, free enterprise-এর কি চমৎকার ছবি !

আমেরিকায় শিক্ষকদের বেতনের স্বল্পতার একটা কারণ এই যে সেখানে স্কুল শিক্ষকদের অধিকাংশই হচ্ছেন মহিলা এবং আমেরিকার তথাকথিত গণতান্ত্রিক সমাজে মহিলাদের স্থান পুরুষদের চাইতে নিম্নে। ৪০ বৎসর পূর্বে সেখানে সোভিয়েতের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মহিলা ও পুরুষের জন্য একই কাজের জন্য একই বেতনের নীতি চালু করা হয়েছে, সেখানে আমেরিকায় এত গণতন্ত্র ও সাম্যের ঘোষণা সত্ত্বেও শিল্পে, ব্যবসায়ে, শিক্ষায় সর্বত্র একই কাজের জন্য মহিলাদের বেতন পুরুষদের থেকে কম। কয়েকজন অধ্যাপক তাঁদের বইতে লিখেছেন : "The teaching profession has been constantly struggling against the tradition that women should be paid less than men for equivalent work." (Willing, Krug, etc : *Schools and our Democratic Society*, 1951, p. 314.

বিখ্যাত নরওয়েজিয়ান সমাজতাত্ত্বিক Gunner Myrdal তাঁর বিরাট গ্রন্থে (*An American Dilemma*, 1944. p. 885) বলেছেন : "Considering the importance attached to education in America, it is surprising that the teacher has not been awarded a higher status in American society. Learning has never given much prestige, and until recently the teacher has been held on a relatively low economic level without much security of tenure in most places. And even to-day he is, relatively speaking, not well paid, and his tenure is not secure, particularly in the South, Their status as employees is stressed. This applies to all teachers, though in different degrees. The teachers in grade schools, mostly women, are socially and economically placed at a disadvantage compared with other professionals with the same amount of preparation. The professors at colleges and universities are generally accorded middle class status, definitely below that of a successful businessman." গুণার মিরডাল আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থা পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে "the final educational results do not measure up to the great amount of funds and time which go into schooling in America."

সরকারী রিপোর্ট থেকে সংগৃহীত নিম্নের তথ্যগুলি থেকে বোঝা যায় আমেরিকার গড়পড়তা পরিবার তার প্রতিটি ডলার কিভাবে খরচ করে এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাদের কতখানি দরদ : (Family, Income, Expenditure and savings in 1950, US Department of Labour, Bureau of Labour Statistics, Washington, 1953)

27 cents spent for food and non-alchoholic drink
* 25 ,, ,, ,, housing (rent, maintenance, utilities)
12 ,, ,, ,, clothes, cosmetics etc.
11½ ,, ,, on transportation & automobile
5½ ,, ,, ,, for recreation
5 ,, ,, ,, medical care
5 ,, ,, ,, Personal business
4 ,, ,, ,, alchoholic drinks
2½ ,, ,, ,, Tobacco
1½ ,, ,, on religions and welfare activity.
1 ,, ,, ,, private education and research.

Alfred griswold (President, Yale University) ১৯৫৭ সালে তাঁর সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন যে আমেরিকার সামগ্রিক খরচের হিসাব করলে দেখা যায় যে মোট খরচের মাত্র ৪·৭%শিক্ষার জন্য খরচ হয়। অন্যান্য খরচের সঙ্গে তিনি তুলনা করে দেখিয়েছেন :

Item	In Billion Dollars
Tobacco and alchoholic Beverages……	14·5
Automibles……	14·5
Recreation……	13·0
Education……	12·0

Griswold আরও বলেছেন যে আমেরিকানদের টাকার কোনো অভাব নেই ; বিলাস দ্রব্যের জন্য খরচ না কমিয়েও অনেক টাকা তারা শিক্ষার জন্য খরচ করতে পারে, কিন্তু শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তারা বোধ করে না। "Our only valid reason for not doing so is that we do not wish to, not that the resources are lacking ; and the most generous explanation of this lack of motive is the lack of understanding....There statistics have received nationwide publicity and attention. Yet they have not produced the necessary educational funds. They have been shouted from housetops, but they have not generated the will to supply these funds." (*In the University Tradition*, Yale, I957, pp 146-47)

আমেরিকান সমাজে মানুষের মূল্য বিচার হয় তার টাকার পরিমাণ দিয়ে—যার মত বেশী টাকা তার তত বেশী সম্মান, যার যত কম টাকা, তার তত কম সম্মান। এই সমাজে শিক্ষকদের আয় খুবই সামান্য, সুতরাং সমাজে তাঁদের সম্মানও কম এবং তাঁরা অবহেলিত এবং মালিকশ্রেণীর দ্বারা ঘৃণিত। শিক্ষকদের বলা হয় "egg heads", "dreamers", "failures", "unsuccessful", ইত্যাদি। Giswold বলেন যে আমেরিকার চিন্তাধারা অনুসারে—"the scholar is pedant, bookwarm, antiquarian, eccentic,

---

* আমেরিকার সাধারণ লোকের মোট আয় থেকে বাড়ি ভাড়ার জন্য চলে যায় এক চতুর্থাংশ এবং অনেক ক্ষেত্রে তার অনেক বেশী। আমেরিকার তুলনায় সোভিয়েতে শিক্ষকদের ও শ্রমিকদের বাড়ী ভাড়া, লাইট, গ্যাস ইত্যাদির জন্য ব্যয় হয় তাঁদের আয়ের হার অনুপাতে ৫ থেকে ১০% । যাঁরা গ্রামে শিক্ষকতা করেন তাঁদের বাড়ী ভাড়া দিতে হয় না। উপরের তালিকার আর একটি বিষয় দ্রষ্টব্য এই যে আমেরিকানদের মোটর গাড়ী, মদ্য, সিগারেট, প্রসাধন সামগ্রীর জন্য খরচ কত বেশী, এবং বই, শিক্ষা ইত্যাদির জন্য খরচ কত কম।

misanthrope, a queer, cantankerous, carping individual out of sorts with society and ill at ease with himself." (p, 111)

বস্তুতপক্ষে আমেরিকার অর্থকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় মানুষের চিন্তাশক্তির খুব বিকাশলাভ ঘটে না। চিন্তাশীল আমেরিকানরাই একথা আজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছেন। আমেরিকার শিক্ষা সম্বন্ধে Illinois University-র Prof. Arther Bestor বলেছেন : "it is not a democratic school system at all. It is simply an anti-intellectual school system. Is there any public high school in the U.S.A in which the top-ranking scholar enjoys a fraction of the prestige of the football captain ?"

আর একজন অধ্যাপক George Schmidt বলেন : "If the colleges and universities.....had some of the aspects of a variety show, they were merely reflecting American life as a whole." (*Liberal Arts College*, 1958, p. 207)

আমেরিকার মানসিকতার মানের অবনতির কথা চিন্তা করে Prof. Baker Brownell (Professor of Philosophy, Northwestern Univetsity) বলেছেন : "not one in fifty college graduates ever again reads a book in great intellectual tradition after he graduates....the average college man...reaches his high point of cultural maturity before he is 25 and deteriorates rapidly thereafter." (*The College and the Community : A Critical Study of Higher Education*, 1952, p. 35)

ব্রাউনেল তারপর বলেছেন যে আমেরিকান শিক্ষার বিফলতার মূল কারণ হচ্ছে "the deadly divorcement between learning and action" এবং "the disastrous cleavage between edds and means."

কিন্তু এসব সত্ত্বেও একশ্রেণীর শিক্ষক, অধ্যাপক, লেখক; ইন্‌টেলেকচুয়াল আছেন যাঁরা চিন্তা করেন, যাঁদের চিন্তা করার সাহস আছে। আমেরিকার শাসকশ্রেণী এঁদের ভয় ও অবিশ্বাসের চোখেই দেখে। এই চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সম্বন্ধে তাদের প্রতিক্রিয়া সেক্সপীয়রের জুলিয়াস সিজারের মতো—"He thinks too much, such men are dangerous." অধ্যাপক Hutchins বলেছেন—"The United States has not set great store by intellectual achievements. In fact the general suspicion of intellectuals and intellectualism pervades the country. In some quarters there is a tendency to equate intellectualism with radicalism, or even more dangerous proclivity." (p. 25)

বর্তমানে Un-America Activities-এর অজুহতে আমেরিকার চিন্তাশীল ব্যক্তিদের উপর যে নির্যাতন চলেছে ও ফলে আমেরিকার চিন্তাজগতে যে দৈন্য দেখা দিয়েছে, সে সম্বন্ধে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে Harold Taylor, President, Sarah Lawrence College, বলেছেন যে বর্তমান আমেরিকায় "the creative gift had been lost" ও "there is no more any intellectual ferment among students and teachers." কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ও শিক্ষকরা দেশের ও জগতের প্রধান প্রধান গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি সম্বন্ধে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই উদাসীন, চিন্তাজগতের সঙ্গে তাদের বিশেষ কোন সংস্পর্শ নেই,

তাদের জীবনদর্শন নেতিবাচক—"the problems of philosopy have been detached from the problems of men and women.....Ambivalence and the refusal of commitment are character of contemporary American literature and American philosophy in the colleges. .....(The philosopher) is simply one more exponent of the ethical neutrality be to found in the rest of the curriculum and most of thc College life." (*On Education and freedom*, 1954, p.134)। আমেরিকার ধনতান্ত্রিক সমাজে আজ ব্যক্তি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, সমগ্র মানবজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন, এবং এই বিচ্ছিন্নতাই আমেরিকার Dewiy—Freud-এর দ্বারা অনুপ্রাণিত প্রয়োগবাদী শিক্ষা-বিধির মধ্য দিয়ে নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করছে।

আমেরিকা ভ্রমণকালে আমেরিকান ব্যক্তি মানুষের এই বিয়োজিতরূপ রবীন্দ্রনাথের চোখে ধরা পড়েছিল। তাই তিনি আমেরিকান টেকনোক্রাটিক সভ্যতাকে বলেছিলেন, "দানবীয় সভ্যতা," এবং নিউ ইয়র্ক শহরকে বলেছিলেন "মানুষের মরুভূমি"। সেই সময়কার লেখা "মাটির ডাক" কবিতায় (১৩২৮) আমেরিকান সভ্যতাকে উপলক্ষ্য করে লিখেছিলেন—"তৃপ্তি যে নাই, কেবল নেশা, ঠেলাঠেলি, নাই তো মেশা, আবর্জনা জমে উপার্জনে।.. শূণ্যতারে সাজায় নানা সাজে,...লক্ষ্য কোথায় পালায় দূরে, কাজ ফলে না অবকাশের মাঝে।" রম্যাঁ রলাঁর ষষ্টিতমজন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় এই প্রসঙ্গই উত্থাপন করে বলেছিলেন : আমেরিকায় অবস্থান কালে, যন্ত্রসংঘ সমূহ (organisation) ব্যক্তিগত (personal) মানুষকে একেবারে নির্বাসন দিয়া যন্ত্রগত (mechanical) মানুষকে প্রকাণ্ড পদ্ধতি-পিণ্ডের মধ্যে সংহত করিয়া প্রচণ্ড শক্তি অর্জন করিয়া দ্রুত ও বিপুল প্রসার লাভ করিতেছে দেখিয়া আমার মন পীড়িত হইয়াছিল।..... মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, তাহার দৈনন্দিন জীবন যাত্রার প্রাণ ও অনুভূতির অভাব প্রতিদিন বাড়িয়া চলিয়াছে এবং ধীরে ধীরে এই যন্ত্রেরই অংশ মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া কর্তব্য ও দায়িত্ববোধের প্রয়োজন সে অনুভব করে না। প্রাণ-শক্তিকে পরিহার করাতে এই যন্ত্রবদ্ধ জড়শক্তির দোহাই দিয়া আজিকার দিনে ভয়াবহ অত্যাচার ও অবিচার করা সহজসাধ্য হইয়াছে, কারণ জড়শক্তি অন্য সকল বিচার-বিবেচনাকে পদদলিত করিয়া আপন উদ্দেশ্য সাধনে দ্বিধাহীন নির্মমগতিতে অগ্রসর হয়।.....এই অধুনা জড় পৌত্তলিকতার (Fetish worship) প্রভাবে অন্যসব মানবীয় ধর্ম লোপ পাইতে বসিয়াছে, মানুষ ও মনুষ্যত্ব বলির অসংখ্য উপায় এই পৌত্তলিকতাই দিন দিন যোগাইয়া দিতেছে।" (প্রভাত মুখোপাধ্যায় : **রবীন্দ্র-জীবনী** ৩য়, পৃঃ ১৬৯)।

বলশেভিক বিপ্লবের পর সোভিয়েত সরকারকে এক বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হতে হল—জনসাধারণের নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও উচ্চশিক্ষার বিস্তার। রাশিয়ার তিন-চতুর্থাংশ লোকই তখন নিরক্ষর, আর এশিয়ার সোভিয়েতগুলিতে নিরক্ষরতা শতকরা ৯৫ জনেরও বেশী। সমগ্র দেশে শিক্ষকের সংখ্যা ছিল মাত্র দুই লক্ষের কিছু বেশী।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

সম্পাদকীয়

যুদ্ধ, শান্তি ও মানবমন

শান্তি ও সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণের জন্য মস্কোতে অনুষ্ঠিত মহাসম্মেলন পারমাণবিক যুগের একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। পৃথিবীর শান্তিকামী জনগণের আড়াই হাজার প্রতিনিধির প্রায় একবাক্যে শান্তি ও সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে অভিমত প্রকাশ শান্তি আন্দোলনের এক বিজয়সূচক পদক্ষেপ। বিশেষ উল্লেখ্য এই মহাসম্মেলনে বিভিন্ন ধর্ম, জাতি ও মতাবলম্বীদের একত্র সমাবেশ। দলগত পার্থক্য, আদর্শগত বৈষম্য, জাতিগত সংস্কার, বিভিন্নতা সত্ত্বেও শান্তি ও সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণ প্রশ্নে এঁদের আগ্রহ ও সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে শুভ ভবিষ্যতের সূচনা। সহযোগিতাভিত্তিক বিশ্ব-সমাজ গঠনের ক্ষীণ পূর্বাভাষ। প্রতিনিধি হিসেবে এ সম্মেলনে যোগদানের গৌরবে আমরা গর্বিত, আবার তদ্দরুণ গুরুদায়িত্ব পালনের সীমিত ক্ষমতার জন্য কুণ্ঠিত।

এই মহাসম্মেলনে পরমাণুযুদ্ধের ভয়াবহতা, শান্তির যৌক্তিকতা ও সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণের সম্ভাব্যতা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হওয়ায় বহু সমস্যা নতুন আলোকপাতে আজ সমাধানসম্ভব প্রতীয়মান। আবার অন্যদিকে এই আলোচনায় এও পরিস্ফুট যে শান্তির পথ সুগম নয়, যুদ্ধের সম্ভাবনা সত্যই বিদ্যমান ও কিছু সমস্যা দুরূহ ও জটিল। শান্তিকামী মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সন্দেহাতীতভাবে প্রতীয়মান কিন্তু বিরুদ্ধপক্ষের সংখ্যা ও শক্তি উপেক্ষার নয়। যুদ্ধ শুধু মাত্র কয়েকদল মুনাফাশিকারীর নরমুণ্ড নিয়ে গেণ্ডুয়া-খেলার প্রবৃত্তি—এ ধারণা ভ্রমাত্মক। যে সমাজব্যবস্থার প্রয়োজন নিঃশেষিত, সেই ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখার সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টার ও প্রচারের ফলে, যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা ও অবশ্যম্ভাবিতা এমন বহু মানবমনে সংক্রামিত, —যাঁদের যুদ্ধ থেকে কিছুমাত্র লাভবান হবার সম্ভাবনা নেই। যুদ্ধ ও আনুষঙ্গিক শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের পক্ষে [আমেরিকায় সমগ্র শ্রমিকের এঁরা ছেচল্লিশ শতাংশ] সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণ মানব স্বার্থের পরিপন্থী মনে করাই স্বাভাবিক। অর্থনীতিকদের সুচিন্তিত মতামত এঁদের কাছে সহজলভ্য নয়। যুদ্ধলিপ্সুদের অর্থনীতি ও তৎসংশ্লিষ্ট পত্রপত্রিকাই এঁদের মতামত গঠন করে। অন্ততঃ ঠাণ্ডাযুদ্ধের আবহাওয়া বা ব্রিঙ্কম্যানসিপ এঁদের জীবিকার্জনের পক্ষে অপরিহার্য—কাজেই সঙ্গত, এঁদের ধারণা। আবার সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত অনগ্রসর দেশে যুদ্ধবাজদের চলেছে অন্য রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ। পাশের রাষ্ট্র থেকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান না হলে স্বাধীনতা বিপন্ন—এই ধারণা এ সব দেশের জনমনে বেশ কৌশলেই এবং সহজেই অনুপ্রবিষ্ট করা চলে। এরপর আছে "জনাতঙ্কের" প্রচার। জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যার বিকল্পহীন একমাত্র সমাধান হিসেবে যুদ্ধকে উপস্থাপিত করা হচ্ছে। Camille Rougeron, প্যারী থেকে অধুনা প্রকাশিত তাঁর এক পুস্তকে লিখেছেন—মাঝে মাঝে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির চাপে রাষ্ট্রের মানসিক পরিবর্তন ঘটে, শান্তির পথে চলা হয়ে ওঠে অসম্ভব, অধিকাংশের কর্মসংস্থানকরতে অপারগ রাষ্ট্র যুদ্ধের পথ বেছে নেবেই। এছাড়া এঁদের

মতে "The aggressivencss of society is a primary intrinsic impulse existing independently of external factor.... Aggressive-ness can be likened to a physical urge"। যুদ্ধ শুধু "economic salvation" নয় "moral regeneration"! আবার "In these countries (under-developed) production lags behind the population growth, and this leads to demographic—economic disequilibrium, which reaches a point when the more far-seeing are compelled to seek a way out in war". [বইটির নাম "La guerre nucleare Arms et parades"] ফ্রয়েডীয় ও ম্যালথাসীয় এই ধরনের যুক্তি ও মতবাদ প্যারী, বন, ওয়াশিংটন থেকে অনুন্নত দেশের বুদ্ধিজীবীদেরও অভিভাবিত করছে মনে হয়। এশিয়ার জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে এ-যুগের সর্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা বলে চিত্রিত করার চেষ্টাকে অভিসন্ধিমূলক মনেকরা অসঙ্গত কি? সংস্কৃতি রক্ষার অজুহাতে পশ্চিমী সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারকরা—পারমাণবিক যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধের মর্যাদা দানে প্রচার-তৎপর। এই দেউলিয়া সংস্কৃতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছে জঁাপল্ সার্ত্র-এর তীক্ষ্ম আলোচনা।

আজকের মানুষ যুদ্ধ চায় না—এ ধারণাকে চরম ও শেষ সত্য বলে মেনে নেওয়া যেমন চলে না; তেমনি চলে না 'মানুষের নির্জ্ঞান মনে' ঘুমিয়ে থাকে যুদ্ধলিপ্সা—এই ফ্রয়েডীয় ধারণাকে স্বীকৃতি দান। মানবকল্যাণের জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন আছে—এই প্রচারে অনেকে মোহাবিষ্ট হয়েছেন সত্য, পশ্চিমী সমাজের নিষ্ঠুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বঞ্চনাকে কিছু লোক মানবিক ধর্ম ভেবে বিপথে চালিত হতে পারেন সন্দেহ নেই; কিন্তু তা বলে যুদ্ধলিপ্সা সহজাত প্রবৃত্তি নয়। মানবচরিত্রে পরিবেশলব্ধ এক কলঙ্করেখা। শান্তিকামী প্রতিটি মানুষের আজ প্রয়োজন এই অপপ্রচার সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন, বৈজ্ঞানিক যুক্তিতর্কের সাহায্যে ফ্রয়েড-ম্যালথাসের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন।

এছাড়া আছে জনমানসের নিস্পৃহতা, অনীহা, উদাসীনতা। নানাকৌশলে সাম্রাজ্যবাদী যন্ত্রের অদৃষ্টবাদ প্রচার থেকে এর জন্ম। নিয়তির বা বিধির বিধান অমোঘ ও অলঙ্ঘ্য—অনুন্নত দেশের উপবাস-ক্লিষ্ট জনগণকে ভুলিয়ে রাখবার মান্ধাতা আমলের মন্ত্র—আজকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ভাবে নতুন আঙ্গিকে পরিবেশিত হচ্ছে: পজিটিভিজম, এক্সিসটেনশিয়ালিজম, প্রাগম্যাটিজম নানারকম নামে মানুষের চৈতন্যকে অভিভূত করে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে।

'অনেকে মনে করেন যে এই যুদ্ধ অপ্রতিরোধ্য, অতএব ভাগ্য হিসেবে মেনে নিতে তারা বাধ্য...' বার্নালের এই মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ভাববাদ দর্শনের অজ্ঞেয়বাদ, অনিয়ন্ত্রণবাদ, অদৃষ্টবাদ, সংশয়বাদ মানুষকে জড়পদার্থের সামিল করে তুলতে সক্ষম, তার প্রমাণ হিটলারী-জার্মানীর অধিকাংশ লোক যুদ্ধকে অকল্যাণকর জেনেও ভাগ্য হিসেবে মেনে নিয়েছিল ৩৯ সালে।

মানবমনকে 'irrational' করে তোলার ষড়যন্ত্রে জেম্‌স্, ফ্রয়েড ও ডিউইর অবদান বিশেষ উল্লেখ্য। ফ্রয়েড প্রসঙ্গে একজন আমেরিকান উক্তি করেছিলেন—"This widespread belief in "the unconscious" is not accidental. On the contrary, it was to be expected in a society where capitalism is in the state of general crisis, with the ruling class diving desperately to maintain and extend its power by the drive to war fascism. The rational human mind has become a threat to the capitalist class..."[Science & Society vol xv no 2 pp 129].

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীর বিরুদ্ধে এঁদের যে-সব তত্ত্ব উপস্থাপিত করা হয়, মোটামুটি সেগুলো এই রকম : (১) ব্যক্তি অভিজ্ঞতার বাইরে বস্তু-সত্য অনুপস্থিত, ইন্দ্রিয়লব্ধ সংবেদন ছাড়া বহির্বাস্তবের নিজস্ব অস্তিত্ব নেই : সবজেক্টিজম। (২) কার্যরণবাদের সঠিক প্রমাণ কিছু নেই ; কাজেই একথা বলা চলে না স্থানকাল সম্পর্কে জ্ঞান ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন হদিশ দিতে পারে : ইনডিটারমিনিজম্ বা অনিশ্চয়তাবাদ। (৩) চরম ও পরম সত্য অজ্ঞেয়, সুতরাং মানসিক ধর্মের মূল্যায়ন ও প্রাকৃতিক ও সামাজিক ঘটনার নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব। একদিকে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার বাইরে বস্তুজগতকে অস্বীকার, অন্যদিকে ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার সত্যতা বা মূল্যের নেতিকরণ, এই দুই পরস্পর বিরোধী দিক থেকেই বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাচ্ছেন। জাঁপল সাত্রঁর বক্তৃতায় এর উল্লেখ রয়েছে। এই পরস্পরবিরোধিতা ভাববাদদর্শনের তথা সাম্রাজ্যবাদের বিশেষত্ব : এ নিয়ে বিস্তার নিষ্প্রয়োজন। আবার আর একদিকে দেখা যায় Professor Mumford প্রমুখ সমাজবিদ্‌দের বিজ্ঞান ওপ্রযুক্তিবিদ্যার আধুনিকতম উন্নতির জন্য বিব্রত ভাব ও মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের সিনিক্ করে তুলেছে। ফলে তারা হয়ে পড়ছেন প্রকারান্তরে অদৃষ্টবাদী—জীবন সম্পর্কে বীতস্পৃহ।

Mumford-এর মতে আগামী যুগ হবে টেক্‌নোক্রেসী বা প্রযুক্তিতন্ত্রের যুগ : আর এক ধরনের ডিক্টেটরশিপ যেখানে টেক্‌নলোজিষ্টদের ঘটবে একাধিপত্য। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে তিনি দেখেছেন :— "...machines increasingly took the place of men and men themselves were tolerated only to the extent that they took on the attributes of machines, free from passion & emotion, indifferent of values."...বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ, মানুষের বিলাপ আমরা শুন্‌ছি গেল যুদ্ধের পর থেকেই। এঁরা ভয় পাচ্ছেন ব্যক্তিত্ব-অবলোপের। আগামী দিনের মানুষের মনুষ্যত্ব বলে কিছু থাকবে না। মানুষের ইচ্ছা, অনিচ্ছা, চিন্তা, ভাবনা, আবেগ ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রিত করবে যন্ত্ররাজ-টেক্‌নোক্রেসি।

পরমাণবিক যুদ্ধের ধ্বংসলীলা ব্যক্তিত্ব অবলোপের থেকে কি কম ট্রাজিক্ ? এ প্রশ্ন তুলেছেন এ-যুগের একাধিক সাহিত্যিক দার্শনিক।

যুদ্ধ শান্তির রাজনৈতিক অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আলোচনা যোগ্যতর ব্যক্তিরা অনেক করেছেন ও করবেন। সমাজবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে শান্তির বিরুদ্ধ শক্তি ও ভাবধারার সামান্য পরিচয়দেবার চেষ্টা করলাম। নানা ছদ্মবেশে যুদ্ধবাদ আমাদের অনেককে প্রতারিত করতে পারে, তাই এখানে সতর্কতার প্রয়োজন সর্বাধিক। অজ্ঞানত্য নিশ্চয়ই নৈতিক অপরাধ নয়, কিন্তু মনে রাখা দরকার অজ্ঞানতাকে আশ্রয় করেই ঘটে শয়তানের আবির্ভাব। পারমাণবিক তেজক্রিয়তা নিষ্ক্রিয়, নিরীহ ও অজ্ঞানদের রেহাই দেবে না। মানবমনের প্রথম সংখ্যা থেকেই ম্যালথাস-জেমস্-ফ্রয়েডতত্ত্বের স্বরূপ উন্মোচনে আমাদের সাধ্যানুযায়ী আমরা সক্রিয়।

শান্তির বিরুদ্ধ শক্তি নানা প্রতিক্রিয়াশীল ধারণা ও তত্ত্বকে আশ্রয় করে পুষ্ট হচ্ছে। আজ পরমাণবিক যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রকৃতিবিজয়ের নব পরিবেশে মানুষের যে শুভবুদ্ধি, যে মানসিকতা, যে নবজীবনবাদ জাগ্রত হতে চলেছে, তার শক্তি কিন্তু সর্বরকমের প্রতিক্রিয়াশীল ধারণা ও তত্ত্বের সম্মিলিত শক্তির থেকে বেশী। শান্তিকামী মানুষকে সেই নবজীবনবেদ প্রচারে এগিয়ে আসতে হবে,—নিষ্ক্রিয়তা-দর্শনর প্রভাব দূরীভূত করতে হবে বৈজ্ঞানিক ভাবধারার সংঘাতে, শান্তি-শিবিরকে আরও সংঘটিত ও সুদৃঢ় করে তুলতে হবে সম্মিলিত কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে। শান্তি জিতবেই। তবে যুদ্ধ যেমন অনিবার্য নয় ; শান্তিও তেমনি অনিবার্য নয় ; সৎ ও সাহসী মানুষের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শান্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

॥ বিগত শান্তি ও সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণ কংগ্রেসে প্রদত্ত বক্তৃতা ও শুভেচ্ছাবাণীর আংশিক উদ্ধৃতি ॥

"এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। কিন্তু এগুলি ছাড়াও আরও এমন অনেক দিক আছে যা আজ আপাততঃ গুরুত্বপূর্ণ মনে না হলেও ভবিষ্যতে অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসাবে দেখা দেবে। এগুলি হল শান্তির জন্য কিছু সংখ্যক নরনারীর অতি সহজ সরল ও স্বাভাবিক অনুভূতি। এই অনুভূতিগুলি চিরকালই ছিল বিশেষ করে অতীতের অসংখ্য যুদ্ধের পরিবেশে, কিন্তু আজ আমরা সকলেই বুঝতে পারছি যে পারমাণবিক বোমার যুগে এই অনুভূতি এক নতুন ব্যাপকতায় বিস্তৃতি লাভ করেছে। আমরা জানি হিরোসিমা ও নাগাসাকির তুলনায় হাজার হাজার গুণ শক্তিশালী পারমাণবিক অস্ত্র আজ বিস্ফোরণের জন্য প্রস্তুত আর সেই বিস্ফোরণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিছক ভুলের জন্যও ঘটে যেতে পারে। এই শত্রু, মিত্র, নিরপেক্ষ নির্বিশেষে সকলকেই আঘাত হানবে ; হতাহতের পরিমাণ হবে সমগ্র মানবসমাজের এক তৃতীয়াংশ ; আর বাকী যারাও বা বেঁচে থাকবেন যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলার ফলে তাদের জীবনও হবে সংকটাপন্ন। যদি কেউ বেঁচেও যান পুরুষানুক্রমে শতাব্দী ধরে তাকে বয়ে বেড়াতে হবে বিকৃতি আর বিকলাঙ্গতা।

মানবসমাজকে ইতিপূর্বে এবম্বিধ ভবিষ্যতের মুখোমুখি কখনও দাঁড়াতে হয় নি। সমগ্র মানবজাতির নৈতিকবোধ, ধর্ম, সামাজিক শৃঙ্খলা ও আদর্শের প্রতিও এক সাংঘাতিক চ্যালেঞ্জস্বরূপ। কোটি কোটি নরনারী শিশুকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা এবং তাদের বংশধরদের মারাত্মক পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তায় বিষাক্ত করে তোলার জন্য যে নীতিবোধ প্রস্তুতি চালাচ্ছে, অমানুষিকতার এমন পর্য্যায়ে আজ তারা পৌঁছেছে যে, তাদের নীতিবোধকে মানবিক নীতিবোধ বলা হবে অন্যায়।"...

..."অনেকে বিশ্বাসই করেন না যে আণবিক যুদ্ধ হতে পারে, অনেকে মনে করেন যে এই যুদ্ধ অপ্রতিরোধ্য অতএব ভাগ্য হিসাবে মেনে নিতে তারা বাধ্য, আবার অনেকে আছেন যারা বলেন যে বাস্তব হলেও এই বিপদকে কাটানো সম্ভব এবং প্রতিরোধক হিসাবে এমন কিছু কাজ আছে যা আমাদের করতেই হবে। এই শেষোক্ত মতের মানুষের প্রতিনিধিরাই এখানে সমবেত এবং আমরা আশা করি যে যতদিন না আমাদের উদ্দেশ্য সার্থক হচ্ছে, অর্থাৎ যতদিন না যুদ্ধের বিপদ কেটে যাচ্ছে এবং পারমাণবিক ও সাধারণ নিরস্ত্রীকরণ কার্য্যকরী হচ্ছে, ততদিন আমাদের প্রচেষ্টা চলতেই থাকবে।" —জে, ডি, বার্ণাল।

নিরস্ত্রীকরণ এখন আর অস্ত্রসজ্জা হ্রাসের প্রশ্ন হিসাবে নাই। বৃহৎ শক্তিবর্গের যে পরমাণবিক অস্ত্র রহিয়াছে তাহার একচতুর্থাংশই সমগ্র দুনিয়াকে নিশ্চিহ্ন করার পক্ষে যথেষ্ট।"

—জওহরলাল নেহরু

"এই সুন্দর পৃথিবীগ্রহকে আমি বারবার পরিক্রমা করিয়াছি, ইহার অপরূপ সৌন্দর্য্যে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। কিন্তু একদেশের সংগে আর একদেশের এই যে প্রভেদ, এই যে সীমারেখার বৈষম্য, তাহা তো দেখিতে পাই নাই। সমগ্র পৃথিবী এক ও অভিন্ন।" —তিতোভ

শেষ কথা হইলেও যাহা সমান্যতম নয় তাহা হইল যে, দুই পক্ষে শক্তির বর্তমান সমাবেশ ও নূতন ধরনের অস্ত্রের কথা মনে রাখিয়া মার্কিন সমরবাদীরা যে পারমাণবিক যুদ্ধের পরিকল্পনা করিয়াছে তাহা শুধু

দুইটি দেশের ভূখণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না। ইহা হইবে বিশ্বব্যাপী এবং দুনিয়ায় কোটি কোটি নরনারীর জীবনে ইহা ধ্বংস ও মৃত্যুকেই ডাকিয়া আনিবে। ইহার ফলে মানবজাতির কি ক্ষতি হইবে? পারমাণবিক মৃত্যুর বিরুদ্ধে যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সংগ্রাম করিতেছেন, তাঁহাদের অন্যতম, বিশিষ্ট মার্কিনী বিজ্ঞানী লিনাস পলিং তাঁহার 'আর যুদ্ধ নয়' পুস্তকে হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পারমাণবিক যুদ্ধের বলির সংখ্যা হইবে আশী কোটী। হাইড্রোজেন যুদ্ধের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে ইহাই হইল নির্মম সত্য এবং আজ যদি পশ্চিমী রাজনীতিবিদরা এই সত্যকে জনসাধারণের কাছে লুকাইয়া রাখে তাহা হইলে তাহারা মানবজাতির বিরুদ্ধে, তাহাদের নিজেদের দেশের জনসাধারণের বিরুদ্ধে অপরাধ করিবে।' —এন্, এস্, ক্রুশ্চভ

"অত্যন্ত আনন্দের সংগে আমি লক্ষ্য করেছি যে, বহু বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক, বিশ্বজোড়া যাঁদের খ্যাতি, তাঁরা এই সম্মেলনের কাজে অংশগ্রহণ করছেন। এটা খুবই স্বাভাবিক। আমাদের যুগে নিরস্ত্রীকরণের সংগ্রামে বৈজ্ঞানিকদের বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। মানব ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও মানুষের জীবনে বিজ্ঞান আজকের মত এতবড় ভূমিকা গ্রহণ করে নি। বিজ্ঞান ও কারিগরীবিদ্যা ইতিপূর্ব্বে আর কখনও এত দ্রুত উন্নতি করে নি। সামাজিক প্রগতি ও সাধারণ কল্যাণের এত বিরাট সম্ভাবনা আজকের মত ইতিপূর্বে আর কখনও দেখা দেয় নি। তা সত্ত্বেও, যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারাদি উৎপাদন শক্তিতে এবং নানা সৃষ্টিশীল কাজে অঘটিতপূর্ব্ব উন্নতি এনে দিতে সক্ষম সেই বিজ্ঞানকেই আবার ধ্বংস ও চরম অবলুপ্তির কাজে প্রয়োগ করা সম্ভব।

.....আধুনিক পারমাণবিক অস্ত্রাদি বৈজ্ঞানিকরাই সৃষ্টি করেছেন। বৈজ্ঞানিকদের পবিত্র কর্তব্য কেবলমাত্র এই অস্ত্রের ব্যবহার রোধ করাই নয়, এই সব অস্ত্রের নিষিদ্ধ ও ধ্বংসের জন্য সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করা। নতুন বিশ্বযুদ্ধ রোধকল্পে বৈজ্ঞানিকদের উচিত, জনগণ, পার্লামেন্ট ও সরকারের সংগে একযোগে তাঁদের সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করে সংগ্রামে রত হওয়া।

'আজ কোন বৈজ্ঞানিকের এই অধিকার নেই যে তিনি নিজেকে শুধু বিজ্ঞানের গণ্ডীর মধ্যেই আটকে রাখবেন এবং 'বিজ্ঞানের সংগে সম্পর্কহীন' অজুহাতে সামাজিক কর্তব্য থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলবেন। এই প্রসঙ্গে আমি প্রখ্যাত জার্মান নাট্যকার ব্রেখ্‌ট-এর "Galilio Galilei" নাটকের উক্তিকে স্মরণ করছি: "যদি কোন বৈজ্ঞানিক তাঁর সামাজিক দায় দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন থাকেন, তবে এমন দিন আসবে, যেদিন মানুষ আর্ত ক্রন্দনরোলের মাধ্যমে পরবর্তী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে গ্রহণ করবে।" সমাজে বৈজ্ঞানিকের দায়িত্ব এই উক্তির মধ্য দিয়ে যথার্থ রূপ পরিগ্রহ করেছে।'

—আচার্য এম, ডি, কেলডিস্

"মানব সমাজে শান্তির গুরুত্ব সর্বাধিক। মানবেতিহাসের বিগত সমস্ত অধ্যায় থেকে আমাদের যুগ স্বতন্ত্র। এই প্রথম মানুষ জগৎ থেকে জীবনকে মুছে দেওয়ার সম্ভাবনাকে আয়ত্ত করেছে। যুদ্ধকে বেআইনী করা ও সর্ববিধ্বংসী পারমাণবিক বিভীষিকা থেকে মুক্ত হওয়ার দ্বন্দ্ব আমাদের জাগরণের সমস্ত সময়টুকু তো অধিকার করে আছেই, মাঝে মাঝে নিদ্রাকে ব্যাহত করছে। এই মহাসম্মেলনের পবিত্র দায়িত্ব হল বিশ্ব-জনমতের সেই অভিব্যক্তিকে রূপ দেওয়া যা আমাদের মুক্ত করবে এই বিভীষিকা থেকে যেন আমরা পৃথিবীতে গঠনমূলক কাজ করে যেতে পারি, মৃত্যু নয় জীবনে যেন পরিপূর্ণতা আনতে পারি, যেন সুন্দর ছন্দময় জীবনের

নতুন স্বপ্ন দেখতে পারি এবং সর্বোপরি পূর্ণ জীবন বিকাশের দ্বারগুলি উন্মুক্ত করে মানুষকে মর্যাদার নতুন আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। এই কর্তব্য পালনে ভয় পেলে আমাদের চলবে না।...

—অধ্যাপক ডেল পন্টিয়াস্

'এখানে আমি বিশ্বব্যাপী মিলিত গণ-আন্দোলনের একটি নতুন পন্থা প্রস্তাব করতে ইচ্ছুক। জনগণের এই আন্দোলন প্রতিটি দেশের প্রতিটি জনপদ, শহর, গ্রাম, নগর নির্বিশেষে সর্বত্র পরমাণুমুক্ত ঘোষণাপত্র গ্রহণের দাবী জানাবে। এই ধরনের একটি আন্দোলন পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জা বৃদ্ধিকে প্রতিহত করবে এবং নিরস্ত্রীকরণ ও পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণের কাজকে ত্বরান্বিত করবে।'—

—অধ্যাপক কারু ইয়াসুঈ

"শান্তিপূর্ণ আফ্রিকার মানুষ হিসাবে আমরা একথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে চাই যে আমরা শান্তির পক্ষে ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে। আমরা পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ চাই। 'শান্তিরক্ষার জন্য যুদ্ধায়োজন' সাম্রাজ্যবাদীদের এই নীতির আমরা পরিবর্তন করতে চাই। আমাদের নতুন দর্শনের মূলমন্ত্র হবে: 'বিশ্বে শান্তিরক্ষার জন্য পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ ও শোষণের অবসান'।"

—জারামোগি, এ, ওগিঙ্গা ওডিঙ্গা

'অস্ত্রসজ্জার এই প্রতিযোগিতার স্বীয় অর্থনীতির প্রবল চাপে নিজেদের মধ্যে ও পরস্পরে এক তিক্ত অসদ্ভাব জন্মানোর ফলে একদিকে সাধারণ মানুষ হয়ে পড়েছে উদ্বেগাকুল ও নৈরাশ্যমগ্ন, অপরদিকে ক্ষুদ্র দেশগুলোও অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতায় সংক্রামিত হয়ে পড়ছে। এখন এই ত্রুটি বা দুর্বলতা সঞ্জাত ভয় এবং তার যমজ সন্দেহ ও অবিশ্বাসের জয়ধ্বজা উড়ছে সর্বত্র।'

প্রথম প্রশ্নের সংগে ঘনিষ্ট জড়িত আর একটি দিক হচ্ছে যে নিরস্ত্রীকরণ ও বিশ্বশান্তি সমস্যা ঘোলাটে হয়ে পড়ে যখন অংশ গ্রহণকারী আলোচকগণের কেহ দাবী করেন, মানব সমাজ এক বা অন্য মতাদর্শে বিশ্বাসী হলেই কেবল সমূহ শান্তি সম্ভব। অনেকে বলেন পৃথিবীর সকল মানুষ কমিউনিষ্ট না হলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। এবং আমাদের মধ্যে আবার অনেকে আছেন যাঁরা মনে করেন ব্যক্তি উদ্যোগের পূর্ণ সুযোগ বিদ্যমান এমন সমাজেই শান্তি নিশ্চিত। কিন্তু পারমাণবিক যুগে আমাদের আদর্শগত সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে কালহরণ করা সমুচিত নয়। নিরস্ত্রীকরণ ও বিশ্বশান্তির পথে বাস্তব সম্মত পন্থা আজকের এই পরিস্থিতিতেই গ্রহণ করতে হবে।

—ক্যানন এল, জন, কলিন্স

আমরা সকলেই খুব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে, সমগ্র বিশ্বের জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে বিশ্বশান্তির প্রশ্নটি বহু গুরুত্বপূর্ণ জয়লাভে সমর্থ হয়েছে এবং সমগ্র বিশ্বে শান্তির শক্তিসমূহ অভাবনীয়ভাবে শক্তিশালী হচ্ছে। অবস্থার এই উন্নতিতে সমগ্র বিশ্বের জনগণের ন্যায় চীনা জনসাধারণও আনন্দিত ও উৎসাহিত।

বিশ্বশান্তির ভবিষ্যতে আমরা সবচেয়ে বেশি বিশ্বাসী। আমরা বিশ্বাস করি যে গুটিকয়েক যুদ্ধপ্ররোচক মানবজাতির ভাগ্যনিয়ন্তা নয়, ভাগ্যনিয়ন্তা সেই মহান জনগণ যারা ইতিহাসের প্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

"একতাই শক্তি, একতাই মুক্তি। শান্তির শত্রুরা সবচেয়ে বেশি যাকে ভয় পায় তা হল বিশ্বব্যাপী জনগণের ঐক্য। বিশ্বশান্তি ও নিরস্ত্রীকরণের জন্য এই মহান ঐক্যই হোল সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্যারান্টি। বিশ্বশান্তিকে রক্ষার ও নিরস্ত্রীকরণকে কার্যকরী করার সংগ্রামে আমাদের লক্ষ্য ও স্বার্থ এক। ঐক্যকে রক্ষা ও শক্তিশালী করার নিমিত্ত আমাদের আরও বেশি সতর্কতা প্রয়োজন যেন শত্রুপক্ষের সমস্ত অপকৌশলকে আমরা হাতেনাতে ধরতে পারি।

—মাও তুন্।

"এখানে আমরা পারমাণবিক হুমকীর বিরুদ্ধে সকল দেশের সকল মানুষের সম্মিলিত কর্ম্মানুষ্ঠান ও আন্দোলনে এক বিরাট মিলিত গণ-আন্দোলনের উজ্জ্বল ভবিষ্যত লক্ষ্য করছি। এই কংগ্রেস নিশ্চয়ই সকল শান্তিকামী ব্যক্তি ও সংগঠন সমূহের সংহতি সাধনে সবিশেষ সচেষ্ট হয়ে যথাযথ তদারকি ও নিয়ন্ত্রণসহ সাধারণ ও সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে এই শক্তি পরিচালিত করবেন। শান্তির কাজে নিরত সকল শক্তিসমূহের এইরকম মিলিত আন্দোলনের পক্ষেই সম্ভব আমাদের স্বপ্নলালিত মারণাস্ত্রমুক্ত যুদ্ধশূন্য পৃথিবী বাস্তব করে তোল্য।"

"ভারতীয় জনগণের শান্তিকামনা তাঁদের জীবনেরই একটি অংশ বিশেষ। আমাদের দেশের দার্শনিক ধর্মনেতা, রাষ্ট্রনেতা ও সাহিত্যিকবৃন্দ যুগ যুগ ধরে যে-কোনরূপ সংঘাত সংঘর্ষের সর্বদা বিরূপতা পোষণ করেছেন। তাঁরা জীবনে শান্তির অপরিহার্যতা সঠিক নৈতিক মূল্যাবধারণ ও মানবতার শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলেছেন যা যুদ্ধকে সামাজিক ও নৈতিক অনাচার বলে বর্ণনা করেছেন।"

—রামেশ্বরী নেহরু

"আগের চেয়ে এটা আজ অধিকতর সত্য যে, আন্তর্জাতিক শান্তি অবিভাজ্য। একদিকে কার্যে ও প্রচারে যুদ্ধনীতি, অন্যদিকে শান্তির স্বপক্ষে কথায় এবং কাজে অপরিমেয় জনমতের উত্থান—এই দুই স্বার্থের ক্রমবর্ধমান বিরোধ আর সেই সংগে যে যুদ্ধের বিধ্বংসী ফলাফল থেকে কোন মানুষ, জাতি, বা কোন অঞ্চলেরই রেহাই নেই—সেই পারমাণবিক যুদ্ধের ভীতিতে বিশ্বব্যাপী আতঙ্ক—সব মিলিয়ে "বিশ্বশান্তিকেই" মানুষের কাছে একমাত্র আশু কর্তব্য করে তুলেছে।"

—জেনারেল লাজারো কারভেনাস্

পশ্চিমী দেশের পক্ষ হইতে যাঁহারা আলোচনা চালাইতেছেন, আমি চাই তাঁহারা সকলেই এই কথা ঘোষণা করুন ঃ "আমার দৃঢ়প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে কমিউনিজমের বিশ্বব্যাপী বিজয়ের চেয়ে পরমাণবিক যুদ্ধ হইবে নিকৃষ্টতর।" পূর্বাঞ্চলের পক্ষ হইতে যাঁহারা আলোচনা চালাইতেছেন, আমি চাই তাঁহারা প্রত্যেকেই ঘোষণা করুন ঃ 'আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, ধনতন্ত্রের বিশ্বব্যাপী বিজয়ের চেয়ে পারমাণবিক যুদ্ধ হইবে নিকৃষ্টতর"।

—লর্ড রাসেল

কিন্তু সৃষ্টিকার্য যদি যুদ্ধের তাঁবেদারী করে, আমাদের সন্ততি যদি বিষাক্ত-সত্য অপহরণ করে, তাহলে তারা ফ্যাসীবাদ বা অরাজকতার প্রতি আকৃষ্ট হবে। আমাদের সদা জাগ্রত থাকতে হবে ; ইতিমধ্যেই বিপদ সংকেত ধ্বনিত হচ্ছে।

সংস্কৃতির জাতিদ্বেষের ঘোরতর বিরোধী। যদি কিছু সংস্কৃতিসেবী তৎকালীন সময়ে জাতিদ্বেষী হয়ে থাকেন তা এই কারণেই যে সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সংস্কৃতি সামাজিক মানুষেরই সৃষ্টি।

যেহেতু আমরা এমন একটি যুগে বাস করছি যখন সংস্কৃতি সর্ব্বত্রই যুদ্ধাস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেকারণেই অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বহন করেও পদে পদে আমাদের বিভ্রান্তি ঘটেছে। আমাকে ভুল বুঝবেন না, কোন কোন লেখক বা রাজনীতিবিদ সচেতনভাবে অনুরূপ কার্যে লিপ্ত, অন্যেরা তাঁদের অনুভূতি বহিঃশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ইতিমধ্যে সংস্কৃতির পরিবর্ত্তন ঘটেছে, ইতিমধ্যেই সুনির্দিষ্ট মত ও শক্তির অভ্যুদয় হয়েছে। এক কথায়, সংস্কৃতি ইতিমধ্যেই সামরিক নীতি ও কৌশলের ছাঁচে ঢালাই হয়ে গিয়েছে। বাস্তবে সংস্কৃতিকে সামরিক স্বার্থে তাঁবেদারে পরিণত করে চতুর্দিকে গালগল্প ছড়িয়ে দেওয়া হয়, সংস্কৃতির পরিত্রাণেই যুদ্ধের প্রয়োজন। চাতুরিটি সরল।

বুর্জোয়া মানবতাবাদ তাই একই সময়ে জাতিদ্বেষের বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দিতে পারে, বলতে পারে 'সকল মানুষই আমার ভাই' এবং জনান্তিকে যোগ করে দেয়, 'শুধু বুর্জোয়ারাই মানুষ'।

সামাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকেও একাধিক উদাহরণ তুলে দেখাতে পারতাম, সাংস্কৃতিক জেহাদ সমগ্র মনুষ্য সমাজের কি ক্ষতিরই কারণ হয়েছে। সাইবারনেটিকস্, সামাজিক পদ্ধতি এবং সাইকোএনালিসিস প্রভৃতি নতুন নতুন পদ্ধতি ধনতান্ত্রিক পাশ্চাত্যে উদ্ভূত ও সর্ব্বাঙ্গপুষ্ট করা হচ্ছে এবং সন্দেহাতীতভাবে এর কয়েকটি কেবল মার্কস্‌বাদের বিরোধিতার জন্যই আবিষ্কৃত হচ্ছে।

ক্রুশ্চেভ এই কংগ্রেসেই দুই সমাজ ব্যবস্থার সহ-অবস্থান বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। তিনি সঠিকভাবেই বলেছেন, এই সহ-অবস্থান সর্ব্বক্ষেত্রে অপরিহার্যরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আকার গ্রহণ করবে, কিন্তু সে প্রতিযোগিতা হবে শান্তিপূর্ণ। তাঁর বক্তব্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে আমি এই সিদ্ধান্তে আসছি যে সংস্কৃতিও হবে অবশ্যই প্রতিযোগিতামূলক এবং তার সংশ্লেষিত ঐক্য তর্কাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতি-যোগিতার মাধ্যমে এবং আমার অভিমতে শেষ পর্যন্ত স্বীকৃত হবে মার্কস্‌বাদেরই অপরিহার্য প্রাধান্য।

—জঁা পল সার্ত্র

জাতির মানসিকতার রূপায়ণে ইতিহাসের ভূমিকা *

—মোহাম্মদ আবদুল করিম

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ভারতের পুরাকালের, এমন কি নিকটতর মধ্যপূর্ব যুগের ইতিহাসের মালমসলা আর তথ্যের যথেষ্ট অভাব রয়ে গেছে। ভারতের বাইরের পুঁথিপত্র, পুরাকালের ভারতীয় সাহিত্য এবং প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্য্যের ফলে আবিষ্কৃত তথ্যাদি থেকেই সে ইতিহাস লেখা সম্ভব হয়েছে। সে কালের রাজা বাদশাহ সম্রাটদের কর্মকাণ্ডের হদিস পাওয়া গেছে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি থেকে। এই গুলি থেকে গঠন আর সংগঠন কার্য্যেরই খবর পাওয়া সম্ভব, সেগুলি হল সৎকর্মের সাক্ষ্য। অন্যায় যা ঘটেছে তা বোঝা দায়। গড়া প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ দেখলে কেউ গড়েছিল তা জানা যায়, কিন্তু কেউ বা কে ধ্বংস করেছিল বা কালে কালে ধ্বংস হয়েছে তা জানতে হলে চাই লিখিত বিবরণ। লাল কেল্লা কেউ নির্মাণ করিয়েছে তা লাল কেল্লার অস্তিত্বই বলে দেবে কিন্তু আগ্রার প্রাসাদে কেউ তার পিতাকে বন্দী করেছিল তা জানবার একমাত্র উপায় হল তার লিখিত বিবরণ, আগ্রার প্রাসাদের অস্তিত্ব নয়। সে কালের লিখিত ইতিহাসের, সমসাময়িক রচনার অভাব অনস্বীকার্য্য এবং সর্বজনবিদিত। (সে কালে দুর্ভিক্ষ মহামারীতে কত লোক মরেছে, প্রজারা কখনও বিদ্রোহ করেছে কিনা, সিংহাসন দখল করার জন্য কে কাকে হত্যা করেছে, প্রতিবারে ভারতের পূর্বতন অধিবাসী-বৃন্দের সাথে পরবর্তীকালের বহিরাগতদল কি ব্যবহার করেছে, এক ধর্মের অনুগামীরা অপর ধর্মাবলম্বীদের উপর কতখানি সৎ বা অসৎ ব্যবহার করেছে—এ সবই বহুল পরিমাণে অনুমান-নির্ভর হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।) রাজা বা সম্রাটগণ নিজেরা স্ব স্ব কীর্তি কলাপের কথা যা পাথরে খোদাই করে লিপিবদ্ধ করে গেছেন, তা সেকালেই হোক আর একালেই হোক, সৎকর্মের ফিরিস্তি হওয়াই মানব সুলভ, স্বাভাবিক।

মধ্য যুগের ইতিহাস কিন্তু এ বিষয়ে সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। এই সময়কার ঘটনাবলী সম্বন্ধে শত্রু-মিত্রের লিখিত বিস্তারিত বিবরণ নষ্ট হয়ে গিয়েও যা আছে তা প্রচুর, এ যাবৎ অনাবিষ্কৃত অনেক দলীল পত্র এখনও পাওয়া যাচ্ছে। এই সময়ে ভারতের বাহিরের দেশগুলির সাথে যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ, আরও ঘন ঘন আর বহুমুখী হয়েছে, বিশ্বের বহু দেশের আর্কাইভে আছে তার তথ্যাদি, প্রয়োজন বিশেষে অনেক তথ্যই ইংরেজ আমল থেকেই সরকারী ঐতিহাসিক মোহাফেজখানার ধূলিধূসরিত তাকে দৃষ্টির অগোচরে থেকে গেছে। এই কালের সম-সাময়িক লিখিত বিবরণগুলি এতই বিশদ যে নিন্দনীয় ও প্রশংসনীয় উভয়

---

* এ লেখকের উদ্দেশ্য জাতি-মানসের বিচ্ছিন্নতা ও জাতীয় সংহতি বিরোধী অখণ্ড বিরোধী ভাবধারার কারণ নির্ণয়। মাত্র একটি দিক নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। এ সম্পর্কে অন্যান্য আলোচনাও এই লেখাটির সমালোচনা আহ্বান করছি।

সঃ মানবমন

প্রকারের ঘটনাবলীরই অজস্র খুটিনাটি ব্যাপারও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে—লেখকের ব্যক্তিগত মনোভাবও বেশ পরিষ্কার ভাবেই ফুটে উঠেছে। তথ্যের দিক দিয়ে তা যেমন অমূল্য, অপর দিকে তেমনি ইতিহাস লেখকদের মধ্যে মনমর্জীমত উদ্দেশ্যমূলকভাবে তথ্য পরিবেশন করার, তথ্যের লঘুত্ব আর গুরুত্ব নির্বিশেষে একটি বা অপরটির ওপর জোর দেওয়া বা তাকে উহ্য রাখার অবাধ সুযোগ করে দিয়েছে। এই ভাবে বিশেষ রঙে রঞ্জিত ইতিহাস লেখার ব্যাপারে য়ুরোপীয়, বিশেষ করে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদপন্থী ইতিহাসবিদরাই হয়েছেন পথিকৃৎ। আরব ইতিহাসের ক্ষেত্রে যেমন তাঁদের আবরিত ও মিথ্যা ইতিহাসের আসল রূপ প্রকাশ পেয়ে চলেছে, ভারতের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও তাঁদের সেই পরিণাম অনিবার্য্য।

ভারতবর্ষ পৃথিবী থেকে আলাদা নয়, তার আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী নয় কিছু দুনিয়া ছাড়া কারবার। পাঁচ হাজার বছর পূর্বের সিন্ধু-উপত্যকা-সভ্যতার অস্তিত্ব জাহির হওয়ার পর তো সুদূর আসীরীয় আর বেবিলোনীয় সভ্যতার সাথে ভারতের যোগাযোগের সম্ভাবনার কথা ভাবিয়ে তুলেছে। তাও শুধু সিন্ধু আর পাঞ্জাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, একদিকে বঙ্গদেশ আর অন্য দিকে দক্ষিণাঞ্চলেও তার বিস্তৃতির নজর মিলতে শুরু হয়েছে। সুদূর অতীতেই বাহির বিশ্বের সাথে যোগাযোগ থেকেছে, প্রভাবের বিনিময় ঘটেছে, মধ্যযুগে তো বটেই—তখন য়ুরোপের প্রভাবও বাদ যায় নি। ভারতের ইতিহাসকেও তাই যুগধর্মী বলে মানতে হবে। মধ্য যুগে ভারতে যা ঘটেছে তা এশিয়ার অন্যান্য দেশ এবং য়ুরোপের ঘটনাবলী থেকে ভিন্ন নয়। তবে এ কথা অনস্বীকার্য্য যে, আরব এবং তার পর তুর্কী তথা সুলতানী আমলে আক্রমণ-কারীদের ধর্মীয় উন্নাসিকতা প্রকাশ পেয়েছে। তদানীন্তন ভারতের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ধর্মালয়গুলির উপর আঘাত এসেছে। কিন্তু সেটা কতখানি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার দিক থেকে বিচার্য্য আর কতখানি সামন্তবাদী সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের প্রকৃতিরূপে বিচার্য্য তাই হল ইতিহাসবিদের ওজন করে দেখার বিষয়। বিচার করার বিষয় যে, তা কতখানি স্বধর্মের প্রতি নিষ্ঠাজনিত পরধর্মের প্রতি তাচ্ছিল্যরূপ ধর্মীয় নীতির ব্যাপার, আর কতখানি শত্রুর মনোবল ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে আক্রমণের নীতির ব্যাপার। কতখানি তা 'রাজধর্মের' দর্পজনিত উন্নাসিকতার প্রকাশ আর কতখানি গচ্ছিত ধনদৌলত সোণাজহরত লুঠতরাজের উন্মাদনা। মন্দির সেকালে রাজারাজড়ার এবং সাধারণ মানুষের দান করা মণিমুক্তা সোনাদানা প্রচলিত মুদ্রার ভাণ্ডার ছিল যেমন আজও আছে। নিছক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, উপাসনালয় রূপেই আক্রান্ত হয়ে ছিল বলে ধরে নিলেও দেখা যাবে যে, সে যুগে এটা এক রকম রেওয়াজই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তা শুধু ভিন্ন ধর্মের বিরুদ্ধেই নয়, একই ধর্মাবলম্বী দুই বা ততোধিক ভিন্নমতী দলসমূহের মধ্যেও তার তীব্রতা কম ছিল না। য়ুরোপে খৃষ্টান ধর্মের সংস্করণ পর্ব (রিফর্মেশান) আর মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে শীআ-সুন্নী, এবং পরে জবরীয়া মুতজেলা এবং আরও বহুদলীয় বিরোধ। কিন্তু এই ঘটনাগুলি ইতিহাসের পাতায় অতীতের কাহিনীরূপেই থেকে গেছে—মানবজাতির সামাজিক-রাজনৈতিক ক্রমবিকাশের একটি পর্য্যায় রূপে সে অধ্যায় শুরু হয়ে তার সমাপ্তি ঘটে গেছে। আজ আর কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামায় না, তাদের বংশধরদের কেউ আর সেই পুরাণো রঙে রঞ্জিত করে বিচার করে না—রাজনৈতিক প্রয়োজনে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ছাড়া—যেমন, য়ুরোপে য়হুদী নিধন যজ্ঞ, য়হুদী রাজ্য স্থাপন (ইসরাইল), আর ভারতে হিন্দু-মুসলিম ভ্রাতৃহনন অনুষ্ঠিত করে দেশের অঙ্গচ্ছেদ করে পাকিস্তান রাষ্ট্র স্থাপন করা আর ভারতকে হিন্দু রাজ্যবেশে পেশ করার আয়োজন করা। তবুও ভারতে অন্য দেশের তুলনায় ঘটেছে কম রটেছে বেশী। ইচ্ছাকৃত রটনার প্রয়োজন আজও মেটেনি। অনেকে আবার

পরিশ্রম করে খেটেখুটে ফলাও করে 'প্রকৃত বিভেদ' সপ্রমাণ করতে ঘর্মাক্ত হন। কাজেই কথায় কথায় পাতায় পাতায় এত মন্দির ধ্বংসের কাহিনী যে মনে হবে যেন ভারতে হাজারে হাজারে শুধু মন্দিরই ছিল, যা দশ শ' বছর ধরে মহম্মদ বিন কাসিম থেকে শুরু করে আওরংজেব আলমগীর পর্য্যন্ত বহু রাজ্যপাল, সুলতান আর সম্রাট পদে পদে অপবিত্র কলুষিত ধ্বংস করে শেষ করতে পারেন নাই।

নালন্দার কথাই ধরা যাক,—প্রবেশ পথেই বেশ জাঁকালোভাবে সাদা পাথরে খোদাই করে লেখা আছে, "বখতিয়ার খলজী এই বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করেন"। অথচ তুর্কীদের অভিযানের পূর্বে ব্রাহ্মণরা যে 'এক অংশ' পুড়িয়েছিলেন তা কোন কোন ইতিহাসের বই-এর পাতায় খুঁজে বের করতে হবে। অথচ ইতিহাস থেকেই জানা যায় যে, ব্রাহ্মণরা যেখানে বৌদ্ধ-বিদ্বেষ নিয়ে ইচ্ছা করেই পুড়িয়েছিলেন, বখতিয়ার সেখানে বিরাট প্রাচীর আর বড় বড় ফটক দেখে মঠকে দুর্গ ভ্রমে আক্রমণ করেছিলেন। ব্রাহ্মণরা যেখানে বৌদ্ধ মন্দির দখল করে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করে হিন্দু মন্দিরে রূপান্তরিত করেছিলেন (অনাত্মাবাদী বৌদ্ধরা সাকার বা নিরাকার এক বা একাধিক ঈশ্বর কোনটাই মানেন না) সে কথার উল্লেখ বা দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু মন্দির ভেঙ্গে বা মন্দিরের ভগ্নাবশেষ নিয়ে ধ্বংসস্তূপের উপর মসজিদ নির্মাণের কথা ফলাও করেই লেখা হয়। আর একেবারেই হাল আমলে দক্ষিণ ভারতে কিংবা ভারত উপকূলে য়ুরোপীয়রা বোধ করি সেই নোংরা কাজ করেন নি একটি বারও? সরকারী আলোকচিত্রেও এই জাতীয় নিদর্শন নির্দিষ্ট দৃশ্যে সামনে ধরা হয়—যেমন হোসেন শাহ-ইলিয়াস শাহের আমলের বাংলার রাজধানীর দলীলচিত্র প্রদর্শনে। টিপু সুলতানের রাজ্যে মারাঠারা যে মন্দির ধ্বংস করেছিল তার কথা ক'জনেই বা জানে? তার সংখ্যা একটিই না বেশী তাই বা কে জানতে গেছে—আর জানলেও তাকে শিবাজীর অনুগামীদের ধর্মীয় নীতি বলে বিশ্বাস করবে কোন্ মূঢ়?

সুলতানদের আমলে নবাগত শাসকদের সাথে বা অনুসরণে তাঁদের দেশীয় যে শত সহস্র তুর্কী আর পাঠানরা এসেছিল তারা সবাই ছিল মুসলমান, কারণ সে সময়ে ঐ সকল দেশে অন্য ধর্মের অস্তিত্ব ছিল না। সুলতানদের শাসন ব্যবস্থায় তাদেরই ছিল আধিপত্য। তারাও এসেছিল বসবাস করতে, ভোগের ভাগ নিতে। সুলতানদের তারাই ছিল সহচর, মোসাহেব আর কর্মীবৃন্দ। নূতন দেশে এসে নিজেদের সাঙ্গপাঙ্গদের উপর নির্ভরশীল হওয়া একান্তই স্বাভাবিক। কারণ পদানত অধিবাসীদের বিক্ষুব্ধ মন শান্ত আশ্বস্ত হতে, দেশের অধিবাসীদের সাথে পরিচিতি, ঘনিষ্ঠতা, দহরম মহরম আর বিশ্বস্ততার সম্পর্ক গড়ে উঠতে সময় লাগে। তা ছাড়া, যারা সঙ্গে এসেছে তাদের সংস্থানের দায়িত্ব আছে। এই স্বাভাবিক ও সর্বকালে সর্বত্র অনুসৃত ব্যবস্থা অবলম্বনের ঘটনাকে পরাজিত ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও তাঁহাদের অনুগামীদের 'হিন্দু' বলে বিবর্জনের ব্যাখ্যা দেওয়া খুব কঠিন কাজ নয়, এবং তাই দিয়ে উত্তেজনার খোরাক যোগানো যায়। সুলতানদের আর মোগল সম্রাটদের যুগে যখনই এমন কিছু ঘটেছে যা প্রজাদের উপর জুলুম বা কষ্টকর হয়েছে তাকেই ঐতিহাসিকরা দেখবার চেষ্টা করেছেন মুসলমান রাজা বাদশাহদের হিন্দু দলনের নজীর হিসাবে। অথচ ব্যাপারটা হল এই যে তখন প্রজা মাত্রই তো ছিল বিপুল সংখ্যাধিক্যে অমুসলমান—বিশেষ করে সুলতানী আমলে তো মুসলমানের সংখ্যা খুবই কম ছিল। একমাত্র জিজিয়া কর ব্যতীত আর সব কর এবং আইনই তো ছিল সকলের প্রতি প্রযোজ্য। ঐতিহাসিকরা যেন বলতে চান, সম্পর্কটা রাজা-প্রজার নয়, হিন্দু-মুসলমানের। মোট কথা, যতদূর সম্ভব হয়েছে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক ঘটনাগুলিকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে দেখার আর উপস্থিত করার চেষ্টা হয়েছে।

সুলতানী আমলে ঘন ঘন রাজবংশের পরিবর্তন হয়েছে, শাসন ব্যবস্থায় সামরিক শক্তি ব্যবহারের প্রাধান্য দেখা গেছে, ঘন ঘন দেখা দিয়েছে বিদ্রোহ আর পরিণামে বিদ্রোহ দমনে কঠোর ব্যবস্থাবলম্বন। সেখানেও ব্যাখ্যা হল, নতুন আর পুরাণো কায়েমী স্বার্থের সংঘর্ষ নয়, রাজপুত প্রধানদের বিরুদ্ধে তুর্কী অভিযাত্রীদের ক্ষমতা ও রাজ্য দখলের লড়াই নয়, হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানের সংগ্রাম, মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুর বিদ্রোহ। অথচ, ইতিহাস থেকেই প্রকাশ যে, 'বিধর্মী'র আক্রমণের বিরুদ্ধে সব ক্ষেত্রে 'স্বধর্মীয়'রা এক জোট তো হন নাই, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন স্বধর্মীয় প্রধান বা জনমুখ্য স্বধর্মীর দাপট ও প্রাধান্যের বিরুদ্ধে (এমন কি ব্যক্তিগত আক্রোশ বশতঃও), বা উচ্চবর্ণের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিধর্মীর সহায় হয়েছেন। পুরাণো ব্যবস্থা তোলপাড় করে নতুনের পত্তন করতে হলে যে-কালে বল প্রয়োগ ছাড়া উপায়ান্তর প্রচলিত ছিল না সেখানে সুলতানের বা সম্রাটের সামরিক আয়োজনের প্রাধান্য স্বাভাবিক—সামন্ত যুগেব মূল কথাই তো তাই। ভারতের পূর্বতন বাসিন্দাদের সাথে নবাগতদের বোঝাপড়া করতে, বেগ পেতে হয়েছিল নিশ্চয়ই, তবে তা বিধর্মী বলে নয়, মূলতঃ তারা তখনও বিদেশী বলে। মোগল আমলে বিশেষ করে আওরঙ্গজেব ইতিহাসে নিন্দার ভারবাহী হয়েছেন এক জিজিয়ায় পুনঃ প্রবর্তন করে। ঐ একটি নির্বোধ নিন্দনীয় কীর্তি করে তিনি সর্ব বিষয়েই বিদ্বেষী এবং গোঁড়া বলে অভিহিত হয়েছেন মোগল সাম্রাজ্যের পতনও নাকি ঘটেছে তাঁর ঐ হিন্দু বিদ্বেষের ফলেই। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, জহাঁগীর শিখ গুরু অর্জনকে যে মৃত্যু দণ্ড দিয়েছিলেন তা রাজনৈতিক কারণেই ছিল বলে স্বীকৃত, যদিও সে কাজকে ঐতিহাসিকেরা সুবিবেচনা প্রসূত হয় নি বলেই শেষ করেছেন—সাম্প্রদায়িক ক্রিয়া বলে অভিহিত করেন নাই, কারণ গুরু অর্জন পিতৃদ্রোহী খুসরওকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরই পৌত্র আওরজজেব যখন গুরু তেজ বাহাদুরকে মৃত্যু দণ্ড দিলেন তখন সেটা হয়ে গেল 'ধর্মীয়' নীতি। অথচ ঐ সময়ে শিখরা প্রকৃতই একটি পাল্টা শক্তিরূপে দানা বেঁধে উঠেছিল। "অর্জনের রাজস্বিক নীতি, এবং তাঁহার পুত্রের সশস্ত্র ব্যবস্থা, শিখদিগকে সাম্রাজ্যের মধ্যে এক প্রকার পৃথক রাষ্ট্রে গঠিত করেছিল।" (এডভান্স্‌ড হিষ্ট্রী অফ ইণ্ডিয়া পৃ। ৫০০)। আর পতনের কথা? পতনের কারণ তো অনেকই আছে, আওরংজেবের কর্মকাণ্ড তার সহায় হয়েছে, পতনকে দ্রুততর করেছে। তবে তাঁর ধর্মীয় নীতির কিছু অংশ তার মধ্যে ছিল বই কি। য়ুরোপীয়দের আগমন অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। ভারতে আবার দেখা দিয়েছিল একদিকে ধর্মভাবের পূনরুজ্জীবন, অন্যদিকে নতুন নতুন জাতির জাগরণ। য়ুরোপীয় বিদেশীদের ইন্ধন এবং গোপন যোগসাজস কতখানি ছিল তা আজও জানা যায় নি: তবে পরবর্তীকালে তাদের তৎপরতা এবং সক্রিয় অংশগ্রহণে অনুমান করা খুব অযৌক্তিক হবে না যে, পর্তুগাল, ফরাসী আর ইংরেজ বণিকদের লোলুপ দৃষ্টি তখনই পড়েছিল জায়গীর বিস্তারের দিকে আর জায়গীর থেকে 'আসন' দখলের বাসনা তখন থেকেই শুরু হয়েছিল। ভারতের কেন্দ্রাভিগ ঝোঁক বেড়ে চলেছিল, আওরংজেবের যুদ্ধের গোলক ধাঁধাঁয় কেন্দ্রের বাঁধন শিথিল হয়ে গিয়েছিল, একটি শক্ত আঘাত সাম্রাজ্য সৌধ ধূলিসাৎ করার জন্য যথেষ্ট ছিল। আওরংজেবের মৃত্যুর পর ইংরেজ বণিকরাই সে কাজ সমাধা করল। কিন্তু তবুও তাদেরও দখল পাকা করতে লাগল ১৮৫৭ সাল পর্য্যন্ত সময়। ততদিন সাম্রাজ্য না থাকলেও 'মোগল সম্রাট' ছিলেন ভারতের জনমন আর জনজীবনের সাথে বিজড়িত।

ঐতিহাসিকদের বর্তমানে অন্ততঃ, সতর্ক পদক্ষেপ প্রয়োজন। জাতীয় অখণ্ডতা সংরক্ষণ ও তদনুযায়ী মানস গঠনের আজ চেষ্টা চলেছে। ঘটনার বিকৃতি বা ভুল ব্যাখ্যা, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অসম্প্রীতি যাতে

না বাড়াতে পারে, সেদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। ডঃ শ্রীবাস্তবের 'সলতনৎ অব দেল্‌হী'র কতকাংশে অন্তত এই ভুলবোঝাবুঝির ব্যাপার আছে। বিশেষ করে "হিন্দুরা কেন মুসলমানদের আত্মভূত করতে ব্যর্থ হল"—এই প্রসঙ্গে।

মধ্যযুগের শেষেরদিকে, যখন মানব সমাজ বেশ সাবালক হয়ে উঠেছে, তখন কেহ কাকেও আত্মভূত, অর্থাৎ আত্মসাৎ, করার যুগ আর থাকে নাই। আত্মভূত করার প্রশ্নই ওঠে না। তবে সংস্কৃতি আর সভ্যতার প্রভাব, ভাব ধারার প্রভাব, একের অপরের সহযোগিতায় আর সংশ্রবে মিলিত সভ্যতার বিকাশ, এই সবের কথা আলাদা। ডঃ শ্রীবাস্তব দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, সেই সংমিশ্রণ হয় নাই। জানি না, আত্মভূতীকরণ বলতে তিনি কি অর্থ করেছেন, কিন্তু সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ আর সভ্যতার সমৃদ্ধি ঘটা সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই। যদি অবশ্য, সভ্যতার বিকাশ মানে একের, বিলুপ্তি না হয়ে পরস্পরের সহযোগিতায় মানুষের থাকা, খাওয়া পরা, শিল্প সাহিত্য আর চিন্তাধারার উন্নতি আর সমৃদ্ধি হয়।

প্রথমতঃ ধর্মের কথাই ধরে নেওয়া যাক। তলোয়ারের জোরে ধর্ম প্রচারের অতিরঞ্জিত কাহিনী —ঐতিহাসিকরা অনেক আগেই বর্জন করেছেন। তবে রাজ ধর্মের অনুগমন বহুর ক্ষেত্রেই সত্য। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, খৃষ্টান আর ইসলাম ধর্ম সকলের ক্ষেত্রেই তা সত্য। সিংহাসনের ছত্রচ্ছায়ায় ধর্ম বল পায়, শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ পায় পৃষ্ঠপোষকতার কারণে। কিন্তু ভারতের ইসলামের ক্ষেত্রে বাস্তব সত্য হচ্ছে এই যে, তুর্কী-পাঠান সুলতান বা মোগল সম্রাটদের মূল কেন্দ্র রাজধানী দিল্লীর সন্নিহিত বর্তমান উত্তর প্রদেশ যা সকল বাদশাহের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র ছিল সেখানে মুসলিম জনসংখ্যা নগণ্য বললেই চলে। দক্ষিণের বহমনী রাজ্য বা হয়দর আলী টিপু সুলতানের মহীস্থরের ঐ একই অবস্থা। মুসলিম সংখ্যা অধিক পরিমাণে পুঞ্জীভূত উপকুলবর্তী পশ্চিমাঞ্চলে, পূর্ব বাংলায় আর সিন্ধু প্রদেশে যেখানে সুলতান বাদশাহরা আসর জমাতে পারেন নি আর আরব আক্রমণ নিষ্ফল হয়েছে বলেই ঐতিহাসিকরা মন্তব্য করেছেন। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত আর পাঞ্জাব অবশ্য তুর্কী-পাঠান জাতীয় লোকেদের পাকা বাসস্থান ছিল। ইন্দোনেশীয়া, সুমাত্রা, যবদ্বীপে তো সুলতান বাদশাহদের ছায়াও পড়েনি, অথচ সেখানে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য। তাই বলে জোর কি আর কখনও কোথাও কারও দ্বারা হয় নাই? হয়েছে, যেমন হয়েছে, ব্রাহ্মণ্য আর বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী শাসকদের সময়েও। তবে ইসলাম ধর্মের অন্তর্নিহিত নিজস্ব আকর্ষনী গুণাবলী নেহাৎ তুচ্ছ নয়। ইসলাম ধর্মের সাম্য নীতির বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ যখন বর্ণাশ্রমের আর অস্পৃশ্যতা দেশের জনমানসকে বিষাক্ত করে তুলেছিল। এর প্রভাবে চিন্তাধারার দিক দিয়েও অসামান্য বিপ্লব ঘটেছে। বাংলা দেশে শ্রীচৈতন্য, দক্ষিণে রামানন্দ প্রভৃতি, অন্যত্র গুরু নানক—এঁদের সকলের ভক্তি ও সাম্যের প্রচার। আরও পরে রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্ম ধর্ম প্রবর্তন ভারতীয় ধর্ম সমষ্টির ভাব ধারার সংমিশ্রণের ফল। ডঃ শ্রীবাস্তব নিজেই লিখেছেন যে ভক্তি আন্দোলন ইসলামের প্রভাব রোধকারী যোগ্যতা অর্জনের জন্য হিন্দু ধর্মের সংস্কার সাধন। প্রতিদ্বন্দ্বিতাই হোক আর প্রভাবধর্মিতাই হোক, এই ভাবধারার বিবর্তনে ইসলামের অবদান অনস্বীকার্য্য, তবে এটা বলতেই হবে যে, নিজেদের চিন্তাধারানুসারে যাঁরা মানব কল্যাণ সাধনায় নেমেছিলেন নিছক' 'প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উৎসাহিত' বললে তাঁদের আদর্শকে হেয় করা হয়, তাঁদের সম্মান দেখান হয় না।

অধ্যাপক শ্রীবাস্তব লিখেছেন যে, এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ব্যর্থ হয়েছে।

তাঁর মতে তার কারণ হ'ল, তুর্কী আফগান শাসকগণ ও মুসলিম জনসাধারণ রাম-সীতা মতবাদ গ্রহণ করতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি স্বীকার করুন বা নাই করুন এটা নিছক সত্য যে, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন প্রভৃতি কোন সম্প্রদায়ই পারেন নাই, বর্তমান যুগের দেশজ খৃষ্টানরাও না। তাঁদের ক্ষেত্রে ঐক্যের জন্য এই শর্ত দাবী করা হয় নাই। তাছাড়া তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে, ইন্দোনেশীয়ায় এখনও রাম লীলার অনুষ্ঠান হয়, মহাভারতের নাটকাভিনয় হয়। মানুষ 'রাম-সীতা'য় কারও আপত্তি থাকতে পারে না, কিন্তু 'ভগবান' রামের ব্যাপারে নিরাকার একেশ্বরবাদী ধর্মের অনুগামী যে কোন ব্যক্তিরই আপত্তি থাকবে। তবুও ইসলামে সর্বকালের সর্বদেশের ধর্মীয় পথপ্রদর্শকদের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। মুসলমানদের মূল ধর্ম-গ্রন্থ কোরানে স্পষ্টভাষায় আছে—"প্রত্যেকটি জাতিকেই দূত পাঠান হইয়াছে" (১০:৪৭)। সেই সঙ্গে একথাও বলা হয়েছে: এবং "আমরা দূত পাঠাইয়াছি যাদের কথা তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি, আর দূত পাঠাইয়াছি যাদের কথা তোমার কাছে উল্লেখ করি নাই।" (৪ : ১৬৪)। শুধু তাই নয়, মুসলমানকে এই সমস্ত দূতকে নবী বা পয়গম্বর বলে মানতেই হবে, নইলে এক হিসাবে সে কাফের (অবিশ্বাসকারী) হয়ে যাচ্ছে। কোরানে আছে: "নবী প্রত্যাদেশে বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং বিশ্বাসকারীরাও; তাহারা সকলেই আল্লাহ, স্বর্গের দূতসমূহ, তাহার কিতাবসমূহ এবং তাহার নবীগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে; আমরা তাহার নবীগণের মধ্যে পার্থক্য করি না। (২ : ২৮৫); "যাহারা আল্লাহ এবং তাহার নবীগণকে অবিশ্বাস করে, এবং যাহারা আল্লাহ এবং তাহার দূতগণের মধ্যে প্রভেদ করিতে চাহে এবং বলে যে, আমরা কতকগুলিকে মানি আর কতকগুলিকে মানি না, আর তাহাদের ভিতর হইতে একটি মধ্যবর্তী পথ বাছিয়া লয়—তাহারাই হইল সত্যকারের অবিশ্বাসকারী।" (৪: ১৫০, ১৫১)। —কিন্তু যাক, ধর্মতত্ত্ব আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার বলার উদ্দেশ্য শুধু এই যে, প্রকৃত মুসলমানের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ প্রভৃতি সকলেই প্রেরিত পুরুষ, রসুল বা পয়গম্বর। গোঁড়ামীর অন্ধ দৃষ্টিতে যদি কেউ অপব্যাখ্যা বা অপব্যবহার করে থাকে তবে সেটা ব্যক্তি বিশেষের দোষ; সম্প্রদায় বা ধর্মের নয়, আর এমন ঘটনা সব ধর্মের মধ্যেই ঘটছে, ডঃ শ্রীবাস্তবের ধর্মেও বাদ নাই।

মানুষের সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের মূল উপাদান ও বাহন হল সাহিত্য, ভাষা। এক্ষেত্রে নতুন ভাষা তথা উর্দু'র সৃষ্টি তো বটেই, তা ছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় ভাষারও রূপায়ণ ও সমৃদ্ধি ঘটেছে। বাংলা ভাষার ইতিহাস তার উৎকৃষ্ট নমুনা। শিল্পকলা আর স্থাপত্য শিল্পের ক্ষেত্রে, তাকে মুসলিমী ব্যাপার বলে বাদ দিয়ে না দেখলে তাও ভারতীয় সম্পদের অমূল্য অংশ। শুধু আগ্রা-দিল্লী, তাজ আর লাল কেল্লার কথা নয়। পৃথককৃত পাকিস্তান ছাড়াও বর্তমান ভারতেও সারা দেশব্যাপী আছে তার নিদর্শন। দেব-দেবীর উপাসকবৃন্দ দেবমন্দির গড়ে স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন রেখে গেছেন; বৌদ্ধ, জৈন, শিখরা গড়েছেন তাঁদের মঠ-মন্দির, গুরুদ্বার। মুসলমানরাও তাই নির্মাণ করেছেন মসজিদ। জীব, জন্তু, নরনারীর চিত্রাঙ্কনে বাধা থাকায়, তাঁদের নজর পড়েছিল ফলফুল-পাতার কারুকার্য্য আর হরফ গঠন শিল্পের দিকে। স্থাপত্যশিল্পের ঐ সমস্ত নমুনাকে ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির সম্পদ মনে না করা সংকীর্ণতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এইসব শিল্প সাংস্কৃতিতে শুধু ইসলামীয় ছাপ পড়েছে ভাবলে ভুল হবে।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই একই কথা খাটে। পূর্বের রাজন্যবর্গ যেমন তাঁদের সময়ে প্রচলিত প্রাকৃত এবং ক্রমরূপান্তরিত সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন, তেমনি পরবর্তীকালে সুলতান

আর বাদশাহের সময়ে ফারসী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়েছিল। উভয় ক্ষেত্রেই অবলম্বিত শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে মৌলিক কোন তফাৎ ছিল না। শিক্ষার বিষয়গুলির মধ্যে চিকিৎসাবিদ্যা, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সবই তো ছিল। ভূগোল আর জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ছিল মৌলিক অবদান; সংস্কৃত সাহিত্যের পাঠ আর তার তর্জমার প্রচেষ্টাও উপেক্ষণীয় নয়। সর্বত্রই শিক্ষালয়ের ব্যবস্থা ছিল, ভারতের চলিত ব্যবস্থারই অনুরূপ পাঠশালা, মক্তব, মদরাসা। এর ফলে আমাদের দেশের বিভিন্ন ভাষার শব্দসম্ভার যে কিছুটা সমৃদ্ধ হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নাই, বাংলা ভাষার তো কথাই নাই। খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র এমনকি আচার ব্যবহার, রীতি-নীতি, আদব কায়দা সব ক্ষেত্রেই যা অবদান রয়েছে তাকে অস্বীকার করা বাস্তবকে না দেখে চোখ বন্ধ রাখার সামিল। বিশেষ করে তার ফল যখন সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলভারতবাসীরই ভোগ্য হয়েছে। ধর্ম হিসাবে ইসলামকে গ্রহণ করলেও মুসলমানরা ভারতের অনেক কিছুই ত্যাগ করেন নাই; যদিও রাজধর্মের অনুগামী হওয়ার ফলে সুলতান বাদশাহদের বিদেশ থেকে নিয়ে আসা কিছু কিছু ভিনদেশীয় রীতি-নীতি সমাজে প্রচলিত হয়ে গেছে।

শ্রীবাস্তব হিন্দু-মুসলমানের মিল না হওয়ার একটি কারণ বলেছেন : "একটি ক্ষেত্রে অবশ্য আমাদের জনগণ বিদেশীদের প্রতি যথার্থ ভদ্রতা প্রদর্শন করে নাই, তাহা হইল অন্তর্বিবাহ ও অন্তর্ভোজনের ক্ষেত্র; তাহার কারণ স্পষ্ট। হিন্দুগণ সকল সময়েই আনুষ্ঠানিক পবিত্রতায় বিশ্বাস করেছেন, অর্থাৎ দেহের, পোশাকের, বাসস্থানের ও মনের পবিত্রতা। অথচ শুধু বিদেশী তুর্কী আফগানরাই নহে, ভারতীয় মুসলমানরাও মরুভূমির আরবদের অবলম্বিত জীবন ধারা অনুসরণ করিতে দৃঢ় সংকল্প হইলেন। এতদ্ব্যতীত হিন্দুগণ সাধারণতই নিরামিষাশী, এবং মাংস যাহারা খাইত তাহারাও গোমাংস ঘৃণার সহিত পরিহার করিয়াছে। পক্ষান্তরে মোহম্মদীয়রা প্রায় শতকরা একশত জনই ছিল অনিরামিষাশী এবং তাহারাও গো মাংস ভক্ষণ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিল না।"

'আমাদের জনগণ' যে কে, তা শ্রীবাস্তব বলেন নাই, কিন্তু এটুকু স্পষ্ট যে, শুধু বিদেশীরাই তার বহির্ভূত নয়, 'ভারতীয়' মুসলমানরাও সে 'আমাদের' বাইরে। যদি হিন্দুগণই 'আমাদের জনগণ' হন, তবে সে কোন্ হিন্দু? ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ক্ষত্রীয়, নমঃশূদ্র, উপজাতীয়, না বাঙালী, বিহারী, মাদ্রাজী না মাড়োয়াড়ী? নাকি তিনি সংখ্যালঘু উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কথা মনে রেখে তাকেই সারা ভারতের হিন্দু বলে চালাচ্ছেন? কারণ এঁদের সকলের মধ্যে নিয়মকানুনও এক নয়, আর খাদ্যবস্তুর বাছবিচারও এক নয়। মুসলমানদের তবু দুনিয়ার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একই নিয়মে বাঁধা।

ডঃ শ্রীবাস্তব বিজ্ঞ আর জ্ঞানী ব্যক্তি, তিনি যা লিখেছেন বিবেচনা করেই লিখেছেন। তবু জানতে ইচ্ছা হয়, দেহের, পোশাকের, বাসস্থানের আর মনের পবিত্রতা তিনি কাকে বলেন, বেদুইন জীবনধারাই বা কি আর ভারতের মুসলমানদের জীবনধারায় তিনি তার কোন্ চিহ্নটা দেখেছেন :

অন্তর্ভোজন সম্বন্ধে বলতে পারি যে, যেখানে ব্রাহ্মণের সাথে সকলেই অন্তর্ভোজনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত, যেখানে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অস্পৃশ্য, উচ্চতর বর্ণের সাথে অধস্তন বা নিম্নবর্ণের অন্তর্ভোজন নিষিদ্ধ সেখানে ভিন্নধর্মী মুসলমানেরা যে বাদ পড়বে তাতে আর আশ্চর্য্য কি। তা ছাড়া খাদ্যাখাদ্যের ব্যাপার? ইসলাম ধর্মের বাধা নিষেধ খুবই সীমাবদ্ধ। ইসলামে খাওয়ার আদেশ কোথাও নাই। খেতে হবেই বলে

বাধ্যকতা নাই, আছে শুধু অনুমতি। কোরানে আছে—"হে মানব সন্তান! পৃথিবীতে যাহা আছে তাহার মধ্যে ভাল জিনিস এবং আইনসঙ্গত জিনিস খাও"—(২ঃ ১৬৮)। নিষেধ যেখানে আছে সেখানে স্পষ্ট ভাষাতেই আছে, শুধুমাত্র চারটি ক্ষেত্রে—মৃত জীবজন্তু, রক্ত, শুয়োরের মাংস, আর যে জীবকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো নামে হত্যা করা হয় (২ঃ ১৭২, ১৭৩)। পানীয় দ্রব্যের মধ্যে জ্ঞান বিলোপকারী নেশাজনক দ্রব্য ছাড়া নির্দিষ্টভাবে নিষিদ্ধ কিছু নাই। মোট কথা খাদ্য-পেয় দ্রব্যাদির মধ্যে অপবিত্র কি আছে জানি না। আর গো হত্যার কথা? আরব দেশে উট আর ভেড়ার সঙ্গেই সম্পর্ক, গরুর সঙ্গে সম্পর্ক নাই বললেই চলে। তা ছাড়া যেখানে বিশেষভাবে ধর্মীয় ব্যাপারে জীবহত্যার নির্দেশ রয়েছে, সেখানে ভেড়া-ছাগলের কথাই সংখ্যায় নির্ণীত হয়েছে, যেমন অকীকা অর্থাৎ নবজাত শিশুর নামকরণের সময়ে মেয়ের ক্ষেত্রে একটি আর ছেলের ক্ষেত্রে দুইটি। বকর ঈদের সময়েও একজনের পক্ষ থেকে একটি। এই ক্ষেত্রে একটি জীব সাত জনের নামেও কোরবানী করা যায়, সে জীবগুলি বড় আকারের যেমন উট, গরু ইত্যাদি। কাজেই আমাদের দেশে ঈদুজ্জোহাতে গো হত্যার মূল কারণ হল অর্থনৈতিক, কারও ধর্মে আঘাত দেওয়ার প্রশ্ন নয়, সেটা রাজনৈতিক জুয়াড়ীদের সৃষ্ট দ্বিপাক্ষিক মানসিকতা। সস্তায় একটি গোরু কিনে গরীব কেন বড়লোক পরিবারেরও সাত জনের পক্ষ থেকে কোরবানী করা যায়, কিন্তু খাসীর ক্ষেত্রে সাতটি খাসী না হলে চলবে না। আর দৈনন্দিন খাদ্যের ব্যাপারে খাসীর বা পাঁঠার মাংস খেতে পারে কয় জনে, গো মাংস প্রকৃত পক্ষে গরীবের খাদ্য। তবে ভারতবর্ষের দু একটি প্রদেশ ছাড়া গো-মাংসের প্রচলন নাই, বড়লোকেরা কেউই প্রায় গো মাংস খান না, ভারতের বাইরের মুসলমানরাও না, তবে ইচ্ছা করলেই খেতে পারেন, বাধা নেই কোনো, এই যা। আজ এই বিষয়টি গভীর সেন্টিমেন্টের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, এমন কি গো হত্যার প্রশ্নে মানুষ হত্যা পর্য্যন্ত গড়িয়েছে নিঃসঙ্কোচে। কিন্তু কবে এবং কেন গো মাংস ঘৃণ্য হয়ে গেল তা ইতিহাসের গবেষণার ব্যাপার। ইতিহাস থেকে আজ পর্য্যন্ত যা জানা যায় তা হল এই যে, পাঁচ হাজার বছর আগে সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার যুগের লোকেরা গো খাদক ছিল, যদিও গোরু নয়, ষাঁড় তাদের শ্রদ্ধার বস্তু ছিল। পরবর্তীকালের বৈদিক যুগ থেকে ব্যবহৃত সংস্কৃত ভাষায় অতিথিকে বলা হত গোঘ্ন, কারণ অতিথির সেবার জন্য গোহননের প্রয়োজন হত। কাজেই 'মুসলিম' যুগের গোড়ার দিকেই হোক বা মোগল আমলে হোক গো হত্যা সম্পর্কে সংস্কারের গুরুত্ব বাস্তবিকই কতখানি ছিল তা অনুমানের ব্যাপার, হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক নির্দ্ধারণে ইতিহাসের তথ্যের ব্যাপার নয়। কারণ গো হত্যা সত্ত্বেও মোগল আমলে সম্প্রীতির অভাব দেখা যায় নি। আজ এই প্রসঙ্গ উত্থাপনের অর্থ এক সম্প্রদায়ের খাদ্য রুচি ও অন্য সম্প্রদায়ের ধর্মীয় দুর্বলতার উপর আঘাত হেনে রাজনৈতিক ভ্রান্তি আর বিদ্বেষ সৃষ্টি করা বৈ আর কি? কারণ, ইংরেজ আমলের আগে গোহত্যার উপলক্ষে মানুষ হত্যার উন্মাদনার নজীর ইতিহাসে মেলে না। উচ্চ শিক্ষিত প্রখ্যাত অধ্যাপক ডঃ শ্রীবাস্তব সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করেছেন।

অন্তর্বিবাহ ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। সকল শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে বিবাহ বৈধ হয়েছে এই বিংশ শতাব্দীর পঞ্চদশকের শেষে, তাও লোক সভার ভিতরে ও বাহিরে দীর্ঘ পঁয়তরা কষাকষির পর, নইলে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-শূদ্র বিয়ে আর কবে হয়েছে? হিন্দু-পার্সী বিয়েই বা কটা হয়েছে? আর হিন্দু মুসলিম বিবাহ কি

মোটেই হয় নাই সমাজের বাধা বিঘ্ন কাটিয়ে ? হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপকভাবে অসবর্ণ বিয়ে বা হিন্দুতে দেশজ খৃষ্টানেতে এমন কি হিন্দু-ব্রাহ্ম বিয়ে কয়টি হয়েছে, যে হিন্দু-মুসলিম পরিণয় হবে ? তবুও যখন সারা ভারতে বিবাহের ব্যাপারে এত ভেদ-বিভেদ বাধা-নিষেধ থাকা সত্ত্বেও সকলে 'মিলিত' থেকেছে তখন শুধু মুসলমানদের ক্ষেত্রেই সেই কারণেই 'অমিলের' প্রমাণ তলাশ করা কেন ? আর সে যুগের কথা যদি বলতে হয় তাহলে রজব, আলাউদ্দান, খিজির খাঁ আর বাজ বাহাদুরের কথা বাদ দিয়েই বলা যায়, যে তিনশ' বছর সুলতানী অত্যাচারের পরও যখন নবাগত স্বল্প পরিচিত মোগল বংশের শাহজাদা সাম্রাজ্যহীন আকবরের হাতে রাজা ভরমল স্বেচ্ছায় নিজ কন্যা সঁপে দিয়েছিলেন তখন তাঁকে মুসলমান জেনেই তো দিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে আকবরের অনুসৃত নীতি তখনও দৃশ্যমান হয় নি। কাজেই মানতে হবে যে, মানুষে মানুষে সম্পর্ক হিসাবে তা স্বাভাবিক ভাবেই ঘটেছিল, বিশেষ করে সামাজিক স্তরে সমকক্ষতার বিচার করে। সুলতানী আমলে জোর জবরদস্তীর কথা কি শুধু মুসলমান বলেই, না আভিজাত্যের সমমর্য্যাদা সম্পন্না পাত্রীর সন্ধানে। তাছাড়া পরাজিত শত্রুর পুরবাসিনীদের পাণিগ্রহণ মধ্যযুগের সমরবাদীদের রেওয়াজই ছিল—সেখানে হিন্দু বা মুসলমানের প্রশ্ন ছিল কতটুকু ? তাছাড়া পৃথিরাজও তো জোর করেই নিয়ে গিয়েছিলেন জয়চন্দ্রের কন্যাকে। অপরাধটা কি শুধু সম্প্রদায় ভেদের কারণে ?

যে দেশে এত বর্ণশ্রেণী স্তর ভেদের ব্যবস্থা সেখানে হিন্দু-মুসলিম বিবাহ হওয়া না হওয়াটা বড় সমস্যা নয়, একমাত্র ব্যতিক্রমও নয়। এইগুলিকে বড় করে দেখা বা দেখানো মনের বিকার নয় কি ? তবে এটা ঠিকই যে সংমিশ্রনের পথ যতই উন্মুক্ত হয় ততই ভাল। আজও ভারতে এমন রাজপুত সমাজ আছে যারা হিন্দু-মুসলমান উভয়ের মধ্যেই বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে। স্রোতের বিপরীত মুখী প্রবাহ শুরু না হলে হয়তো এতদিনে হতেও পারত অবাধ হিন্দু-মুসলিম বিবাহ। হয়তো বা হয়ে যেতো সম্পত্তি আর বিবাহের সর্বান্তভুক্ত একক আইন। অন্ততঃ মুসলমানের দিক থেকে (বিংশ শতাব্দীর সৃষ্ট বিষাক্ত সভ্য বিদ্বেষের কথা বাদ দিয়ে) কোন বাধা থাকতো না, কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে তৎকালীন আরব্য মূর্তি পূজারী ছাড়া আর সকলে 'গ্রন্থের' অধিকারী আর গ্রন্থ প্রাপ্ত সকলের সাথেই বিবাহ বন্ধন বিধিসম্মত--শুধু প্রয়োজন ছিল সংশয় কাটিয়ে কয়েক পা অগ্রসর হওয়া। 'গ্রন্থের অধিকারী' সম্প্রদায়ের সাথে বিবাহের জন্য ধর্মান্তরণ নিষ্প্রয়োজন।

ধর্মীয় গোঁড়ামী সম্বন্ধে বলা যায়, পূর্বেও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ রাজ্য শাসনে মন্ত্রণা দিয়েছেন, বর্ণাশ্রমের কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেছেন। কেউ রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ করার চেষ্টা করেন নি। সুলতানী আমলে বরং আলাউদ্দিন, মোহম্মদ বিন তুগলক তা করেছেন। আকবর তো একেবারে নব বিধানই চালু করতে সচেষ্ট হলেন। কেউ কেউ অবশ্য স্বধর্মের প্রসারের চেষ্টা করেছেন, যেমন ফীরোজ তুগলক। সেটা তাঁর নিজস্ব ব্যাপার, যেমন বৌদ্ধধর্ম প্রসারের ক্ষেত্রে অশোক সর্বপ্রকার সহায়তা করেছিলেন। সকল সুলতান-বাদশাহের প্রকৃতি আর প্রবৃত্তি এক ছিল না, হতেও পারে না। তাই দিয়ে গোটা ধর্মকে বা ধর্মীয় সম্প্রদায়কে বিচার করা চলে না, উচিতও নয়। ডঃ শ্রীবাস্তব এক জায়গায় আক্ষেপ করে লিখেছেন যে, চেঙ্গীজ খাঁ-এর দল মঙ্গোলীয়রা যদি সুলতানী শাসনের শেষ করে দিতে পারত, তা হলে (যদিও তারা ধ্বংসের চরম করত) ভারতের সমাজের সাথে মিশে যেতে পারত। কিন্তু মধ্য এশিয়ার চেঙ্গীজ বংশীয়রাই তো ঝাড়ে বংশে মুসলমান হয়ে গেল। তখনও তা তার বংশধররা আক্রমণ করতে পারত। ব্যাপার একই দাঁড়াতো। তবে তফাৎ এই যে, চেঙ্গীজের উদ্দেশ্যে শ্রীবাস্তব লিখেছেন যে, বৌদ্ধানুরূপ মতাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও চেঙ্গীজ মহাহত্যাকাণ্ড

করেছেন। আর সুলতান-বাদশাহ তয়মূর-আওরংজেবের ক্ষেত্রে তিনি লিখেছেন ইসলামের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলমানরা নারকীয় হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত করেছে।

কাজেই সব বিষয়ে ভেবে দেখলে দেখা যাবে যে, ইংরেজ পূর্ব হাজার বছরে সারা ভারতে যে সাংস্কৃতিক আদান প্রদান ঘটেছে, সেই মধ্যযুগের পূর্বেও ঐ ধরনেরই ছাড়া অন্য কিছু হয়েছে বলে মনে হয় না। হঠাৎ বিপরীত মুখী পরিকল্পিত আক্রমণ শুরু না হলে সে প্রভাব, সে সংমিশ্রণ নিশ্চয়ই আরও বিস্তৃত আরও গভীর আরও স্থায়ী হত। মনে রাখতে হবে যে, বৈদিক সভ্যতার বিস্তৃতি আর সংমিশ্রণ হতে কয়েক হাজার বছর লেগেছে। আর ইসলামী প্রভাবের ক্ষেত্রে মাত্র হাজার বছর পার হতে না হতে শুধু উল্টা স্রোতই নয়, বিকৃতীকরণ আর বিলুপ্তি সাধনের জন্যই আয়োজন শুরু হয়ে গেছে।

ইতিহাস লেখা নিয়ে এত কথা বলতে হল কারণ এই ধরনের লেখার প্রভাবে ভারতীয় সমাজে আর সমাজেতিহাসে গুরুতর ত্রুটি আর হানিকর ফল দেখা গেছে। তার মর্মান্তিক পরিণাম হল ভারতবর্ষের অঙ্গচ্ছেদ, লক্ষ লক্ষ লোকের ছিন্নমূলতা আর সর্বস্বান্তি। এত বড় একটা ঘটনা, এমন একটা বিপর্যয় শুধুই একটি নেতার উস্কানী, মুষ্টিমেয় প্রতিক্রিয়াপন্থীর প্রচারণা আর সাময়িক উত্তেজনা আর উন্মত্ততার ফলে হতে পারে না, যদি না তার পেছনে বাস্তব অবস্থার গভীর ভিত্তি থাকে। অনেক ঘটনা, অনেক ইতিহাস, পুঞ্জীভূত অনেক মনের গ্লানি রয়েছে তার পেছনে, রয়েছে হতাশার ক্ষোভ, হীনমন্যতার আক্রোশ। ভারত বিভাগ তারই তুঙ্গীভবনের চরম একটি অঙ্ক মাত্র। আজও কি তার জের মিটেছে? এখানে বিভেদ থেকে যাচ্ছে, হীনমন্যতা দেখা দিচ্ছে, দেখা দিচ্ছে বিভ্রান্তি, অসহায়তা আর ক্ষোভ। আক্রমণমূলক সাম্প্রদায়িকতা ছাড়াও প্রতিরক্ষা বা আত্মরক্ষামূলক সাম্প্রদায়িকতা বলে একটা বস্তু আছে, যা হল অভিযানজনিত বা আশংকাসৃষ্ট সম্প্রদায়প্রীতি।

১৩৬৮ সালের আশ্বিন সংখ্যার 'অনুশীলন' পত্রিকায় অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'ইতিহাস নিয়ে বিড়ম্বনা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সম্বন্ধে লিখিত এবং ১৯৬১ সালের ২৬শে জানুয়ারী প্রকাশিত ডঃ তারাচাঁদের পুস্তকের প্রথম খণ্ডের সমালোচনা করে অন্যান্য উদাহরণসহ মুসলমানদের ক্ষেত্রেও লিখেছেন: "তারাচাঁদ তো মুসলিম অবদান সম্বন্ধে নিজেই গবেষণা করেছেন; কিন্তু ওয়াহাবী আর ফরাদীদের কথা কি তাঁর মনে জাগল না। তিতুমীর আর শরিয়তুল্লাহ আর দুধুমিঞা প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি সম্বন্ধে কিছুই কি স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যপদেশে উল্লেখযোগ্য তিনি মনে করেন নাই।" ডঃ তারাচাঁদও মনে করেন নাই আর ভারত সরকারের প্রচার যন্ত্র আকাশবাণীতে মহিলা মহলের ভাষণদাত্রী হিন্দু উত্তরাধিকার আইন সম্বন্ধে বোঝাতে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর ইংলণ্ডের কথা ভেবেছেন, কিন্তু বারো শত বৎসরের স্বদেশবাসী মুসলমানদের আইনে (যেখানে তার সর্বপ্রথম প্রকাশ) নারীর সম্পত্তির অধিকারের কথা যেন উল্লেখ করার মতই মনে করেন নাই। এটা খুবই সত্য যে, বর্তমান যুগের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কথা বাদ দিলে নারীর অধিকার সবচেয়ে বেশী আছে বোধ হয় ইসলামেরই আইনে। সংবাদপত্রগুলি মুসলমান কোন অপরাধ করলে অনেক সময় 'জনৈক মুসলমান' লিখে গোটা সম্প্রদায়কে টেনে আনেন, আর হিন্দুর দ্বারা অনুষ্ঠিত হলে 'জনৈক ব্যক্তি' কি খুব জোর নাম লিখে, শুধু ব্যক্তিকেই কারকরূপে পেশ করেন, ঠিক যা হওয়া উচিত তেমনি করে। মুসলমানের অনুষ্ঠিত অপরাধের জন্য সারা মুসলিম সমাজ দায়ী, কিন্তু হিন্দুর অপরাধ শুধু ব্যক্তির বা খুব জোর কোন বিশেষ

উপ-সম্প্রদায় বা প্রদেশবাসীর ব্যাপার মাত্র ; এ ধরণের প্রচার অতীব ক্ষতিকর। গত ফেব্রুয়ারীর (১৯৬১) জব্বলপুরের ঘটনা উপলক্ষে বাংলার একটি খ্যাতনামা জাতীয় পত্রিকা সম্পাদকীয় স্তম্ভে মন্তব্যই প্রকাশ করে বসলেন যে, একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার অভাবের ফলে যৌন অপরাধ একটু বেশী মাত্রায় হয়। সেই সময়ে বাংলা দেশের বিভিন্ন আদালতে বহু জঘন্য ও হিংস্র অপরাধের মামলা চলছিল। কিন্তু কে তার অনুষ্ঠাতৃদের সম্প্রদায়ের বিচার করবে ? আজ যা ঘটনা, কাল তাই ইতিহাসের তথ্য, ধ্যান ধারণা, জ্ঞানের মালমশলা। হীরেনবাবু তাই লিখেছেন : "প্রতিটি তথ্য পূর্ণ সত্যের আধার নয়। তা ছাড়া কেবল তথ্যের যথাসম্ভব নিখুঁত সমাবেশ ঘটালেই যে সত্যে উপনীত হওয়া যায়, তা সম্ভব নয়। তাই নিছক তথ্য সম্বন্ধে মোহজাল বিস্তার করে তাতেই বিশ্বাস করা একাগ্রচিত্ত গবেষকদের পক্ষে অনেকটা স্বাভাবিক হলেও তথ্যানুসন্ধান, সঞ্চয়ন, সংগঠন এবং সিদ্ধান্ত প্রভৃতি ব্যাপারে মানুষের মন এবং তার পরিবেশ ও সংস্কার ও বিশ্বাস ও আদর্শ ইত্যাদি বস্তুকে অবহেলা করা চলে না।"

এ সবের পরিণাম হয়েছে সুদূর প্রসারী। হিন্দু মুসলমানের মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার ফল ফলেছে। বাহ্যিক ভাবে হোটেলে রেস্তোরাঁয় ঘর ভাড়ার ব্যাপারে এই প্রভেদের খেলা বহুল পরিমাণে কমে গেলেও অন্তরে হিন্দু-মুসলমানের ঠিক বিভেদ না হলেও, স্বাতন্ত্র্যবোধ এখনও বেশ জমাট বেঁধে আছে। স্কুল কলেজ সমাজক্ষেত্র সর্বত্রই তা বিদ্যমান, ছাত্র নয়, মানুষ নয়, হিন্দু আর মুসলমান। কর্মক্ষেত্রে, অফিসে কারখানায়, মাঠে-ঘাটে খেলার ময়দানে দেখা হয়, মেলামেশা হয় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে নয়, মানুষে মানুষে নয়, হিন্দু-মুসলমানে। তাই কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে, উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে, শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সর্বত্র সমস্যা দেখা দেয়। অপরাধ ব্যক্তির অপরাধ নয়, প্রবলের দুর্বলের উপর আক্রমণ নয়, হিন্দু বা মুসলমান বলেই মুসলমান বা হিন্দুর অপরাধ। অসাম্প্রদায়িক, সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সভ্য হয় বাঙ্গালী বা ভারতবাসী নয়, হিন্দু বা মুসলমান। জনসাধারণ আর এলাকাবাসী, বাঙ্গালী বা ভারতবাসী হয় না, হিন্দু মুসলমান তপশীলী উপজাতিই থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথের—

"হেথায় আর্য, হেথায় অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক-হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন"

কুটিল রাজনীতির ফাঁদে পড়ে শুধুমাত্র কবির ভাবপ্রবণ উচ্ছ্বাসের প্রকাশ হয়েই রয়ে গেল, বাস্তব হলনা। তবে সেদিন দূরে নয় যখন ভারতের মানুষ কবির ব্যাকুল আহ্বানে সাড়া দেবে।

মা'র অভিষেকে এসো এসোত্বরা, মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা
সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থ নীরে—
আজি ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।

শিম্পাঞ্জী সম্পর্কিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও কোয়েলারের মতবাদ

--আই. পি. পাভলভ

আমার আলোচ্য বিষয় হল দুটি : একটি শিম্পাঞ্জী ও অপরটি শেরিংটন সম্পর্কে। শিম্পাঞ্জীর সংগে কেয়েলারের সম্পর্ক রয়েছে। অবশ্য বিষয় দুটির একটি কোয়েলার ও অপরটি শেরিংটন সম্পর্কিত—এরূপ বলাই বোধ হয় অধিকতর নির্ভুল হবে। আমার মনে হয় প্রথমে কোয়েলার সম্পর্কে বলাই যুক্তিযুক্ত।

এবছর গ্রীষ্মকালে কিছুদিন আমি শিম্পাঞ্জী নিয়ে গবেষণা করেছি। প্রথমে আমরা শিম্পাঞ্জীর বিশ্লেষণী ক্ষমতা সম্পর্কিত পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করি। কিন্তু এই ক্ষেত্রের উপাত্তগুলি নতুন নয় এবং খুব চিত্তাকর্ষকও নয়। গতমাসে আমরা কোয়েলার সম্পাদিত পরীক্ষাগুলি সম্পন্ন করি। যেমন ঝুলন্ত ফল পেড়ে আনার জন্য একটির উপর আরেকটি বাক্স সাজান ইত্যাদি। পূর্বেই আমি আমার স্বাভাবিক অভ্যাস অনুযায়ী কোয়েলারের "ইনভেস্টিগেশন অব দ্য ইন্টেলেক্ট্ অব এ্যানথ্রোপয়েড্স্" নামক প্রবন্ধটি একবার নয় বহুবার পড়ে নিয়েছিলাম। এভাবে আমি পরীক্ষাগুলি সম্পর্কে অবহিত ছিলাম এবং আমার চোখের সামনে ঐ সম্পর্কিত তথ্য-সমূহ ভাসছিল। আমি বলতে বাধ্য যে, মানবমনের [কোয়েলার ও আমার মনের] পার্থক্যের গভীরতায় আমি বিস্মিত।

শিম্পাঞ্জীর ক্রিয়াকলাপ প্রকৃতপক্ষে কি প্রতিপন্ন করে সে বিষয়ে কোয়েলার সচেতন ছিলেন না, এ হল আমার অভিমত। এ আমার অতিভাষণ নয়, ব্যাপারটি সত্যই তিনি বুঝতে পারেন নি।

তাঁর প্রবন্ধের শিরোনামা থেকেই প্রকাশ যে শিম্পাঞ্জীরা বুদ্ধিমান এবং এ ক্ষেত্রে কুকুর থেকে ভিন্ন ও মানুষের নিকটবর্ত্তী—এ কথাই কোয়েলার প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। এমনকি তিনি এরূপ একটি বিশেষ পরীক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন যা শিম্পাঞ্জীর নয়, কুকুরের বুদ্ধিমত্তার অভাব সপ্রমাণ করে; এজন্যই শিম্পাঞ্জীকে যুক্তিসংগতভাবে মনুষ্য সদৃশ্য (anthropoid) প্রাণী বলা হয়।

কিন্তু কি প্রমাণ তিনি উপস্থিত করেছেন ?

তার মৌলিক ও একমাত্র প্রমাণ—যা অদ্ভুতও বটে, হল নিম্নরূপ। নির্দিষ্ট উচ্চতায় ঝুলন্ত ফল পেড়ে আনার কাজটি সম্পন্ন করার জন্য যখন কোন বিশেষ বস্তুর প্রয়োজন হয়, যেমন একটি লাঠি ও কতকগুলি বাক্স, তখন তার ব্যর্থ চেষ্টাগুলি কোয়েলারের মতে তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। তা হল শুধুমাত্র "ট্রায়েল এ্যাণ্ড এরর" পদ্ধতি। এসকল ব্যর্থ প্রচেষ্টার ফলে ক্লান্ত হয়ে সে কাজটি বন্ধ রেখে কিছু সময়ের জন্য বসে থাকে। বিশ্রাম করার পর আবার সে চেষ্টা করে ও কাজটি সম্পাদনে সক্ষম হয়। কোয়েলারের মতে চেষ্টা না করে কিছু সময়ের জন্য এই বসে থাকাটাই তার বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ। ভদ্রমহোদয়গণ, তার কথাটি অবিকল এই। বসে থাকার সময় শিম্পাঞ্জীটি একটি বৌদ্ধিক কার্য্য (intellectual work) সম্পন্ন করে এবং তাই তার বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ—এরূপ অভিমত তিনি পোষণ করতেন। এ কথাটি আপনাদের কাছে কি রকম মনে হচ্ছে ? শিম্পাঞ্জীর নিস্তব্ধ ও অ-ক্রিয় অবস্থাই তার বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ !

একটির উপর আরেকটি বাক্স স্থাপন এবং এভাবে অনেকগুলি বাক্স ও লাঠির ব্যবহার শিম্পাঞ্জীর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। যখন সে কাজ করে অর্থাৎ বাক্সগুলিকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে আসে তখন সে কাজকে অনুষংগ বলে ধরা হল, বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ বলে নয়; এ হল ট্রায়েল এ্যাণ্ড এরর পদ্ধতি। কোয়েলার এ ঘটনাগুলিকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করলেন, কারণ এতো শুধুমাত্র অনুষংগ। কিন্তু যখন শিম্পাঞ্জীটি বিশ্রামরত ও অ-ক্রিয় তখনই সে এক বৌদ্ধিক কার্য্য সম্পন্ন করে। স্বাভাবিকভাবেই এরূপ চিন্তাধারার শুধুমাত্র একটি ব্যখ্যাই সম্ভব: কোয়েলার একজন গোঁড়া সর্বপ্রাণবাদী (animist)। আত্মাকে যে মুঠো করে ধরে গবেষণাগারে আনা যায় এবং তার ক্রিয়াকলাপের সূত্র যে কুকুরের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নির্ণয় করা যায়—এ সত্যে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না। তিনি একথা স্বীকারে ছিলেন অনিচ্ছুক। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি সম্পূর্ণ অন্যরকম। যে কাজগুলি কোয়েলার অগ্রাহ্য করেছেন তাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। শিম্পাঞ্জীর আচরণ পর্য্যবেক্ষণ করে আমি এসত্য অনুধাবনে সক্ষম হয়েছি। নির্দিষ্ট কাজটি করার জন্য শিম্পাঞ্জীটি কখনো একভাবে, কখনো অন্যভাবে চেষ্টা করে; এই বিশেষ ক্রিয়াকলাপ—যা আপনারা সচক্ষে দেখতে পারেন—হল তার বুদ্ধিমত্তার, তার সক্রিয় চিন্তার প্রকাশ। এ হল এক ধারাবাহিক অনুষংগ। এদের কোনটি অতীতে অর্জিত হয়েছে, কোনটি বা আপনার চোখের সামনেই গঠিত হয় এবং এরা যুক্তভাবে এক সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করে, অথবা ক্রমে ক্রমে নিস্তেজিত হয় ও ব্যর্থতা আনয়ন করে। পূর্বে তার বন্য জীবনে, তার স্বাভাবিক পরিবেশে যে অনুষংগগুলি গঠিত হয়েছে, তাদের কয়েকটির প্রকাশ সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

এটা পরিষ্কার যে শিম্পাঞ্জী ভারসাম্য রক্ষণে পারদর্শী এবং কোন খাড়া অবলম্বনের উপরও নানা অবিশ্বাস্য অবস্থায় নিজের ভারকেন্দ্র বজায় রাখতে সক্ষম। সাজানোর সময় শিম্পাঞ্জী প্রথমেই অভিজ্ঞতালব্ধ উপায়ে বাক্সগুলি দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখে। একটির উপর আরেকটি বাক্স সে এরূপ ভাবে স্থাপন করে, যেন সেগুলি প্রস্তরখণ্ড বা কাঠের গুঁড়ি, এবং তারপর তাদের দৃঢ়তা পরীক্ষা করে। বাক্সগুলির উপরিভাগ ঠিকভাবে মিলে যায় কিনা তা সে পরীক্ষা করে না। বাক্সের উপর উঠে দাড়িয়ে সে শুধু নিজেকে এপাশে ওপাশে আন্দোলিত করে। ঠিকমত না হলে সে বাক্সগুলি আবার অন্যভাবে সাজায় ও লাফ দিয়ে উপরে উঠে দৃঢ়তা পরীক্ষা করে। আপনারা অনুষংগ দেখছেন—যে অনুষংগগুলি অতীতে গঠিত হয়েছিল এবং যাদের সে বর্তমানে তৈরী অবস্থায় ব্যবহার করে।

শিম্পাঞ্জীটি বাক্স সাজিয়ে চলে ও নির্মিত এই স্তূপটির উচ্চতার দিকে লক্ষ্য রাখে। এমন হয় যে অবশিষ্ট বাক্সটি নিয়ে সে পিরামিডাকৃতি স্তূপটির উপরে আরোহণ করে এবং তারপর বাক্সটিকে নিজের মাথার উপর স্থাপন করে। সঠিক অনুষংগ, সঠিক সংযোজন স্থাপনের ক্ষেত্রে সে এই একটি ভুল করল। একটি ভুল ও অতি পুরনো অনুষংগ তার যথেষ্ট অসুবিধা ঘটায়। বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে সে এই অনুষংগটির প্রভাব কাটাতে পারে না। তাকে বিভিন্ন আকারের বাক্স দেয়া হল; দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য বৃহত্তম বাক্সটিকে প্রথমে স্থাপন করা ও অন্যান্যগুলিকে সঠিকভাবে পর পর সাজান একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু তখনো সে তা পারে না, যেমন ভুল বশতঃ সে যদি দ্বিতীয় বাক্সটির পরিবর্ত্তে ষষ্ঠ বাক্সটি সাজায় তবে কাজটি যে অনুপযোগী হল ও বাক্সটি যে পালটানো দরকার, এ-কথা উপলব্ধি করার জন্য তার কোন অনুষংগ নেই। কাজেই সে সাজিয়েই চলে। এখানে শুধুমাত্র অনুকূল আকস্মিক ঘটনাই তাকে সাহায্য করতে পারে। নবার্জিত অনুষংগ সম্পর্কে একথা বলা যায় যে, এ অর্জ্জন বাক্সগুলিকে সঠিকভাবে পর পর সাজানোর উপর নির্ভরশীল।

এ হল দৃষ্টি সম্পর্কিত অনুষংগ (visual association) এবং তা আমাদের চোখের সামনেই গঠিত হয়। সঠিকভাবে নির্মিত একটি পিরামিডের দৃশ্য সাফল্য আপয়ন করে। দৃষ্টিসম্পর্কিত এরূপ অনুষংগ সাফল্যের সহায়ক। ঝুলন্ত ফলের ঠিক নিচে বাক্সগুলি স্থাপন করা সম্পর্কিত অনুষংগটি পূর্ব থেকেই গঠিত ছিল। এরূপে আমাদের চিন্তাধারা কিভাবে গঠিত হচ্ছে তা আমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি এর সফল পদ্ধতি এবং পথে কি কি অন্তরায়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই হল প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা। কিন্তু কোয়েলার তা অস্বীকার করেন। তাঁর কাছে এ হল শুধুমাত্র ট্রায়েল এ্যাণ্ড এরর।

এখানে অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটি খুঁটিনাটি লক্ষ্য করা প্রয়োজন। তীব্র খাদ্যমূলক উত্তেজনা বর্ত্তমান থাকলে শিম্পাঞ্জীটির ক্রিয়াকলাপ অতি বিশৃংখল হয়ে পড়ে—হাতের কাছে যে বাক্সটি পায় সেটিকেই সে তুলে নেয়, যেমন দ্বিতীয়টির বদলে ষষ্ঠটি ইত্যাদি। বহিরাগত নিস্তেজনা ও (external inhibition) যথেষ্ট নঞর্থক প্রভাব বিস্তার করে। এ সবই সুবিদিত। নির্দিষ্ট তথ্যসমূহ সঠিকভাবে অনুধাবন করে তাদের সঠিক মূল্যায়ন প্রয়োজন, তখনি প্রতিটি জিনিস চোখের সামনে ফুটে উঠবে। শিম্পাঞ্জিটির সমগ্র ক্রিয়াকলাপই এরূপ। এই ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই তার চিন্তাধারা পরিলক্ষিত হয় এবং তার বুদ্ধিমত্তার প্রমাণও মেলে এখানে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে বুদ্ধিমত্তা সঠিক বা ভুল অনুষংগ অথবা নানা অনুষংগের উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত মিশ্রণ ব্যতীত আর কিছুই নয়। কোয়েলার অবশ্য বলেন যে, এ অনুষংগের ব্যাপার নয়। এপর্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সবখানিই অনুষংগজাত। শিশুর ক্রমবিকাশ অথবা আমাদের আবিষ্কারের সংগে এর পার্থক্য কোথায়? শিম্পাঞ্জীটির নির্দিষ্ট কাজ হল লাঠির সাহায্য ছাড়াই ফলটি পেড়ে আনা এবং কাজটি সে আপনাদের সামনেই ট্রায়েল এ্যাণ্ড এরর পদ্ধতিতে অর্থাৎ অনুষংগের সাহায্যে সম্পাদন করে। এটা খুবই পরিষ্কার। এ কাজটি কি ভাবে আমাদের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের চাইতে ভিন্ন? দুইই এক জিনিস। প্রকৃতপক্ষে এ হল প্রাথমিক বুদ্ধিমত্তা, আমাদের বুদ্ধিমত্তার সংগে পার্থক্য শুধু অনুষংগের স্বল্পতায়। শিম্পাঞ্জীর এমন অনেক অনুষংগ রয়েছে যেখানে প্রাকৃতিক বস্তুসকলের পারস্পারিক সম্পর্ক বর্ত্তমান। অন্য প্রাণীর তুলনায় শিম্পাঞ্জীর সাফল্য ও মানুষের সংগে তার ঘনিষ্ঠতর সাদৃশ্য সম্পর্কে চিন্তা করলে—এ কথা বলা যায় যে, তার হাত, বস্তুতঃ চারটি হাত (অর্থাৎ আমাদের চেয়ে বেশী) থাকাই এর কারণ। এ কারণেই শিম্পাঞ্জীর পক্ষে চতুষ্পার্শ্বের বস্তুর সংগে এক অতি জটিল সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব, এভাবেই অন্য প্রাণীর ক্ষেত্রে অবিদ্যমান এমন বহুসংখ্যক অনুসংগ ওর ক্ষেত্রে গঠিত হয়। যেহেতু স্নায়ুতন্ত্রে অর্থাৎ মস্তিষ্কে এসকল চেষ্টীয় অনুষংগের (motor associations) বস্তুগত ভিত্তি থাকা অবশ্য প্রয়োজন, শিম্পাঞ্জীর গুরুমস্তিষ্ক অপরাপর পশুর গুরুমস্তিষ্ক অপেক্ষা উন্নততর। এই উন্নততর বিবর্তন চেষ্টীয় ক্রিয়ার বহুমুখীতার জন্য। আমরা, মানুষরা—হাতের বিভিন্ন প্রকার সঞ্চালন ক্ষমতা ছাড়া এক জটিল বাক্‌যন্ত্র সঞ্চালন ক্ষমতার (speech movement) অধিকারী। একথা সুবিদিত যে অন্যান্য পশু অপেক্ষা শিম্পাঞ্জী "কথা বলার" ক্ষেত্রে অনুকরণে কম পারদর্শী। তুলনায় তোতাপাখীর বেশী শব্দ সঞ্চয় থাকতে পারে। বিষয়টিকে আমি এভাবেই দেখি।

বস্তুতঃ কোয়েলার সর্বপ্রাণবাদের একজন উৎসর্গীকৃত বলি। শেরিংটন আর একটি বলি। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে আমি পরবর্তীবারে বলব।

এই হল বিষয়টি সম্পর্কে কোয়েলারের ব্যাখ্যা। এ থেকে অবশ্য তিনি বুদ্ধিমান নন সে-কথা আসে না। সে হল সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের মধ্যেও অনেক সর্বপ্রাণবাদী রয়েছেন।

কোয়েলারের সংগে সাক্ষাতের সুযোগ আমার হয়েছিল। তিনি একজন অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তার পাণ্ডিত্যও গভীর। প্রাকৃত বিজ্ঞানে তার অসাধারণ জ্ঞান রয়েছে। তাঁর বুদ্ধিমত্তা কি তাকে সর্বপ্রাণবাদের প্রভাবমুক্ত হতে সাহায্য করবে? আলোচ্য পুস্তকে লেখা হচ্ছে এমন এক খণ্ডের কথা সর্বদাই উল্লেখ করেছেন। আমি জানিনা সে খণ্ডখানি প্রকাশিত হয়েছে কিনা। (একজন সভ্য: না, প্রকাশিত হয়নি) সে ক্ষেত্রে আমার ধারণা এই যে বইখানি তিনি সর্বপ্রাণবাদে প্রভাবান্বিত হয়ে লিখেছিলেন, কিন্তু পরে তিনি ঐ প্রভাবমুক্ত হন। সম্ভবতঃ তিনি এখন বিষয়টি সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেন এবং একারণেই তার দ্বিতীয় বইখানি এখনো প্রকাশিত হয়নি।

আপনারা কোয়েলারের বইখানি পড়ুন এবং নিজেরাই বিচার করুন। সকলেই পর্যবেক্ষণে সক্ষম ও সকলের নিকটেই সহজ বোধ্য শিম্পাঞ্জীর এরূপ কার্য্যকলাপ চোখ বন্ধ করে থেকে অস্বীকার করা অত্যন্ত অদ্ভুত ও চূড়ান্তভাবে অর্থহীন। কোয়েলার কল্পনা করেছেন যে অ-ক্রিয় অবস্থায় থাকাকালীন শিম্পাঞ্জী গভীর চিন্তা করে। কিন্তু এই অবস্থাটি আমরা অসংখ্য বার পর্যবেক্ষণ করেছি, তা শুধু বিলুপ্তি (extinction) করে, আর কিছুই নয়।

[অনুবাদক : পরিতোষ গুপ্ত]

মনস্তত্ত্ব ও স্বপ্ন সমীক্ষা সম্পর্কে ফ্রয়েড ও পাভলভ

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের 'ডিয়ে ট্রমডয়েটুং' বা 'স্বপ্নব্যাখ্যা' গ্রন্থ প্রকাশের পর ৬২ বছর পার হয়ে গেল। জার্মান বৈজ্ঞানিকের রচিত সমস্ত বই-এর মধ্যে এই বইখানিই প্রভাব বিস্তার করেছে সবচেয়ে বেশি। ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষা নীতির সবচেয়ে শক্তিশালী ধারক ও বাহক হিসেবে বইটি আজও প্রতিষ্ঠা লাভ করে আছে। এই গ্রন্থের বক্তব্য ও ব্যাখ্যার প্রতিপক্ষে কেউ কেউ ছোটখাটো সমালোচনা ও অনুকল্প যে দেননি তা নয় কিন্তু সেইসব আপত্তি মৌল নয়, সংস্কারমূলক মাত্র। ফলে স্বপ্নসমীক্ষার ক্ষেত্রে ফ্রয়েডের শিক্ষা আজও ব্যাপক এলাকা অধিকার করে বসে আছে। এটা সম্ভব হয়েছে কি করে?

বিজ্ঞানসম্মত বিষয়মুখিতার খাতিরে স্বপ্ন বিশ্লেষণে অগ্রণী হয়ে ফ্রয়েডকে তখনকার নানান তথাকথিত তত্ত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয়। ফ্রয়েড রাজ্যের কল্পনা ও অনুমানমূলক মতবাদ খণ্ডন করে নিজের রোগ নিদান শাস্ত্রীয় বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তার মতবাদের ইমারত খাড়া করেন।

নিউরোসিস ও স্বপ্নের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আবিষ্কার করে ফ্রয়েড স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে সেই মতবাদ প্রয়োগ করেন। নিউরোসিসকে কেন্দ্র করে ফ্রয়েড মনের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে যে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন তার মূল কথা এই যে চেতনা ও আচরণের উৎপত্তি সহজাত বৃত্তি থেকে। দর্শন ও মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে সেই সময়ে প্রয়োগবাদের যে প্রাধান্য দেখা গিয়েছিল ফ্রয়েডবাদের তার সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি লক্ষণীয়। কিন্তু গোড়াতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেও শেষ পর্যন্ত ফ্রয়েডবাদ কতকগুলি বাধা-ধরা গত্ ও মতের মধ্যে সীমায়িত হয়ে পড়ে। ফলে ফ্রয়েডবাদীরা মানবপ্রকৃতিকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ-বিশেষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে বিশ্লেষণ করতে সুরু করেন।

ফ্রয়েডের মতে স্বপ্ন হচ্ছে মনের অবচেতন রাজ্যে পৌঁছবার রাজপথ। প্রকৃতপক্ষে ফ্রয়েডের এই উক্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে প্রযোজ্য। স্বপ্ন এক সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং সমাজের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে তার কোন সংযোগ নেই। সেইজন্যে স্বপ্ন হচ্ছে আসলে অহংগত রাজ্যে প্রবেশের পথ।

স্বপ্ন চেতনা এক বিশেষ ধরনের চেতনা। সাধারণ চেতনা যে সব নিয়মের দ্বারা পরিচালিত, স্বপ্ন-চেতনাও সেগুলির অনুরূপ নিয়মে চলে। সেই নিয়মগুলির সম্পর্ক আছে বাহ্যিক পরিবেশের আদিম ও শাশ্বত চরিত্রের সঙ্গে, সেই পরিবেশের প্রতিফলন হিসেবে চেতনার সঙ্গে, সেই প্রতিফলনের পরিবর্তন সাধন ক্ষমতার সঙ্গে এবং মস্তিষ্কের কার্যকলাপের সঙ্গে। ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষের দেহের মধ্যেকার পরিবর্তন কি নিয়মে, কিভাবে কাজ করে সেটা বুঝতে পারলে, তবেই স্বপ্ন-চেতনার বিচার বিশ্লেষণ সম্ভব।

সজাগ অবস্থা থেকে ঘুমন্ত অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার সময় মানুষের মধ্যে পরিবর্তন হয় দুই রকমের—আচরণের প্রকৃতির মৌলিক পরিবর্তন এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের আনুষঙ্গিক পরিবর্তন। মানুষ যখন জেগে থাকে তখন সে সামাজিক কাজ করে। ভাষা হচ্ছে সেই সামাজিক কার্যকলাপের প্রতিফলন। মানুষের প্রতিটি কথা

তাকে পরিবেশের সঙ্গে সংযুক্ত করে রাখে যেমন সংযুক্ত করে রাখে চেতনাবাহী উত্তেজনাগুলি নিম্নশ্রেণীর জীবজন্তুকে।

পাভলভের মতে:শব্দ হচ্ছে 'সংকেতের সংকেত' যার দ্বারা মানুষ ধারণা গঠন করতে পারে এবং নিম্ন-শ্রেণীর জীবজন্তুর তুলনায় অনেক বেশি জটিল ও সূক্ষ্মভাবে পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। সেইজন্যে পাভলভ ভাষাকে বলেছেন, "দ্বিতীয় সাংকেতিক ব্যবস্থা।"

মানুষের জাগ্রত অবস্থায় দ্বিতীয় সংকেত ব্যবস্থার আপেক্ষিক প্রাধান্য থাকে। কোন আকস্মিক বা বেদনাদায়ক উত্তেজনা সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষামূলক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সেই রকম ব্যাপার বাদ দিলে সাধারণ অবস্থায় যে সব চেতনাবাহী উত্তেজনা জ্ঞানের কোঠায় প্রবেশ করে, সাড়া জাগাবার আগে সেগুলিকে বহু স্তরের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। সেই সাড়ার মাধ্যমেই মানুষ বরাবরের মত ধারণা গঠন করে, বস্তু বিশেষের আকার দেখে সেটি চিনতে শেখে এবং শেষপর্যন্ত যুক্তিসম্পন্ন চিন্তা করার ক্ষমতা লাভ করে অর্থাৎ তার বোধশক্তি বস্তুর মৌলিক ধর্ম এবং বিভিন্ন বিষয়ের অন্যান্য সম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারে। এইভাবে ভাষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে প্রকৃতিকে, সমাজকে এবং নিজেকে জানবার ও বুঝবার ক্ষমতার উদ্ভব হয় এবং সামাজিক জীবনে অংশগ্রহণের উপযোগিতা সে লাভ করে। প্রত্যেক মানুষের জ্ঞান, তার নিজস্ব চেতনামূলক অভিজ্ঞতা, পদে পদে তার সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে বাঁধা বলে তার চেতনার মধ্যে প্রতিফলিত হয় সেই সামাজিক পরিবেশের অন্তর্নিহিত বিভিন্ন শক্তি ও গতির কার্যকলাপ।

ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরে মানব চেতনার একটি বিশেষ উপকরণ হচ্ছে বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারার ঘাত-প্রতিঘাত। কোন একটি বিশেষ ব্যাপার সম্পর্কে জ্ঞান যতই পরিমাণে বেড়ে চলে ততই সেই বিষয়টি সম্পর্কে, আগেকার ধারণার সংগে, সেটির আভ্যন্তরিণ গঠন ও বাহ্যিক পরিবেশ সম্পর্কে নবলব্ধ জ্ঞানের বিরোধ তীক্ষ্ণতর হতে থাকে। এইভাবে সেই বিরোধ এমন এক জায়গায় এসে ঠেকে যেখানে সেই বিষয়টি সম্পর্কে ধ্যানধারণার এক গুণগত পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ জ্ঞান ও বিদ্যা অন্য এক উর্ধ্বস্তরে উন্নীত হয়।

শ্রেণী বিভেদমূলক সমাজে সমবায়মূলক ও শোষণমূলক, এই দুটি পরস্পরবিরোধী কর্মধারার অস্তিত্ব প্রত্যেক মানুষের মধ্যে পরস্পরবিরোধী চিন্তাক্রিয়ার গতিবিধি নির্ধারিত করে। চিন্তাক্রিয়ার বাস্তব রূপান্তর সকলের ক্ষেত্রে একরকম হয় না। কেউ কেউ পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারার মধ্যে একটা আপস করবার চেষ্টা করেন। এঁদের আমরা বলি আপসপন্থী। কেউবা সমবায়মূলক চিন্তাধারাকে একেবারে খতম করবার চেষ্টা করে, যার ফলে দুটি ধারার বিরোধ চরমে গিয়ে ঠেকে। আপসপন্থীরা একদিকে যেমন বিরোধটা আংশিকভাবে আয়ত্তে আনেন তেমনি আর এক দিকে সেই বিরোধ তীব্র হতে থাকে। কিন্তু সেই সমাজেরই মধ্যে অন্য কতকগুলি শক্তি থেকে এই বিরোধের এমন সমাধানের প্রয়োজনের উদ্ভব হয় যা সর্বসাধারণের কল্যাণের অনুকূল।

প্রত্যেকটি মানুষ তার চেতনা ও কার্যকলাপ সমেত সমাজের এই দুটি পরস্পরবিরোধী প্রবাহের যে কোন একটির মধ্যে বেশি করে জড়িয়ে পড়ে। সামাজিক চেতনাসম্পন্ন সুস্থমনা শ্রমিক বা সামাজিক চেতনা বিবর্জিত ধনিক কাউকেই সামাজিক ধারা-বিশেষের দ্বারা ষোলআনা প্রভাবিত বলা চলে না। অন্য

ধারাটির প্রভাবও কিছুটা থাকে এবং কোন্ ধারার প্রভাব কোন্ শ্রেণীর ওপর কতটা সেটা বিচার বিশ্লেষণ করে বলা যায় সমাজের গতি কোন্ দিকে। উভয় ধারার মানুষদের কাউকেই জ্ঞানহীন বা স্নায়ুবিকার-গ্রস্ত বলা চলে না।

বাস্তব ক্ষেত্রে অবশ্য কাল ও দেশ বিশেষে যে ভাবাদর্শের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত থাকে, সেটি শ্রেণী-বিভেদের সীমারেখা ভেদ করে প্রত্যেকটি শ্রেণীকে কম-বেশি প্রভাবিত করে। যা নতুন, যা উদীয়মান, তার সঙ্গে নিজেকে এক করে দেখা কিম্বা যা মুমূর্ষু তার সঙ্গেও নিজেকে মিলিয়ে দেওয়া সম্ভব হলেও, সর্ব-ক্ষেত্রেই যে মানুষ এইভাবে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে, এমন কথা নেই। মানুষ যখন নতুন বা পুরানোর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে অপারগ হয় তখনই দেখা দেয় মানসিক দ্বন্দ্ব, যার ফলে ঘটতে পারে স্নায়বিক বিকার। চেতনা যখন তার কার্যকলাপ ও আচরণ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করতে অক্ষম হয় তখনই মানুষের মন অহংগত বিড়ম্বনায় উৎপীড়িত হয়, তা বাইরে তার লক্ষণ প্রকাশ পাক বা না পাক। এই ধরনের স্নায়বিক বিকার, চেতনা ও আচরণের মধ্যে বিরোধ ক্রমশ তীব্রতর করতে থাকে। ফলে মানুষটির সম্প্রসারণশীল কর্মক্ষেত্র তার চেতনাপটে বিকৃতরূপে প্রতিফলিত হয়। তখন সে নানারকম উদ্ভট কল্পনা করে যেগুলির সঙ্গে তার বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার কোন সম্পর্ক নেই। মানুষের মতি-গতির পূর্বলক্ষণগুলি নির্ভর করে তার সামাজিক কার্যকলাপ এবং সেই কার্যকলাপের গতির ওপর। যে কাঠামের মধ্যে ব্যক্তি বিশেষ শুধুমাত্র শোষণমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে সেখানে স্নায়বিক বা মানসিক বিকার সত্ত্বেও, সেই লোকটির সামাজিক মূল্যবোধের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না। এই ধরনের লোকেরা যে শক্তি তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, সেই শক্তিরই সঙ্গে এমনভাবে নিজেদের জড়িয়ে ফেলে যে কোনরকম পরিবর্তনের সম্ভাবনা তারা সইতে পারে না। অবশ্য অধিকাংশ লোকের মধ্যেই চরম এদিক বা চরম ওদিক দেখা যায় না। তারা দোটানার মধ্যে থেকে যে কোন একদিকে বেশি ঝোঁকে। সেই জন্য স্নায়বিক বিকারের মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসাও সকলের ক্ষেত্রে একই প্রেসক্রিপশন অনুসারে চলতে পারে না। স্নায়বিক বিকারকে যে প্রচ্ছন্ন শক্তিগুলি রূপ দেয় ও চালু রাখে তা ব্যক্তিবিশেষের অবচেতন মনে সমাহিত থাকে না। সেগুলি আত্মগোপন করে থাকে, তার কার্যকলাপের সঙ্গে সেই সময়কার বৃহত্তর ঐতিহাসিক রূপায়ণের ধারার পারস্পরিক যোগাযোগের মধ্যে। এইখানেই হচ্ছে মানুষের স্বপ্নের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক।

স্বপ্নপটের প্রতিফলন যেমনই হোক না কেন তার উৎপত্তি হয় জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতা থেকে। ফ্রয়েড মনে করতেন, ঘুমের মধ্যে অহং বহির্বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক চ্যুত হয়ে প্রধানতঃ আত্মরতিতে ব্যাপৃত থাকে ; কাজেই প্রবৃত্তিমূলক উদ্দীপকের শক্তি বেড়ে যায়। এই উদ্দীপক অচেতন মনের অবদমিত বাসনা-কামনাগুলোকে জাগিয়ে তোলে। ঘুমন্ত অবস্থায় অহমিকার সতর্কতামূলক প্রভাব কমে যাওয়া এবং অনুভূতি সঞ্চালক পথগুলি রুদ্ধ হওয়ার ফলে সচেতন মনের ইচ্ছা-অভিপ্রায়গুলির উপরের দিকে ঠেলে ওঠার সুবিধা হয়। এই হচ্ছে ফ্রয়েডের মত।

কিন্তু পাভলভের অনুগামীরা চেতনার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে তাঁদের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বলেন যে একটি স্তর থেকে ধারণা উচ্চতর স্তরে উঠতে পারে তখনই, যখন সেইরকম ব্যাপার ঘটবার অনুকূল অবস্থা পরিপক্ক হয়। এবং সেটা ঘটার ফলে যে গুণগত পরিবর্তন হয় তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য অন্য সমস্ত রকমের সম্পর্কের মধ্যেও কিছু না কিছু অদল বদল হয়। তার মানে দাঁড়ায় যে, কোন একটি মুহূর্তে কোন

একটি ঘটনা এরূপ ক্ষমতা নিয়ে দেখা দিতে পারে যা বর্তমান সংঘাতকে এমন এক চরম পর্যায়ে নিয়ে যাবে, যেখানে ব্যক্তিবিশেষ এক গুণগত নতুন স্তরে ডিঙ্গিয়ে যাবার মুখে এসে দাঁড়াতে বাধ্য হয়। প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল। প্রথমত যে মানসিক সূত্রগুলির চরিত্র আবিষ্কার করতে হবে সেগুলি নির্ভুলভাবে ধারণায়িত করা যায় না এবং সেগুলি সমবায়িক বা সামাজিক নয়, ব্যক্তিকেন্দ্রিক। দ্বিতীয়ত পুরানো স্তর থেকে নতুন স্তরে উন্নীত হওয়ার ফলে পুরাতন ও পরিজ্ঞাত কার্যকলাপের জায়গায় যে নতুন কার্যকলাপ এসে জায়গা অধিকার করে বসে সেগুলি অপরীক্ষিত ও অজানা। এই ধরনের ঘটনাগুলি বাইরে থেকে আকস্মিক মনে হলেও বর্তমান অন্তঃসংঘাতগুলি তীব্রতর করে গুণগত রূপান্তর ঘটাবার প্রচ্ছন্ন ক্ষমতা রাখে বলে সেগুলি জরুরী হয়ে উঠতে পারে। এই বিষয়ের একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

একজন স্থপতি ছিলেন—স্বভাবটা তাঁর অন্তর্মুখী। একবার একটা জরুরী কাজের তাগিদে তাঁর পর পর কতকগুলি রবিবারেও নীলনক্সা (blue-print) রচনার কাজ করতে হয়। স্ত্রী এবং চারটি সন্তান নিয়ে তাঁর পরিবার। তাদের থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুখ গুঁজে তিনি কাজের মধ্যে ডুবে রইলেন। তিন সপ্তাহ ব্যাপারটি তাঁর স্ত্রী সহ্য করলেন। কিন্তু চতুর্থ রবিবারে তাঁকে খুব বদমেজাজী দেখা গেল। কাজের ঘরে বন্ধ থেকেও ভদ্রলোকের কানে তাঁর স্ত্রীর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে রাগারাগির আওয়াজ আসতে লাগল। তারপর ভদ্রলোকের ঘুমের মধ্যে যে স্বপ্ন ভেসে উঠল সেটি এইরকম :—

"আমি আবহাওয়া অফিসে টেলিফোন করে জানতে চাইলাম যে সেইদিন সন্ধ্যায় সহরে ঝড় আসবার সম্ভাবনা আছে কিনা। কিন্তু এই প্রশ্ন করার সময় নিজেকে কেমন যেন বিব্রত ও অপরাধী মনে হচ্ছিল। টেলিফোনটা বন্ধ করতে যাচ্ছি এমন সময় ঘুম ভেঙ্গে গেল।"

স্বপ্নটির বিশ্লেষণ করা যেতে পারে এইভাবে : পরিবার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ভদ্রলোক স্ত্রীর ওপর যে দায়ের বোঝা চাপিয়েছিললেন সেটা মনে মনে টের পেয়ে তিনি অস্বস্তি বোধ করছিলেন। কিন্তু তিনি এও বুঝছিলেন যে এছাড়া কোনো উপায় নেই। আসলে তাঁর স্ত্রীর রাগারাগিটাকেই তিনি ঝড়ের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। তাঁর মনের মধ্যে যে সংঘাত তীব্রতর হয়ে চেতনার কাছাকাছি এসে পৌছচ্ছিল, তার উদ্ভব হয়েছিল একদিকে তাঁর কর্তব্যের প্রকৃত চরিত্রের এবং অন্যদিকে তাঁর পারিবারিক দায়িত্বের বিরোধের মধ্যে থেকে।তাঁর অস্বস্তি হচ্ছে তাঁর পারিবারিক দায়িত্বের অবহেলা সম্পর্কিত চেতনার প্রতিফলন। তিনি নিজে যে যুক্তি দিয়ে তাঁর আচরণ ন্যায্য প্রতিপন্ন করতে চাইছিলেন তা ক্রমশ পরাজয় স্বীকার করছিল এই প্রকৃত অবস্থার প্রতিফলনের কাছে যে কাজের চাপ যতই থাকুক না কেন, পারিবারিক দায়িত্ব থেকে এইভাবে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হওয়া তাঁর উচিত হয়নি।

মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে তখনই যখন স্বেচ্ছা-অনিচ্ছানির্বিশেষে পরিবেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার কোন চেষ্টা তার থাকে না। পরিবর্তনের প্রথম স্তরে তার আচরণের সামাজিক দিকটি ঠিক বিপরীত দিকে অর্থাৎ ব্যক্তিগত দিকে রূপান্তরিত হয়। দ্বিতীয় স্তরে পরিবর্তন হয় মস্তিষ্কের কার্যকলাপে অর্থাৎ মস্তিষ্ক বল্কলে নিস্তেজনা (Inhibition) ক্রিয়া-প্রবাহ ছড়িয়ে পড়ে। এই ব্যাপার ঘটার সময় প্রাথমিক সংকেত ব্যবস্থার আপেক্ষিক প্রাধান্য ঘটে। সুষুপ্তির আবির্ভাব ঘটে ক্রমান্বয়ে। সেটা কারো ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। ঘুমের গভীরতা সকলের ক্ষেত্রে সমান নয়। সুষুপ্তির আবির্ভাবের যে কোন মুহূর্তে লোকটির সামগ্রিক গতি হয় জাগ্রত অবস্থার দিকে না হয় আরও গভীর ঘুমের দিকে থাকে। একদিকে

আছে জাগরিত অবস্থা ও জাগরণমুখী চেতনা, অন্যদিকে আছে গভীর নিদ্রা ও চেতনাশূন্যতা। এই অন্তর্বর্তী অবস্থার কোন একটি স্তরে মানুষের চেতনা যে ভাবে সাড়া দেয়, তাই হচ্ছে স্বপ্ন। জাগরণ-মুখী অবস্থায় চেতনার এমন এক গুণগত রূপান্তর হতে পারে যার কার্যকলাপের চরিত্রও অন্যরকমের। সেই কার্যকলাপ ঘটে স্বেচ্ছার এলাকার বাইরে এবং তার পরিবেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার প্রয়োজন হয় না। রূপান্তরণের অবস্থায় চেতনা যে কোন একটি লক্ষ্যের দিকে যেতে পারে—সেই লোকটির কার্যকলাপ এমনভাবে প্রতিফলিত করবে যা হয় নিদ্রার অনুকূল, না হয় জাগরণের অনুকূল। চেতনা আসলে মানুষের পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করার হাতিয়ার মাত্র—কেবল প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য নয়, অন্য লোকদের মাধ্যমে অর্থাৎ সমাজের মাধ্যমে পরোক্ষে সেই সম্পর্ক রক্ষা করারও হাতিয়ার। নিম্নতর শ্রেণীর জীবজন্তুর ক্ষেত্রে পরিবেশের মধ্যে তাদের আত্মরক্ষার অর্থাৎ অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য যে বৃত্তিগুলি আছে মানুষের ক্ষেত্রে সেগুলির স্থান নিয়েছে তাদের পরিবেশের সঙ্গে সচেতন সম্পর্ক। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লে সামাজিক আচরণ যখন থেমে যায় তখন আত্মরক্ষামূলক সতর্কতার প্রয়োজনের চেহারাটাও যায় বদলে।

স্বপ্ন ব্যাপারটা ঘটে, হয় ঘুমের দিকে এগিয়ে যাওয়ার, সময় না হয় ঘুমন্ত অবস্থায় কোনরকম মানসিক বা শারীরিক গণ্ডগোল হলে। পাভলভের মতে রূপান্তরণের সময় কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকলাপের ফলেই স্বপ্নের উদ্ভব হয়। তখন দ্বিতীয় স্তরের সংকেত ব্যবস্থা বাধ বা নিস্তেজনা-ক্রিয়ার দ্বারা নিশ্চল হয়ে গেলে প্রাথমিক সংকেত ব্যবস্থার অপেক্ষাকৃত আদিম কার্যকলাপের প্রতিফলন এক মুক্তিলাভ-ক্রিয়া হিসাবে স্বপ্নের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। তখন প্রাথমিক সংকেত ব্যবস্থার নিয়মগুলিই বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে। যথেষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন কোন উদ্দীপকের আঘাতে ঘুমন্ত অবস্থা থেকে মানুষ জাগরণমুখী হতে থাকে আর্থাৎ তার ঘুম পাতলা হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সে কোন্ দিকে যাবে সেটা নির্ভর করে তার শরীরের তখনকার ঘুমের প্রয়োজনের মাত্রার ওপর, উদ্দীপকটির প্রকৃতির ওপর এবং চেতনাসম্পন্ন প্রতিফলন অর্থাৎ স্বপ্নের উপর। ঘুমের প্রয়োজন যখন উদ্দীপকের আঘাতের জোরের চেয়ে বেশি হয় তখন ঘুম ভাঙ্গে না। সেই সময়ে তার চেতনার মধ্যে প্রতিফলিত হয় উদ্দীপকটির আবির্ভাব ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফল। কিন্তু এইসব ব্যাপারগুলির মধ্যে মোটামুটি যখন একটা ভারসাম্য থাকে তখন স্বপ্নের ছবি এবং ঘুমন্ত লোকটির মতিগতিও সেই ভাবেই নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু প্রতিফলন বা স্বপ্নের প্রকৃতি যাই হোক না কেন, রূপান্তরণের অবস্থায় মস্তিষ্কের কার্যকলাপের মধ্যে কিছুটা অসঙ্গতি দেখা না দিয়ে পারে না। কারণ প্রাথমিক সংকেত ব্যবস্থার তখন প্রাধান্য থাকলেও দ্বিতীয় স্তরের সাংকেতিক ব্যবস্থাও কিছুটা কার্যকরী থাকে। তখন ভাষার মাধ্যমে ধারণা প্রকাশ করা যায় না বলে উদ্দীপকগুলি এক পরিদৃশ্যমান কল্পচ্ছবির রূপ নেয় যা অনেক সময় এক চাঞ্চল্যকর অতিরঞ্জনের মত। ফ্রয়েড এই স্বপ্নের কল্পচ্ছবিকে অবচেতন শক্তিগুলির ও অহমিকার বিধি নিষেধের মধ্যে একটা আপোষের প্রতীক বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু পাভলভের মতে এটি হচ্ছে মস্তিষ্কের কার্যকলাপের সাময়িক পরিবর্তনপ্রসূত আকারিক রূপান্তর মাত্র।

স্বপ্নের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মানুষের ইচ্ছাশক্তির কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং চেতনাপটে তার প্রতিফলনও ইচ্ছাশক্তির আয়ত্তের বাইরে। যে স্বপ্ন দেখছে, সে স্বপ্ন দেখতে বাধ্য হচ্ছে ; কারণ দেখা না দেখায় তার কোন হাত নেই। মানুষের নিজের কাজকর্মের স্বাধীনতা নির্ভর করে বাস্তব পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে ধারণা গঠন করবার ক্ষমতার ওপর। স্থান ও কাল বিচার করবার ক্ষমতার ওপর। ঘুমন্ত অবস্থায় এই ক্ষমতাগুলি

কাজ করে না। তখন শুধু প্রাথমিক সংকেত ব্যবস্থা অতীত অভিজ্ঞতা নিয়ে কাজ করে। জাগন্ত অবস্থার চেতনার সঙ্গে ঘুমন্ত অবস্থার চেতনার মূল পার্থক্য হচ্ছে এইখানে।

তাহলে স্বপ্ন ব্যাখ্যার তাৎপর্য কোথায়? ফ্রয়েডবাদীদের মতে স্বপ্নের মধ্যে মানুষ যে সব জিনিস দেখে তাই থেকে সে নিজের নির্জ্ঞান মনের অজ্ঞাত দিকের ইংগিত পায়, কারণ মনের অচেতন স্তরের কামনাবাসনা স্বপ্নের মাধ্যমে চেতনার স্তরে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু পাভলভবাদীরা মানুষের মনকে বাস্তব পারিপার্শ্বিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিচার করেন না। তাঁদের বিচারে মানুষের মনে বাস্তব পারিপার্শ্বিকের প্রভাব এবং মনের মধ্যে চিন্তাধারার দ্বন্দ্ব থেকেই স্বপ্ন চেতনার উদ্ভব। স্বপ্নের উদ্ভব হয় স্বেচ্ছাবহির্ভূত মানস ক্রিয়া থেকে এবং স্বপ্ন হচ্ছে সেই স্বেচ্ছাবহির্ভূত মানসক্রিয়ার প্রতিচ্ছবি। অতীতের যে সব কার্যকলাপ আয়ত্তের বাইরে ছিল অর্থাৎ যেগুলি চেতনার স্তরে ঠিকমত প্রতিফলিত হয়নি বলে বোধগম্য ও আয়ত্তে ছিল না সেইগুলির মধ্যে কোনো সাম্প্রতিক ঘটনার প্রভাবে সংঘাত তীব্রতর হলে স্বপ্নের চেতনায় তার প্রতিবিম্ব দেখা দেয়।

ফ্রয়েডের বক্তব্য এই যে স্বপ্ন চেতনা হচ্ছে এক ছদ্মবেশ উন্মোচনের সামিল। প্রচ্ছন্ন ও প্রকট চিন্তার ওপর অহমিকার যে বাধা নিষেধমূলক নিয়ন্ত্রণ আছে সেটা তুলে নিলে লোকটির প্রচ্ছন্ন মন প্রকটের স্তরে উঠে আসে। এর মানে স্বপ্নের উৎপত্তি হয় দমন করার ইচ্ছা থেকে। এই হচ্ছে ফ্রয়েডের বক্তব্য। কিন্তু পাভলভবাদীরা স্বপ্ন ব্যাখ্যাকে ছদ্মবেশ খুলে দেওয়ার সামিল বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে স্বপ্নের বিষয়গুলি জাগরণমুখী চেতনায় উত্তীর্ণ হয় কিন্তু দ্বিতীয় স্তরের সংকেত ব্যবস্থা অর্থাৎ ভাষা তখন কাজ না করা সত্ত্বেও সেই স্বপ্ন সমীক্ষণের দ্বারা বলা যায় যে স্বপ্ন যে চিন্তাধারার সংঘাতটি সামনে তুলে ধরল, স্বপ্নদর্শক সেই সংঘাতটি বাস্তবে সমাধান করবার জন্য প্রস্তুত কিনা। কোন একটি স্বপ্নের সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ সম্ভব না হলেও একথা বলা চলে না যে স্বপ্নের মূল উপমূলগুলি অবচেতনের গভীরে অদৃশ্য হয়ে হয়েছে বলেই পুরোপুরি বিশ্লেষণ করা গেল না।

স্বপ্ন সমীক্ষা সম্পর্কে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব গোড়ার দিকে বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে সাহায্য করেছিল একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু পরে যখন তিনি তাঁর তত্ত্বকে এক তৃতীয় শক্তি অর্থাৎ অচেতনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন, সেটা শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় সমাজ ব্যবস্থা বিশেষের মানব মনের ওপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে বাদ দিয়ে শুধু মনোবৃত্তির ভিত্তিতে মানব মনের ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়াস। ফ্রয়েডের তত্ত্ব পড়লে মনে হবে সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে মানব মনের কোনই সম্পর্ক নেই। এই অহংগত ও ভাববাদী ব্যাখ্যার ফলে ফ্রয়েডের তত্ত্ব স্থাণু হয়ে পড়ে। স্বপ্ন সমীক্ষায় অবচেতনকে নির্ধারক ভূমিকা দান, রসায়ন শাস্ত্রে ফ্লজিস্টন ও পদার্থ বিজ্ঞানে ঈথার নামক কল্পিত তৃতীয় শক্তিকে নির্ধারক ভূমিকা দানের সামিল। এক সময়ে ঈথারের অস্তিত্ব কল্পনা না করে যেমন বেতারের ব্যাখ্যা দেওয়া যেত না তেমনি অচেতনকে বাদ দিয়ে ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণে স্বপ্ন সমীক্ষায় ফ্রয়েডের তত্ত্ব এখন নেতিবাচক ভূমিকা নিয়ে মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে এক প্রতিক্রিয়াশীল অস্পষ্টতাবাদের কুহেলিকা জাল বিস্তার করে চলেছে।

সম্রাট

[আলোচনাধর্মী নাটক]

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ভূমিকা

জাতি-ব্যক্তি নর-নারী নির্বিশেষে সমানাধিকারের ভিত্তিতে সমাজ প্রতিষ্ঠা, এই শতাব্দীর দাবি। বিজ্ঞান ও টেকনলজির উন্নতি এ-দাবিকে আজ সম্ভাব্যের পর্যায়ে এনেছে। শোষণহীন সমানাধিকারভিত্তিক সমাজে আন্তর্জাতিক শ্রেণী-গত ও ব্যক্তিগত ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব-কলহের হবে পরিসমাপ্তি। সৌভ্রাত্র ও মানবিকতার ঘটবে পূর্ণ বিকাশ। অনাদিকাল থেকে এই সমাজের স্বপ্ন দেখে আসছে মানুষ!

এক শ্রেণীর লোক যারা আজ সমাজের উপরতলায়—তাঁরা তাঁদের ভোগ-স্বত্ব কায়েমী রাখতে বদ্ধপরিকর। "জাতিতে জাতিতে, ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে—নর ও নারীতে পার্থক্য জন্মগত ও অপরিবর্তনীয়" : এই রকম প্রচার করে তারা 'সমানাধিকার ভিত্তিক' সমাজ গঠনের ও মানবজাতির অগ্রগমনের পথে বাধা সৃষ্টি করতে চান। মেণ্ডেল-মরগ্যান ম্যালথাস জেম্‌স ও ফ্রয়েডের মতবাদ ও তত্ত্বকথা এঁদের সহায় অবলম্বন। সাম্রাজ্যবাদ ও একচ্ছত্র পুঁজিবাদ ও ফ্রয়েড-বাদের সম্পর্ক নিয়ে এ নাটক।

'সম্রাট' ও ফ্রয়েডবাদ

॥ সম্পাদকমণ্ডলী ॥

'নির্জ্ঞান' মন আমাদের আবেগ, ক্রিয়াকলাপ ও ধ্যানধারণাকে প্রভাবিত করে ; বুদ্ধি ও চেতনা 'নির্জ্ঞান' শক্তির কাছে নিতান্তই দুর্বল ;—এই ধরনের তত্ত্বকথা উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে প্রচারিত হতে থাকে। মায়ার্স, জেনেট, মর্টন প্রিন্স প্রমুখ মনস্তাত্ত্বিক পণ্ডিত এ-তত্ত্বের উদ্গাতা। এ-সময়টা শোপেনহাওয়ার, নীটসে, ম্যাক্, এ্যাভেনেবিয়াস প্রমুখ দার্শনিকদের প্রতিপত্তির যুগ। লেনিন 'মেটিরিয়ালিজ্‌ম ও এম্‌পিরিওক্রিটিসিজ্‌ম' গ্রন্থে শেষোক্তদের বস্তুবাদ বিকৃতির প্রচেষ্টা ও প্রচ্ছন্ন ভাববাদকে বৈজ্ঞানিক যুক্তিতর্ক দিয়ে খণ্ডন করেন। কিন্তু 'নির্জ্ঞান' মনস্তত্ত্ববাদ জেম্‌স্ ও ফ্রয়েডের কল্পনার পক্ষচ্ছায়ায় পুষ্ট হয়ে প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে দুনিয়ার বুদ্ধিজীবীদের চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করতে থাকে। উনিশ শতকের শেষের দিকে একচ্ছত্র পুঁজিবাদের সঙ্কট, সাম্রাজ্যবাদের অভ্যুত্থান ও অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকে পুঁজিবাদী দুনিয়ার আর্থিক দুর্যোগ, অনিশ্চয়তার সঙ্গে 'নির্জ্ঞান মনস্তত্ত্ববাদের' ক্রমপ্রসারের সম্পর্ক লক্ষণীয়। ফ্যাসিবাদের উদ্ভব এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতির যুগ ফ্রয়েডবাদের সম্প্রসারণের যুগ। এ-সময়ে অনেক মার্ক্সবাদীও ফ্রয়েডীয় 'নির্জ্ঞানতত্ত্বের' স্বরূপ উপলব্ধি করণে অক্ষম। ফলে যুক্তিবাদ ও কার্যকারণবাদের স্থালাভিষিক্ত হল অযৌক্তিক অজ্ঞেয় রহস্যময় এক শক্তিবাদ। পুঁজিবাজারের অনিয়মতান্ত্রিকতা, অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার ব্যক্তিমানসের প্রতিফলনকে, ফ্রয়েড মানসধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতা ও বঞ্চনামূলক সমাজ-ব্যবস্থাকে সনাতন নিয়ম বলে মেনে নিতে বললেন। এর দরুন মনোধর্মের বিকৃতিকে স্বাভাবিক মনোধর্ম, 'এ্যাগ্রেসিভ ইনষ্টিংক্ট' বলে প্রচারিত করলেন। একচ্ছত্র পুঁজিবাদের শেষ অধ্যায়ের সঙ্কটের আসল কারণগুলো জনচৈতন্যকে যাতে প্রভাবিত না করতে পারে, সেদিকে শোষক সম্প্রদায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ফ্রয়েডের 'নির্জ্ঞান' মনস্তত্ত্ব প্রচারে তাই এঁদের অপরিসীম উৎসাহ। যুক্তি, বুদ্ধি, চেষ্টা—এর ফলে ব্যক্তিগত বা সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব নয়,—অজ্ঞেয় এক শক্তি দ্বারা আমরা পরিচালিত—তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না,—এই হচ্ছে ফ্রয়েডবাদের মূল সূত্র! কাজেই সঙ্কট যেখানে তীব্র, ফ্রয়েডীয়দের সেখানে বেশী প্রভাব। আমেরিকা ফ্রয়েডবাদের লীলাভূমি। ব্যক্তি সেখানে নিঃসঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন। আমাদের দেশেও একশ্রেণীর সাহিত্যিক ও সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে এই প্রবণতা লক্ষণীয়।

'মানুষ সহজাত প্রবৃত্তির দাস' ;—'ডেথ-ইরোজ্-ইন্‌স্‌টিংক্ট' মানব প্রকৃতির নিয়ন্ত্রক ও নিয়ামক—এই ধারণা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর ও অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। কোনো পরীক্ষিত তথ্য দ্বারা এ-ধারণা প্রতিষ্ঠিত নয়। অথচ এই ভ্রান্ত ধারণা দ্বারা অধিকাংশ সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষ আবিষ্ট। কারণ যে সমাজ ব্যবস্থায় আমরা বাস করি, তার স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ণয়ের পথে বাধা বহুবিধ, আর রহস্যময়তার প্রতি মানুষের আকর্ষণ স্বভাবজ। সাম্রাজ্যবাদী প্রচার যন্ত্র ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের আর একটা দিকের প্রচারে অতিমাত্রায় মুখর। বলা হয়,—জাতিগত, শ্রেণীগত, ব্যক্তিগত বৈষম্য [বুদ্ধিবৃত্তিক ও চারিত্রিক] জন্মসূত্রপ্রাপ্ত, শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়। বর্তমান পৃথিবীব সবদেশে [সমাজতান্ত্রিক দেশ বাদ] শ্বেতজাতি, বুর্জোয়াশ্রেণী ও পুরুষদের প্রাধান্য বর্তমান। 'এই প্রাধান্য স্বভাবগত ও মনস্তত্ত্ব সম্মত', জেম্‌স্ ফ্রয়েডের মতবাদ দিয়ে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চলেছে সর্বত্র।

আজ সাম্রাজ্যবাদ ফ্রয়েডীয় তত্ত্বকে সুনিপুণ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে শিখেছে এবং তার ফলে বেশ কিছু সংখ্যক লোক বিভ্রান্ত হচ্ছে। এ-সম্পর্কে 'মানব মনের' পাতায় প্রবন্ধকারে কিছু কিছু লেখা বেরিয়েছে। এবার নাটকাকারে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের এই ব্যবহারিক দিক সম্পর্কিত আলোচনা পরিবেশিত হল। বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর সংলাপের মধ্য দিয়ে বক্তব্য বৈচিত্র্যময় ও কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে উঠবে, প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত বক্তব্যের চেয়ে সহজগ্রাহী হবে ;—সম্পাদকমণ্ডলী এ-আশা পোষণ করেন বলেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় রঙমহলে, ১৯৫৭ সালের শেষের দিকে, 'পাভলভের জন্মদিন' উপলক্ষ্যে। এর পর আরও দুবার অভিনীত হয়েছে। অভিনয় করেছেন পাভলভ ইনস্টিটিউটের সভ্যবৃন্দ। প্রথম অভিনীত পাণ্ডুলিপি বহুল পরিমাণে সংশোধিত ও পরিবর্তিত হয়েছে। 'নাটকে' র নাটকীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। নাটকাকারে বক্তব্য পেশ করার সমীচিনতা সম্বন্ধে 'মানব মন'-এর পাঠকদের মতামত জানতে পারলে সুখী হব।

সম্রাট নাটকের পাত্রপাত্রী

সুরেশ্বর চৌধুরী	—	শিল্পপতি —
ডাঃ সোমেশ সেন	—	সুরেশ্বর বাবুর বন্ধু ও চিকিৎসক —
ঝানুমল	—	সুরেশ্বরের অংশীদার —
সুখময়	—	„ পি, এ —
শৈলেন সমদ্দার	—	সুরেশ্বরের নিয়াজো অফিসার —
নিখিলেশ	—	ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য লীগের প্রচার সচিব —
স্যার সূর্যনারায়ণ	—	ব্যবসায়ী —
রিচার্ডসন	—	বিদেশী ব্যাঙ্কের এজেন্ট —
সব্যসাচী শিকদার	—	পার্লামেন্টের সদস্য —
ব্রজেশ্বর বাগচী	—	আধুনিক ঘটক —
কেদার শর্মা	—	লেখক —
কবি	—	—
রিপোর্টার	—	—
সদানন্দ রায়	—	নৃতত্ত্বের অধ্যাপক —
সমর	—	ছাত্র —
শিবশঙ্কর সন্যান্যাল	—	মনস্তত্ত্বের পণ্ডিত —
হীরক দে	—	ছাত্র —
নির্মলা	—	শিবশঙ্করের ভগ্নী —
সীমা	—	„ কন্যা —
ছাত্রছাত্রী ইত্যাদি		

সম্রাট

প্রথম অঙ্ক

১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসের এক বিকেল।

সুরেশ্বরের বাড়ীর সামনের লন। ডান দিকে সুরেশ্বরের বসবার ঘরের একাংশ। লনের বাঁ দিকে গেট—সামনে দেখা যাচ্ছে প্রশস্ত রাজপথ। লনে ইতস্ততঃ কয়েকখানি চেয়ার, বেঞ্চ পাতা আছে। কিছু লোক এদিক ওদিক দাঁড়িয়ে জটলা করছে। ঘরে পিছনের দেওয়ালে এশিয়ার মানচিত্র সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে। একপাশে একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল, তিনখানা চেয়ার—একটা গদরেজের আলমারী। এক কোণে টেলিফোন। ঘরটির ডান দিকে ও বাঁ দিকে দু'টো দরজা, বাঁ দিকের দ্বিতীয় দরজা দিয়ে লনে আসা যায়। ডান দিকে দরজাটা নজরে পড়ে না—বাড়ীর ভেতর দিককার যাতায়াতের রাস্তা।

এই দৃশ্যে ঘর আর লনে পালাক্রমে কথাবার্তা চলছে। ঘরে যখন কথাবার্তা চলছে, লনের আলো নেভানো ও লনের দৃশ্যে ঘর অন্ধকার।

সুখময়, সুরেশ্বর ও ঝানুমলকে দিয়ে নাটকের আরম্ভ। সুরেশ্বর নাটকের প্রধান। আধুনিক শিল্পপতি—বয়স ৬০। সুখময় তার ষ্টেনো—বয়স ৩৬। ঝানুমল ৪৫ বছরের এক মাড়োয়ারী বণিক—সুরেশ্বরের অংশীদার।

ড্রপ উঠতেই দেখা যাবে সুখময় গেটের সামনে দাঁড়িয়ে। এক আধ জন করে অভ্যাগত আসছেন। সুখময় তাঁদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসছে। আজ সুরেশ্বরবাবুর জন্মতিথি। এই দিনে তিনি মুক্ত হস্তে দান করে থাকেন। তাছাড়া সাহিত্য-বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে বিশিষ্ট সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিকদের এদিনে সম্মানিত করা হয়। দারোয়ানরা কাপড় ও কম্বল দিচ্ছে দুঃস্থদের, তাদের কোলাহল শোনা যাচ্ছে। নিমন্ত্রিতেরা সংখ্যায় কম, কিন্তু পদমর্যাদায় ভারী। পোশাকে পরিচ্ছদে আভিজাত্য প্রকাশ পাচ্ছে।

ঘরের মধ্যে সুরেশ্বরবাবু ব্যস্তসমস্ত হয়ে আলমারীটা খুঁজছেন দেখা গেল। কোন দরকারী জিনিস পাওয়া যাচ্ছে না। মুখে তার বিরক্তির ছাপ।]

[ঝানুমল প্রবেশ করলো বাঁ দিকের প্রথম দরজা দিয়ে]

ঝানুমল—নমস্তে বাবুজী।

সুরেশ্বর—এই যে ঝানুমল। বস—

ঝানুমল—বাবুজী ?

সুরেশ্বর—কি খবর ?

ঝানুমল—খবর ত' বড় জবর বাবুজী। শৈলেনবাবু দেল্‌হি থেকে তার ভেজিয়েছেন। ড্রাগ তৈয়ারীর লাইসেন্স হামাদেরই মিলে যাচ্ছে। ম্যাগনাস্ কোম্পানীর ম্যাক্‌ফারসন সাহেবও ওর সাথেই এইসে গেছে। আজ ওরা কোলকাতা আসছে

সুরেশ্বর—[একটু হেসে] জানি সব। শৈলেন আমার সঙ্গে এয়ারোড্রোম থেকে ফোনে কথা বলেছে।

ঝানুমল—তাজ্জব লাগছে বাবুজী। ভেলকী দেখায়ে দিয়েছেন আপনি। দাওয়াতে শ'ও পার্শেন্ট নাফা হবেই। আর আমাদের মিলছে তো monopoly, সুগারের export quota মিলছে, কাপড়ারও মিলছে, আর দাওয়া ত' স্রেফ্ হামারাই তৈয়ারী করবো, আউর export ভি করবো। তামাম এশিয়া, ইয়ে পুব দুনিয়ার হামরাই হবো মার্ক ফাইজার।

[এগিয়ে গিয়ে ম্যাপের সামনে দাঁড়িয়ে।]

ইয়ে হামারা কলকাত্তা, পচ্ছিমে কাইরো, বাগদাদ, দামাস্কাস্ ; ইয়ে পুবে রেঙ্গুন, ব্যাঙ্কক, জাকার্তা, ম্যানিলা,—হিয়া কলম্বো, ইধার নেপাল, ভূটান—ই সব হামাদের এলাকা। বাবুজী, আপনি ত' বনে

যাচ্ছেন এশিয়াকা নয়া বাদ্‌শা—সম্রাট! এবার আমার হিস্যাটা বাবুজী।

সুরেশ্বর—থামো ঝানুমল। ইংরেজীতে একটা কথা আছে জানত?" Don't count your chickens." তুমি Reception room-এ গিয়ে বসো। সূর্যনারায়ণ, রিচার্ডসন্‌কে সোজা এই ঘরে নিয়ে আসবে। আর এসব কথা একেবারে আলোচনা নয়, বুঝলে ত'—এমন কি স্ত্রী পুত্রের সঙ্গেও নয়।

ঝানুমল—সে হামাকে বলতে হবে না বাবুজী। তিন পুরুষ ব্যবসা করতেছে। বিশোয়াস্—নিজেকে ভি করি না।

[প্রস্থান]

[সুরেশ্বর ম্যাপের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন]

সুরেশ্বর—[নিজের মনে] কাইরো, বাগদাদ, দামাস্কাস, রেঙ্গুন, জাকার্তা, ম্যানিলা—সম্রাট, এশিয়ার সম্রাট।

[স্টেজের দিকে ফিরলেন]

...ঝানুমলের ছেলেমানুষী যায়নি। [একটু হাসলেন]

[লনে]

[লনে লোক বেশী হয়েছে। সুখময় আর গেটের সামনে নেই। সামনে গোলমাল বেড়েছে। আউর কম্বল নেই হ্যায়। ব্যাস সব খতম। বলে দারোয়ান চেচাচ্ছে। ভিক্ষার্থীর দল যেতে চাইছে না। অবশেষে দারোয়ানের বিক্রমের কাছে ভিক্ষার্থীদের আবেদন নিবেদন নিষ্ফল হল। কোলাহল ক্রমশ মিলিয়ে গেল। নিমন্ত্রিতেরা পানীয় বা খাদ্য হাতে এদিকে ওদিকে দাঁড়িয়ে জটলা করছেন। দু'কোণে দুটো টেবিলে খাদ্য সম্ভার পানীয়ের স্তূপ।

(ঘরে)

(সুরেশ্বরবাবু সুখময়ের সঙ্গে কথা বলছেন)

সুরেশ্বর—হ্যাঁ, শেষটা এইভাবেই কর। জেনকিন্সকে একটা কপি পাঠাবে। জাকার্তার ফাইলটা কালকের মিটিং-এ চাই। এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোলারের কেসটা কে দেখছেন?

সুখময়—মণিরামবাবু।

সুরেশ্বর—ঠিক আছে। শুধু এটর্নির ওপর যেন নির্ভর না করে। কন্ট্রোলারের সঙ্গে সেদিন একটি পার্টিতে আমার দেখা হয়েছিল। সে কথা যেন তার P. A.কে মনে করিয়ে দেয়। হ্যাঁ ভাল কথা, ডেপুটি কন্ট্রোলারের মেয়ের জন্মদিনের presentationটা পাঠান হয়েছে তো?

(সুখময় সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লো)

সুরেশ্বর—কত দাম পড়ছে?

সুখময়—বার হাজারের মত।

সুরেশ্বর—বিলটা যেন আমার personal account-এ debit করে।

(টেলিফোন বেজে উঠল। সুখময় রিসিভার তুলে এগিয়ে এসে সুরেশ্বরবাবুর সামনে টিপয়ের উপর রাখলো। সুরেশ্বর রিসিভার তুলে নিল।)

সুরেশ্বর—কে ডাক্তার?...ব্যাথাটা কম।...তুমি আসছো? ...X Ray reportটা নিয়ে?...এইতে মুস্কিল করলে... এখন কটা? (ঘড়িটা দেখলেন) তিনটে তেরো।...ছাখ, ৪টেয় আমার এখানে একটা জরুরী মিটিং আছে... তুমি তার আগেই আসছো! (রিসিভার রেখে দিলেন)

সুখময়—(ফাইলের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে) ইন্দোনেশিয়ার export-এর সব লাইসেন্সটা আমরা পেয়েছি। বিহারের নতুন সুগার মিল দু'টোর permit এসে গেছে। মাদ্রাজের রেয়ন ফ্যাক্টরীটা আমাদের terms-এ রাজী হয়ে গেছে।

সুরেশ্বর—নিখিলেশ কোন খবর দেয় নি না? আজকে যে মিটিং সে জেনেছে নিশ্চয়ই।..... (একটু চিন্তিত হয়ে) আমার confidential fileটা কি তার কাছে? তুমিই বা জানবে কি করে?

[প্রফেসর সান্যাল ও ডাঃ হীরক দের প্রবেশ। প্রঃ সান্যাল মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক, দেশে বিদেশে বিখ্যাত। প্রায় সুরেশ্বরের সমবয়সী। আলুথালু বেশবাস, পরণে ধুতি পাঞ্জাবী, মুখে চুরুট। হীরক দে ২৮।২৯ বছরের যুবক। পরণে নিখুঁত বিলিতি স্যুট, চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। ইনিও মনোবিজ্ঞানে ডক্টরেট হয়ে হয়ে সম্প্রতি ফিরেছেন। প্রঃ সান্যালের শিষ্য।]

সুরেশ্বর—আসুন প্রফেসর সান্যাল। আসুন মিষ্টার—

শিবশঙ্কর—Rarher Dr. হীরক দে। আমারই ছাত্র। এডিনবরার ডক্টরেট নিয়ে এসেছে। এর কথাই আপনাকে বলছিলাম—।

[সুখময় দুটো চেয়ার এগিয়ে দিলে প্রফেসর ও ডক্টর দে বসলেন। [সুখময়ের প্রস্থান]

সুরেশ্বর—ব্যক্তি চৈতন্যের বিভিন্নতা নিয়ে ইনি কাজ করছিলেন না।

শিবশঙ্কর—[চুরুট ধরাতে ধরাতে] আপনার ঠিক মনে আছে দেখছি সুরেশ্বরবাবু। ঐ বিষয়েই ত' ওর ডক্টরেটের থিসিস। এবারকার আন্তর্জাতিক মনস্তত্ত্ব সম্মেলনে ওর পেপার নিয়ে দারুণ হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। Harvard থেকে ওকে fellowship offer করেছে। এদিকে কেম্‌ব্রিজ থেকেও ডক্টর ওয়াট মস্তিষ্কের বিদ্যুৎ তরঙ্গ নিয়ে কাজ করবার জন্যে ওকে ডেকেছেন। আমাদের দেশে ঠিকমত scope পাবেনা বলে ওর ধারণা।

সুরেশ্বর—আপনারাও ত' মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব নিয়ে অনেক কাজ করছেন।

শিবশঙ্কর—কিন্তু আমাদের এখানে মস্তিষ্কের বিদ্যুৎ তরঙ্গ যাকে বলে Electro-encephalography নিয়ে original কাজ বোধহয় কেউ করেনি। আদিবাসীদের মস্তিষ্কের বিদ্যুৎ তরঙ্গের বিশেষত্ব দিয়েও প্রমাণ করতে চায় তাদের inferiorityটা innate। পরিবেশের চাপে তাদের বিশেষ কিছু পরিবর্তন সম্ভব নয়। এরজন্য প্রয়োজন হচ্ছে অতি আধুনিক যন্ত্র। অনেক দাম সুরেশ্বরবাবু।

সুরেশ্বর—আপনারা একটা estimate করেছেন ত। শুরুতে কত লাগতে পারে ?

শিবশঙ্কর—তা প্রায় লাখ দশেক।

সুরেশ্বর—আমাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র লীগের দু'চার জন মেম্বারকে আজ এখানে চায়ের নেমন্তন্ন করেছি। ডক্টর-দে'র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো, দেখি এখানে যদি কিছু করা যায়। এর মত মেধাবী ছাত্ররা যদি দেশে ঠাঁই না পায় আমাদের পক্ষে বিশেষ লজ্জার কথা। আপাততঃ টাকাটা লীগকে আমি advance করবো মনে করেছি।

(ডাঃ সোমেশ সেনের প্রবেশ। বয়স ৬০-এর ওপরে। সুরেশ্বরবাবুর অনেক দিনের বন্ধু ও হিতৈষী, আবার তার চিকিৎসকও। মানুষকে ভালবাসেন, তাদের দোষের চেয়ে গুণগুলোই তাঁর চোখে বেশী পড়ে। একটু আস্তে আস্তে চলেন ও কথা বলেন।)

সুরেশ্বর—এই যে ডাক্তার এসে গেছে। তোমাকে না দেখা পর্যন্ত বেশ ছিলাম। দেখেই যেন ব্যথাটা জেগে উঠলো।

ডাঃ সেন—[চেয়ারে বসে খানিকটা দম নিলেন] সব ব্যাপার অত তুচ্ছ কোরো না সুরেশ। তোমার অতিব্যস্ততা আর লঘুচিত্ততা মোটেই ভাল নয়। আর কিছু না মানো, বয়সটা মানবে তো। [প্রঃ সান্যালকে] কিছু মনে করবেন না, প্রফেসর সান্যাল, আমি পাঁচ মিনিটের বেশী নেব না। একটা রুটীন একজামিনেশন।

শিবশঙ্কর—আরে না না, এতে আবার মনে করবার কি আছে ?

[শিবশংকর, হীরক লনে বেরিয়ে গেলেন]

(এবার লনের ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠলো। লনের একপাশে হীরক, শিবশঙ্কর, অন্যপাশে ঝানুমল, স্যার সূর্যনারায়ণ ও অন্যান্য অতিথি)

হীরক—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, স্যার, মনস্তত্ত্বের গবেষণায় সুরেশ্বরবাবুর আগ্রহের কারণ কি ?

শিবশংকর—সুরেশ্বরবাবুকে সাধারণ বেনিয়া ভাবলে ভুল করবে। শুধু সমাজবিদ্যা, মনোবিদ্যায় নয়, জীব-বিজ্ঞানেও ওঁর কিশেষ আগ্রহ। পাশের ঘরেই ওঁর বিরাট লাইব্রেরী।

হীরক—ভারী আশ্চর্য তো !

শিবশংকর—হ্যাঁ, আরো আশ্চর্য ওঁর উত্থান। যাকে বলে meteoric rise,—রহস্য আর রোমাঞ্চে ভরা। সামান্য অবস্থা থেকে উনি আজ এতবড় হয়েছেন। বড় যে হবার, সে হবেই। কোন প্রতিকূল পরিবেশ তাকে আটকাতে পারে না।

[সুখময়ের গলা শোনা গেল]

"এবার সুরেশ্বরের স্ট্রাষ্ট ফাণ্ড থেকে বিজ্ঞানে ছয়টি, সাহিত্যে চারটি বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিটি বৃত্তির পরিমাণ বছরে ৬০০০৲। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও গণ-তন্ত্রের বিশেষ মনোবিজ্ঞান সম্মত গবেষণার জন্য প্রফেসর শিবশঙ্কর সান্যালের অধীনে আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত একটি গবেষণাগার স্থাপনের জন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য লীগকে এককালীন দশ লাখ টাকা দেওয়া হবে। বৃত্তি প্রাপ্তদের

নাম শীঘ্রই ঘোষিত হবে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ পূর্ববৎ থাকবে।"

শিবশংকর—তবু দেশের অজ্ঞ লোকেরা বলবে—ক্যাপিট্যালিস্টরা দেশের শত্রু! তারা মুনাফা করে নিজের জন্যে। একচ্ছত্র পুঁজিবাদের যুগে আর এ কথা বলা চলে না।

হীরক—একচ্ছত্র পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সব দেশেই এখন আন্দোলন চলছে স্যার!

শিবশংকর—সাধারণ মানুষ রিপুর তাড়নায় চলে। হিংসা, বুঝলে হিংসা—।

হীরক—হিংসা!

শিবশংকর—ছোট ছোট কারবারগুলো মূলধনের অভাবে, অব্যবস্থার ফলে উঠে যাচ্ছে—আর তারা ভাবছে দায়ী বুঝি সুরেশ্বররা। সনাতন নিয়ম—Struggle for existence and Survival of the fittest, বুঝলে এ নিয়মের নড়চড় নেই।

হীরক—ওঁর গ্রুপের কারখানাগুলোতে গোলমাল নাকি লেগেই আছে।

শিবশংকর—ছত্রিশটা কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্সী ওঁর হাতে। একটা না একটা গোলমাল লেগে থাকা বিচিত্র কি। আর এখন labour unrest তো chronic ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোথায় গোলমাল নেই শুনি? ক্রমাগত আস্কারা দিয়ে চলেছে সরকার—arbitration তার tribunal, তোমার মেহনতী মানুষ তো মাথায় চড়ে বসবেই।

(শিবশঙ্করের সামনে কিছু পানীয় এনে দিল বেয়ারা।)

(ঘর—ডাঃ সেনের পরীক্ষা শেষ হয়েছে। মুখ গম্ভীর।)

ডাঃ সেন—জীবনের সব খেলাতেই ফার্স্ট না হয় নাই হলে সুরেশ। দৌড়ের বেগ কমাও, আয়ু বাড়বে।

সুরেশ—আমি না হয় একদিনে তোমার একবছরের বাঁচা বেঁচে নিলাম—ক্ষতি কি? এখন ওসব কথা থাক। (গলার স্বর নামিয়ে) নিখিলেশের ওখানে আজই যাবে, আর খবরটা আমাকে আজই জানাবে।

ডাঃ সেন—যেতে বলছো যাবো। কিন্তু ফল কিছু হবে না।

—ফল কিছু হবে না—

(ডাঃ সেনের ধীরে ধীরে প্রস্থান)

(আবার লন)

(শিবশংকরের পান শেষ)

শিবশংকর—আর এই নিয়েই ত আমাদের গবেষণা। সমাজের সর্বস্তরে এই যে বিশৃঙ্খলা, এর মূল রহস্যের হদিস দিতে পারে কেবল মনোবিজ্ঞান। ওঁদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য লীগের আমি উপদেষ্টা, আর উনিও আমাদের নির্জ্ঞান মনসঙ্ঘের একজন পেট্রন। "অবচেতন" কাগজের সব খরচাটাই তো ওঁর। ওঁর সাহায্য না পেলে আমার বইখানাও এত তাড়াতাড়ি বেরুতো না। পড়েছ তো, "Oedipus Complex of the Labour Leaders in India"? বিদেশে কি রকম জোরালো সমালোচনা হয়েছে—দেখেছ তো?

(স্যার সূর্যনারায়ণ চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট। বয়স ৬২। কানে কম শোনেন কাজেই চেঁচিয়ে কথা বলেন। তিনি ষ্টেজের ওধার থেকে এধারে এগিয়ে এলেন)

হীরক—না, স্যার, এখনও সুযোগ হয়নি।

শিবশংকর—পড়ে নিও। ধর্মঘটের কারণ অর্থনৈতিক নয়,—মানসিক। অবচেতন মনের পিতৃবিদ্বেষ। এ আমি তথ্য প্রমাণ দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি।

সূর্যনারায়ণ—কিন্তু জনসাধারণ ও আমাদের দেশের সরকার আপনার এই তত্ত্বকে মেনে নেবে কি?

শিবশংকর—(উত্তেজিত)—জনসাধারণকে যা বোঝাবেন তাই বুঝবে। আর সরকারী পণ্ডিতদের কথা? তাঁরা তো চলেছেন সমাজতন্ত্রের দিকে। ব্যক্তিত্বকে ছেঁটে কেটে সিংহ আর মেষকে এক জোয়ালে জুড়ে আবাদ করতে চান। মনোবিজ্ঞানের অ আ ক খ এঁরা জানেন না।

(সূর্যনারায়ণ ধীরে ধীরে স্টেজের অন্য পাশের দলে গিয়ে ভিড়লেন)

হীরক—আজকাল স্যার সমস্ত পণ্ডিতরাই তো বলতে সুরু করেছেন—সমাজতন্ত্র মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের

জন্যে। আর বিজ্ঞান তো মানুষের মঙ্গলই করে।

শিবশংকর—সমাজতন্ত্র কিসের জন্য জানি না। তবে তার বুলি হলো ভোট সংগ্রহের জন্যে। কিন্তু মনে রেখো—বিজ্ঞান শুধু বিজ্ঞানের জন্য। ফ্রয়েড বলেছেন—যৌন অনুসন্ধিৎসা থেকে বিজ্ঞানের জন্ম। কল্যাণ অকল্যাণ নিয়ে মাথা ঘামাক ভোটের কাঙাল এবং দালালরা। আমাদের বৈজ্ঞানিকদের কাজ রহস্যের সমাধান আর নতুন রহস্যের সৃষ্টি। আমরা বৈজ্ঞানিকরা সাধারণ মানুষের সমগোত্র নই—সমমূল্য তো নই ই। ভোটের বাজারে আমার দর আর হরিপদ কেরানীর দর সমান, শুধু এই জন্যে তিন তিনটে সাধারণ নির্বাচনে আমি একবারও ভোট দিই নি।

(আবার ঘরের দৃশ্য। সুরেশ্বর-ঝানুমল রিচার্ডসন ও সূর্যনারায়ণ)

সুরেশ্বর—কিন্তু রিচার্ডসন, তোমাদের দাবীগুলো কমানো দরকার।

ঝানুমল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সমঝানো দরকার। সদানন্দ বাবুর কাগজ লিখ্‌ছে আপনারা এক পাউণ্ডে বিশ পাউণ্ড খিচ্‌তেছেন।

সূর্যনারায়ণ—আপনারা ভুল শুনেছেন ঝানুমলজী।

ঝানুমল—মালুম হইতেছে ঠিকই শুনছি হামি।

সূর্যনারায়ণ—আপনি ভুল শুনেছেন। ওরা লিখেছে ডলারের কথা, পাউণ্ডের কথা নয়।

রিচার্ডসন—(বিদেশী ব্যাঙ্কের এজেন্ট। বয়স ৪৮। বাংলা বোঝেন তবে বলতে পারেন না) Thank you, thank you cordially Sir Surya, our rate of interest may be high but our purpose is honest.

সুরেশ্বর—কিন্তু অন্য দেশের offer-এর সঙ্গে লোকে তো তুলনা করতে পারে ?

ঝানুমল :—আরে এ তো পাবলিক সেকটর নেই আছে। দুটো দলিল বানালেই চলবে। একটা পাবলিক জানবে—আউর একটা স্রেফ্ হামরা জানব।

সূর্যনারায়ণ—দেশের লোকের বোঝা উচিত, British aid, মানে British equity, British justice ! অন্য কোন দেশের থেকে aid নিলে আমাদের ঐতিহ্য নষ্ট হবে।

রিচার্ডসন—But one thing. Our investors are really afraid of your Government's nationalisation policy (বেয়ারা এসে একটা *tray*তে কয়েক গ্লাস পানীয় রেখে গেল)

সুরেশ্বর—আমাদের সরকারকে আপনারা ভুল বুঝেছেন মনে হয়।

রিচার্ডসন—(একটা গ্লাস তুলে নিয়ে) To happy long life of our friend Mr. Chowdhury.

সূর্যনারায়ণ—(আর একটা গ্লাস তুলে নিয়ে) সুরেশ্বরবাবুর ষষ্ঠিতম জন্মদিবসে তাঁর স্বাস্থ্য পান করছি।

ঝানুমল—(সুরেশ্বরবাবুকে একটা ৬০ গিনির গোলাপ ফুলের তোড়া দিলেন) বাবুজী ! গোলাপকা মাফিক আপনার দিলকা খুসবু নিকালতে রহুক।

সুরেশ্বর—আপনাদের শুভেচ্ছা ও ভালবাসার জন্যে সত্যি আমি কৃতজ্ঞ। অনেক ধন্যবাদ। চলুন বাইরে যাওয়া যাক—প্রফেসর সান্যাল আমাদের জন্য লনে অপেক্ষা করছেন। (ঘর থেকে লনে প্রস্থান)

(লন)

সুরেশ্বর—একেবারে কাজের কথায় আসা যাক। আপনাদে সঙ্গে ডক্টর হীরক দে'র পরিচয় করিয়ে দেবার সৌভাগ্যে আমি গর্বিত।

(সকলের সঙ্গে করমর্দন করল হীরক)

আমাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য লীগের উপদেষ্টা প্রফেসর সান্যালের উপযুক্ত শিষ্য এই তরুণ বৈজ্ঞানিক। আমার মনে হয় এঁর গবেষণা আমাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য লীগের বিশেষ কাজে লাগবে। আপনাদের কাছে এঁর গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় টাকাটা তোলবার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

সূর্যনারায়ণ—আমাদের উদ্দেশ্যটা একটু পরিষ্কার হওয়া দরকার।

রিচার্ডসন :—Exactly so.

সুরেশ্বর—হ্যাঁ, উদ্দেশ্যটা নিশ্চয়ই পরিষ্কার হওয়া দরকার। আমরা অর্থাৎ এই লীগের সভ্যরা বিশ্বাস করি, বৃত্তিগ্রহণে মানুষের অবাধ স্বাধীনতা থাকা দরকার। আমরা মনে করি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ওপরে এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার ওপরে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। সমাজতন্ত্রের নাম করে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে ও ব্যক্তিত্ব বিকাশকে আজ অবরোধ করা হচ্ছে। শিল্পের অবাধ জাতীয়করণ আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। দেশের দুর্দশা দূর করতে হ'লে শিল্পোন্নয়ন দরকার নিঃসন্দেহে। কিন্তু সরকার বেছে নিয়েছেন ভুল পথ। কারা পারে মূলধন জোগাতে, ঝুঁকি নিতে, জনসাধারণ ?

সকলে—[হীরক ও শিবশংকর বাদে] নিশ্চয়ই না।

সুরেশ্বর—পারে শুধু তারা, যাদের আছে এ বিষয়ে জন্মদত্ত ক্ষমতা আর আজন্ম সাধনা। যাদের আছে ক্লেশ স্বীকারের আর স্বার্থত্যাগের অভ্যাস। যাদের শক্তি ও বুদ্ধি যাচাই হয়ে গেছে সাফল্যের কষ্টিপাথরে। ঠিক কিনা বলুন ?

সকলে—(হীরক বাদে) নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।

ঝানুমল—আরে বকরী দিয়ে বয়েলের কাম কভি হোবে না, সে বকরী পাটনাই হোক কি মূলতানীই হোক্।

সূর্যনারায়ণ—আমাদের কাছে ব্যাপারটা তো বেশ স্পষ্ট, কিন্তু লোকে কি মানতে চাইবে এসব কথা ? তারা বলবে সুযোগ সুবিধা পেলে আমরাও বড় হতে পারি।

ঝানুমল—খোদার উপর খোদকারী ; দেনেওয়ালা খোদা আর রোখনেওয়ালা নসিব্। লগ্নে যার শনি, যত সুবিস্তাই তাকে দিন না, তার কিছুই নাফা হবে না। শ্রীবৎস রাজার কেচ্ছা কে না জানে ? ভাজা মছ্‌লি জিন্দা হয়ে জলে চলে গেলো আর পেটের ভুখ পেটেই থেকে গেল।

সুরেশ্বর—(একটু হেসে) ও সব পুরণো কথা এখন চলবে না। এ যুগে চাই বিজ্ঞানের দোহাই। পোপের ফরম্যান আর ভৃগুসংহিতার দিন আর নেই। এটম বোমার যুগে ঢাল তলোয়ার অচল। চাই নতুন হাতিয়ার। প্রফেসর সান্যাল আমাদের অনেক জুগিয়েছেন। উনিই বুঝিয়ে দেবেন ডক্টর দে'র গবেষণা আমাদের কোন্ কাজে লাগতে পারে।

রিচার্ডসন—Yes, let the Professor speak.

সূর্যনারায়ণ—বলুন তা'হলে প্রফেসর।

শিবশঙ্কর—(চুরুট ধরাতে ধরাতে উঠে দাঁড়ালেন) মনে রাখবেন একটা কথা,—আপনাদের কাজে লাগবার জন্য বিজ্ঞান নয়। বিজ্ঞান শুধু বিজ্ঞানের জন্য। অণু পরমাণু সম্বন্ধে বিজ্ঞানীর অনুসন্ধিৎসা থেকে পরমাণু শক্তির আবিষ্কার—সে শক্তি দিয়ে আপনি বোমা তৈরী করবেন কি ধানকল চালাবেন,—আপনারা জানেন। বৈজ্ঞানিকের কোন দায়িত্ব নেই।

রিচার্ডসন—Exactly so, he lives in the ivory tower.

শিবশংকর—কয়েকজন ব্যক্তিসিংহ আর অগণিত মেষশিশু এই নিয়েই সমাজ। আনুগত্য আর ভীরুতা মেষের স্বভাবধর্ম। পিতৃবিদ্বেষের আদিম প্রবৃত্তিও অবশ্য রয়েছে এদের রক্তে।

সুরেশ্বর—পিতৃবিদ্বেষের তাৎপর্যটা এঁদের একটু বুঝিয়ে দিন।

ঝানুমল—হাঁ হাঁ, সমঝাইয়ে দিন।

শিবশংকর—তাহ'লে একেবারে গোড়ার কথায় যেতে হয়। পিতৃবিদ্বেষের সুরু বর্বর যুগেরও আদিপর্বে। ফ্রয়েড বলেছেন, আদিম কৌম সমাজে সর্বে সর্বা ছিল পিতা, শক্তিমান পুরুষসিংহ। ছেলেদের বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হ'ত গোষ্ঠীর বাইরে। উদ্দেশ্য গোষ্ঠীর সমস্ত মেয়েদের ওপর পিতার ভোগস্বত্ব কায়েমী করা। ছেলেরা গিয়ে মিলিত হ'ত অন্য গোষ্ঠীর মেয়েদের সঙ্গে। কিন্তু তাদের অবচেতনায় ধূমায়িত হ'তে থাকতো পিতৃবিদ্বেষের আগুন। মাঝে

মাঝে তারা ফিরে আসতো দল বেঁধে, পিতাকে হত্যা করে গোষ্ঠীর মেয়েদের দখল করে নিত।

(এই সময়ে সুখময় এসে সুরেশ্বরের কানে কি যেন বললেন—সুরেশ্বর প্রস্থান করলেন।)

ঘর

শৈলেন সমাদ্দার বসে আছেন চেয়ারে। শৈলেন সুরেশ বাবুর লিয়াজো অফিসার। বয়স ৩৫। কেতাদুরস্ত ও স্মার্ট)

(সুরেশবাবু ঘরে ঢুকলেন—শৈলেন সমাদ্দার সুরেশবাবুকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন।)

শৈলেন—Good evening Sir,

সুরেশ—এই যে বস, শৈলেন। খবর কি ?

শৈলেন—খবর আপনার আশীর্বাদে ভালই বলতে হবে। Samson & Samsonএর পুরো lotটাই আমরা পেয়ে গেছি। প্রেস্টনজী trunk-এ London অফিসের সঙ্গে কথা বলেছেন। তিন পেন্স করে বেশী লাগল, তা লাগুক। মিসেস বার্টরামকে অগ্রিম পর্যন্ত দেওয়া হয়ে গেছে। এখন রিচার্ডসন overdraftটা arrange কল্লেই হয়।

সুরেশ্বর—সে কথা পাকাপাকিই হয়ে গেছে। যাক ওদিকের খবর ভালই। তবে আমি বেশী ব্যস্ত ম্যাগনাস্ কেমিক্যালের খবরের জন্য।

শৈলেন—এই যে Sir, কোডে খবর এসেছে (পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে) শুধু ম্যাগনাস্ কেমিক্যালের সঙ্গে বন্দোবস্ত নয়, আরও দামী খবর আছে। প্রাইভেট Sectorএর জন্য যতটা ঋণ মঞ্জুর হয়েছে তার একটা মোটা অংশ আমরা পাচ্ছি।

সুরেশ্বর—(ব্যস্তভাবে কাগজখানি নিয়ে) দেখি !

(চোখে মুখে জয়ের উল্লাস)

শৈলেন—আপনি ঠিকই আঁচ করেছিলেন। Samson & Samson অনেকগুলো টাকা পাচ্ছে সরকারী অর্ডার সরবরাহের জন্য। ওর উৎপাদন দেড়গুণ হয়ে যাচ্ছে। যাক্ ওটা তো আমাদের গ্রুপেই এসে গেল। প্রেস্টনজী ত' এবার আপনার প্রশংসায় একেবারে শতমুখ।

সুরেশ্বর—(নির্বিকারভাবে) কেন কি বলছেন ?

শৈলেন—আপনার দূরদর্শিতা আর সূক্ষ্মবুদ্ধির তারিফ করলেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য লীগের জন্য আপনি যখন প্রথম খরচ করতে সুরু করেন তখন উনিও অনেকের মত মনে করেছিলেন এটা বুঝি বড়লোকদের একটা খেয়াল। এখন ঐ লীগই আমাদের সম্মান বাড়িয়েছে সব দিক থেকে। বিশেষ করে ওর মনস্তত্ত্ব বিভাগের লেখাগুলো। ডালপুরিরা কোম্পানীর expert commission তিনমাসে Bonn, Washington এ কাটিয়ে যা করতে পারেনি, আপনি এখানে বসে ঐ লীগের কলকাঠি নেড়ে তাই করেছেন। স্যার, সত্যিই আপনার প্রতিভা বহুমুখী। প্রেস্টনজী কিছু বাড়িয়ে বলেন নি। যে সাম্রাজ্যের ভিৎ পত্তন আপনি করেছেন, সে একদিন ফোর্ড রকফেলারের সাম্রাজ্যকে ছাড়িয়ে যাবে, এ কথা আমি জোর করে বলতে পারি।

সুরেশ্বর—(মৃদু হেসে) একটু বাড়াবাড়ি করছ শৈলেন। চাই আরও কূটকৌশল, আরও মেহনত, আরও নিষ্ঠুর লড়াই। (একটু চিন্তিত ভাবে) যাক্ প্রচার সচিবের খবর কি, বলো ?

শৈলেন—He is a hopeless chap ! অনেক করে বোঝালাম Sir, কিছুতেই রাজী হোলো না। যাই হোক আমি ফোনে খবর নিচ্ছি।

সুরেশ্বর—হ্যাঁ, তুমি ছাখ, আমি বাইরে থেকে আসছি।

(সুরেশ্বরের প্রস্থান)

লনের দৃশ্য

সূর্য—কিন্তু সব সমাজতাত্ত্বিক ফ্রয়েডের এই মত সমর্থন করেন না শুনেছি।

শিবশংকর—তারা সব ঈদিপাস কমপ্লেক্স-এ ভুগছেন আজকের সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখুন, সেই একই নাটকের অভিনয় চলেছে। আপনাদের মত পুরুষ সিংহের উপর মেষ শিশুদের আক্রোশ ঐ সহজাত

পিতৃবিদ্বেষের প্রমাণ। তাই এখনও দেখা যায় মাঝে মাঝে পিতৃবিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। একটা সুলতান, একটা জার সেই আগুনে পুড়ে যাচ্ছে। কিন্তু আবার মেষ শিশুরদল সিংহকে এনেই গদীতে বসাচ্ছে। নাম হয়ত তখন জার থাকছে না, সুলতান থাকছে না, হচ্ছে ফুরার কি দু'সে কিংবা অন্য কিছু। এ নিয়মের ব্যতিক্রম নেই।

সূর্যনারায়ণ: বড় ছোটর তফাৎ চিরকালই ছিল আর চিরকালই থাকবে—এই আপনি বলতে চাইছেন?

শিবশংকর—শুধু এই নয় আরও বলতে চাইছি যে, মনস্তত্ত্বের জ্ঞানকে ঠিক মত প্রয়োগ করতে পারলে এই পিতৃবিদ্রোহকে ঠেকিয়ে রাখা যায়।

ঝানুমল—থোড়া সহজ কোরে বোলেন মোশায়।

(সুরেশ্বরের প্রবেশ)

শিবশংকর—ফ্রয়েড বলেছেন Repression মানে, অবদমন থেকে যত বিভ্রাটের সৃষ্টি। দেখতে হবে শিশু বয়স থেকে যেন বাসনাকে পুরোপরি তারা অবদমন করতে বাধ্য না হয়। মেষশিশুদের প্রতি সব সময় কঠোর হবেন না। তাদের এটা ওটা আবদার মাঝে মাঝে পূরণ করতে হবে।

সুরেশ্বর—যাকে বলে yielding to minor concessions। গেল বারে চিনি কলের ধর্মঘটে আমি যেমন প্রথম ধাক্কাতেই আলোচনা মাধ্যমে একটা রফায় আসতে রাজী হলাম। অন্যান্য মালিকেরা ধর্মঘটীদের ওপর গোড়া থেকেই রিপ্রেশান চালালেন। ফল কি হলো আপনারা জানেন।

ঝানুমল—সাতলাখ মুনাফা বেশী হলো আমাদের। ওরা যদি চলে ডালে ডালে, আপনি চলেন পাতায় পাতায়।

রিচার্ডসন—Just the very thing we proposed in the Bank Strike, But these people over here are hopeless.

সূর্যনারায়ণ—কিন্তু concession দেওয়া, নতি স্বীকারকে তারা যদি জয় বলে ভাবে? দাবী যদি বাড়ে?

শিবশংকর—ভুলে যাচ্ছেন এই অশিক্ষিত মানুষগুলো, আর অর্ধশিক্ষিত ওদের চালকগুলো থেকে আপনাদের বুদ্ধি ও বল অনেক বেশী। এক হাতে দেবেন আর অন্য হাতে নেবেন। ওরা বুঝতেও পারবে না! তবে হ্যাঁ, মাঝে মাঝে আঘাত করতে হবে বৈকি! ওদের নির্ভরতা বাড়িয়ে দিতে হবে concession দিয়ে, আবার মাঝে মাঝে বিনা কারণে বিনা উত্তেজনায় আঘাত করে বুঝিয়ে দিতে হবে আপনারা সিংহ আর ওরা মেষ। জানিয়ে দিতে হবে যে আপনারা গরীবের মা বাপ বটে তবে দুর্বল নন। আঘাত করতেও জানেন।

শিবশংকর: ঠিক যেমন করে আমরা সন্তান পালন করি। আমার মেয়েকে আপনারা দেখেছেন বোধ হয়? একেবারে মনোবিজ্ঞানসম্মত শিশুপালনের জীবন্ত আদর্শ। ওর জন্য আমি রীতিমত গর্বিত।

সুরেশ্বর: ডাঃ দের গবেষণার ব্যাপারটা?

শিবশংকর: (তাড়াতাড়ি চুরুট মুখের থেকে নামিয়ে) মাফ করবেন। মেয়ের কথা বলতে গেলে আমি একটু অভিভূত হয়ে পড়ি। (অন্য সকলের দিকে ফিরে) অবশ্য সুরেশ্বর বাবুর ছেলে কি মেয়ে থাকলে সেও একটা আদর্শ সন্তানে দাঁড়াত। পিতৃদত্ত প্রতিভার অধিকারী হয়েই সে জন্মাতো।

(সুরেশ্বর "প্রফেসর" বলে চেচিয়ে উঠে বেরিয়ে গেলেন। সকলে থমকে পড়লেন)

ঝানুমল: আপনি বলেন কি বলতেছিলেন।

শিবশঙ্কর: যাক সে তত্ত্ব। এখন আমাদের হীরকের কথায় আসা যাক। মস্তিষ্কের বিদ্যুত তরঙ্গের সাহায্য দিয়ে সে প্রমাণ করতে চায় আদিবাসীদের এমন কতকগুলো দৈন্য আছে যা শিক্ষা দীক্ষা পরিবেশে দূর হবার নয়। যেমন নিগ্রোদের ব্রেনে বানরের ব্রেনের মত দুটো শুড় আছে—প্রমাণ করেছেন লেভি।

হীরক: (উঠে দাঁড়িয়ে ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে) Sir, ঠিক ও ভাবে নয়।

শিবশংকর—আঃ [আলো নিভে গেল]

[ঘরের আলো জ্বলে উঠলো। সুরেশ্বর মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে টেবিল ধরে]

ঘরের দৃশ্য

সুরেশ্বর — কি বলছে ও ?

শৈলেন—কি আর বলবে, সেই মান্ধাতা আমলের বড় বড় কথা। ওর বয়সে যে কথা সবাই বলে। প্রফেসার সান্যালের লেখাগুলোর নাকি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই, উদ্দেশ্যমূলক প্রপাগাণ্ডা। আমরা যেন প্রচার সচিব আর সম্পাদকের জন্য যোগ্যতর লোক খুঁজে নিই—স্পষ্ট জানিয়ে দিল সে।

সুরেশ্বর—হুঁ, ফাইলটার কথা কিছু বলেনি তো ?

শৈলেন—না স্যার, আপনার নির্দেশ কি আমি অমান্য করতে পারি। তবে ভাবসাব দেখে মনে হ'ল ওর তূণে সত্যিই কোন জোরালো অস্ত্র আছে। আর সময় নষ্ট না করে একটা কিছু করা দরকার।

সুরেশ্বর—ব্যস্ত হোয়ো না, করা একটা কিছু হবেই। যার হাতে ঐ ফাইলটা পড়বে উপযুক্ত মূল্যে তার কাছ থেকে কিনে নিতে হবে। এর বেশী ত কিছু নয় ?

শৈলেন—নিখিলেশকে কেনা বেশ শক্ত হবে বলে মনে হ'চ্ছে Sir, একটু অদ্ভুত ধরনের ছোকরা।

সুরেশ্বর—এবার তুমি হাসালে, শৈলেন। কেনা সবাইকেই যায়, কারুর দাম কম, কারুর দাম বেশী। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। দেশ দূতের সম্পাদককেও ত তোমরা খুব শক্ত লোক বলে ঠাউরেছিলে, একটু চড়া দামে বিকোলো, এই যা। তুমি সাম্রাজ্যের কথা বলছিলে না ? এ যুগের সাম্রাজ্য গড়ে উঠবে গুলি-বারুদের জোরে নয়, ক্রয় শক্তির জোরে। কে কি দরে বিকোবে সেটা যে ঠিক বুঝবে, সেই হবে এযুগের সেরা জেনারাল।

শৈলেন—ও সব আপনিই ভাল বোঝেন, স্যার, শত্রুর তো অভাব নেই, তাই বলছিলাম।

সুরেশ্বর—হ্যাঁ, ও ব্যাপারটা আমি নিজেই দেখছি। গুরুত্ব আমি কম দিচ্ছি মনে কোরো না। ভালো কথা, বিদেশী ব্যাঙ্কারদের মনোভাবটা কি রকম বুঝলে ? এখনো কি এখানে মূলধন খাটাতে ওদের ইতস্ততঃ ভাব আছে ?

শৈলেন—আগের মতন অতটা না থাকলেও আছে বৈকি। মনে হয় আমাদের বৈদেশিক নীতি শুধু নিরপেক্ষ হ'লে চলবে না, নিশ্চুপও হওয়া চাই। সুয়েজ, ইন্দোনেশিয়া, এ্যালজেরিয়া—এ নিয়ে মাতামাতি কি আমাদের চলে ? কাঁধে যাদের ভিক্ষার ঝুলি !

সুরেশ্বর—বড় জোর তাদের মুখে থাকবে গৌরহরি বুলি, এই না ?

সুরেশ্বর—(মুখে হালকা হাসি) কথাটা তো বুঝি, কিন্তু সরকারী নীতিকে কি আমরা পুরোপুরি প্রভাবিত করতে পারি ? তবে নীতি বদলাচ্ছে, আর বদলাবেও, এ তুমি ঠিক জেনো।

[লনের ভীড় পাতলা হয়ে এসেছে। একদিকে একদল পান ভোজনে রত ! আর একদিকে সুখময়। এমন সময়ে একজন আধুনিক কবির প্রবেশ]

সুখময়—এই যে আসুন, আসুন ! অসময়ে কবির আবির্ভাব ?

কবি—অসময় আবার কি ? আমরা কোকিলধর্মী কবি নই। শীত-বসন্তের বিচার করে চলি না। আর কথাটি কি জানেন ? সুরেশ্বর বাবুই খবর পাঠিয়েছিলেন।

সুখময়—ওহো তাই তো ! আমারই মনে ছিল না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনাদের কি প্রস্তাব পাস হলো শেষ পর্য্যন্ত ?

কবি—আমাদের এবারকার অধিবেশনে সাহিত্য ও রাজনীতি নিয়ে সবিশেষ আলোচনা করেছি।

সুখময়—হ্যাঁ হ্যাঁ, তা' কি সিদ্ধান্ত হ'ল আপনাদের ?

কবি—মানে আমরা কবি ও সাহিত্যিকেরা, অন্ততঃ আমাদের সভ্যরা সাহিত্যকে কোনদিন রাজনীতির নোংরা ময়দানে আনবো না। এই রাজনীতি আর

স্বাদেশিকতা করার জন্য রবিঠাকুরের কবিপ্রতিভা অঙ্কুরেই নষ্ট হলো। ভদ্রলোক আর develop কল্লেন না। এদিক দিয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত সর্ববাদী সম্মত যে আমরা সাহিত্য নিয়ে ব্যবসা কোর্ব না।

সুখময়—খুব চমৎকার সিদ্ধান্ত। কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য লীগকে আপনারা সাহায্য কোরবেন কি ভাবে?

কবি—[একটু ইতস্ততঃ করে] দেখুন, মানে politics কর্বো না মানে এই নয় যে, মানবতার অপমান সইব।

সুখময়—সে ত ঠিকই। হাঙ্গেরীর ব্যাপারে আপনারা চুপ করে থাকেন নি, আমরা লক্ষ্য করেছি।

কবি—মানে শুধু হাঙ্গেরী কেন? যেখানেই দেখব ব্যক্তিত্বের অপমান, শিল্পীর স্বাধীনতা ম্রিয়মান—সেখানেই আমরা হব প্রতিবাদে সোচ্চার মানে এদিক দিয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য লীগ মানে আপনারা আর আমরা, যাকে বলে—

সুখময়—একই পথের পথিক।

কবি—উঁহু, মানে কথাটা ঠিক হলো না। লক্ষ্য এক হ'লেও পথ আমাদের পৃথক। মানে আপনারা যে-ভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন, কবিতার প্রকাশভঙ্গী তা থেকে একেবারে আলাদা। কাব্যের প্রকাশভঙ্গী মার্জিত ও সংস্কৃত। মানুষের মনের গভীরতম প্রদেশের ভাবাবেগকে কতকগুলি সূক্ষ্ম প্রতীক আর সুসম শব্দঝংকারে জাগিয়ে তোলে কাব্য। কাব্য মানেই জটীলতা—obscurity.

সুখময়—আপাততঃ একটু স্পষ্ট কোরে বল্লে—মানে একটু অকাব্য করে বল্লে সুবিধে হতো। এ মাথায় আবার কবিতা ঢোকে না।

কবি—মানে কথাটা হচ্ছে এই propaganda আমাদের কাজ নয়। ধূলিমলিন পৃথিবীর অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত কাব্যলোক।

সুখময়—দেখুন, বড় জটীল হয়ে যাচ্ছে।

কবি—আহা, শুনুন না ভাল করে। আমরা বৈজ্ঞানিক অনিশ্চয়তাবাদে, মানে হাইসেনবার্গের নাম শুনেছেন তো,—বিশ্বাসী। না না সেই তদ্বৎ জীবনম্ অতিশয় চপলম্ সেই পুরোনো কথা নয়। বস্তু কণার বেগ ও অবস্থান যেমন এক বিশেষ মূহুর্তে সঠিক ভাবে বলা যায় না। আমরা মনে করি এই দুনিয়ায় কোনো কিছু সঠিক ভাবে বলাও যায় না, করাও যায় না। অবশ্য কথাটা খুব গভীর। পরোক্ষ ভাবে আপনাদের কাজে লাগতে পারে।

সুখময়—অনিশ্চয়তাবাদের তত্ব দিয়ে কি প্রমাণ করা যায়—পরিকল্পনা মাত্রেই অবৈজ্ঞানিক—অনিশ্চিত।

কবি—আহা, অত সোজাসুজি ভাবে—মানে directly কিছু প্রমাণ করতে যাবেন না। জানেন শুধু হাই-সেনবার্গ নয়, র‍্যাবোঁ, বোদলেয়র, হাক্সলী, কামু। অনিশ্চয়তাবাদের সঙ্গে অস্তিত্ববাদের মানে existentialism-এর মাত্রানুগ মিশ্রণ ঘটবে আমাদের কাব্যে।

সুখময়—বুঝেছি, হয়ত ঠিক বোঝাতে পারছি না। এমন তীব্র Cock-tail তৈরী কর্বেন যার একমাত্রা খেলেই গোঁড়া জড়বাদীও মায়াবাদী হয়ে উঠবে। Virginia Wolf-এর Stream of consciousness-এ ডুবে মরতে পথ পাবে না। [কবি সলজ্জ হাসি হাসলেন] কিন্তু আপনাদের এ ধরনের কবিতা কি জনসাধারণ বুঝবে? আমরা চাই জনমত সংগঠিত করতে।

কবি—মানে কি জানেন। জনসাধারণ কিছুই বোঝে না। তাদের দৌড় ঐ রবি ঠাকুর অবধি। যারা বুদ্ধির কারবারি তাদের ভাবধারাকে সংগঠিত করি আমরা, এই কবিরা। তাছাড়া জানেন বোধহয় সোজা কথার থেকে ইংগিত, ইসারা, কাব্যময় একটা পংক্তি অনেক বেশী উদ্বেল করতে পারে মানুষের অচেতন মনকে।

সুখময়—হ্যাঁ, এই কথাটা খুব দামী। খুব গভীরভাবে চিন্তা করে দেখা দরকার।

কবি—(উৎসাহিত) এ ছাড়া ধ্বংস সৃষ্টির তত্ব নিয়ে আমরা নতুন আঙ্গিকে নতুন ধরনের কাব্য নিয়ে পরীক্ষা কচ্ছি। সেইটাই হবে বোধহয় আগামী

দিনের কবিতা। আমাদের বক্তব্য, ব্যক্তিগত কামলিপ্সা আর মৃত্যু ইচ্ছার সংঘাত থেকেই মানসিক দ্বন্দ্বের উৎপত্তি। সমাজে তারই প্রতিফলন। কে জিতবে? Death না Eros, পঞ্চশর না সন্ন্যাসী, মৃত্যু না রতি—এই দ্বন্দ্ব!

সুখময়—শেষ পর্য্যন্ত কে জিতবে তাই বলুন? Peace offensive না Atom bomb?

কবি—এখানেও সেই অনিশ্চয়তাবাদ। ঠিক করে কিছুই বলব না। স্পষ্টতা এক রকমের স্থূলতা, তাতে কাব্য ধর্ম নষ্ট হয়। আমাদের কবিতায় থাকবে সুদক্ষ শিল্পীর সূক্ষ্ম কারুকার্য। অদৃশ্য মনের Divine dissatisfaction & aesthetic alienation হবে আমাদের কাব্যের মূলধর্ম আর—

সুখময়—আরে তাতেই কাজ হবে। চমৎকার কাজ হবে। হতাশা আর বিচ্ছিন্নতা বোধ না জাগলে মানুষ স্থূল চিন্তাগুলো তুচ্ছ করতে পারে না—এতেই কাজ হবে।

কবি—[সলজ্জভাবে] মানে আমাদের অর্থাৎ আপনাদের সভাপতির দরুন donation টা? আমার continental tour টা আর তো ফেলে রাখা যায় না।

সুখময়—কোন চিন্তা নেই, কাল পরশুর মধ্যে চেক পৌঁছে যাবে। আপনি visa র বন্দোবস্ত করুন গিয়ে। তবে দেখবেন দু'একজন চারণ কবি যদি পাওয়া যায়। আমাদের লীগের আসছে সম্মেলনে কিছু সমবেত কণ্ঠে কবিতা বিতরণের ইচ্ছা আছে।

কবি—সে আপনারা ভাড়াটে কবি দেখুন। যারা ঝাণ্ডা ওড়ায়, শ্লোগান দেয়, এই রকম। আমি চল্লাম। নমস্কার।

(কবির প্রস্থান)

[ঘর—সুরেশ্বর ও শৈলেন]

সুরেশ্বর—সদানন্দের অনেক লোকজন আমাদের বিভিন্ন বিভাগে ছড়িয়ে পড়েছে।

(সুখময়ের প্রবেশ)

সুখময়, সদানন্দের ভাগ্নেকে নোটিস দিয়েছ?

সুখময়—আজ্ঞে হ্যাঁ। সুগার মিলের কেমিস্ট, রেয়ন ফ্যাক্টরীর এ্যাকাউন্ট্যান্ট এঁদের সবাইকে নোটিস দেবার অর্ডার দিয়েছি।

সুরেশ্বর—মাইকা মাইনে পাল্টা ইউনিয়ন গড়ার কতদূর?

সুখময়—অনেকটা এগিয়েছে। তবে বান্দা সিং একটু গোলমাল করছে।

শৈলেন—এরা সবাই কি সদানন্দের পার্টির লোক?

সুরেশ্বর—তা ঠিক নয়, তবে সদানন্দের ভক্ত। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য লীগকে টেঁকাতে হলে সদানন্দকে হাত করা দরকার, ছেলে ছোকরাদের ওপর ওর দারুণ প্রভাব।

(টেলিফোন বেজে উঠলো)

সুখময়—[ফোন ধরে কথা বলতে লাগল] হ্যাঁ তাই নাকি? আচ্ছা আমি বল্‌ছি ... ... নানা সে জন্য আটকাবে না।

সুরেশ্বর—কে ফোন করছে?

সুখময়—দেশদূতের সম্পাদক। আমাদের আক্রমণ করে আবার একটা Sensational লেখা নাকি তাদের হাতে এসেছে। Drug Industry যাতে Public Sector-এ না যায় আমরা না কি তার জন্য ষড়যন্ত্র করছি। আরো অনেক কথা—আমরা নাকি anti-national—বিদেশী ধনকুবেরদের agent.

সুরেশ্বর—[অনুত্তেজিত] সম্পাদককে আমার সঙ্গে দেখা করতে বল। আর শৈলেন,—তুমি ওদিকের সন্ধান নাও। সুখময়, তুমি সদানন্দের সঙ্গে আজই দেখা করবে।

(সুখময়ের প্রস্থান)

(আবার লন—সুখময় ঘর থেকে বেরুতেই লনে রিপোর্টারের সঙ্গে দেখা)

রিপোর্টার—একেবারে জরুরী তলব। ব্যাপার কি হে সুখময়?

সুখময়—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য লীগের একটা জরুরী সভা হয়ে গেল। তার একটা জরুরী রিপোর্ট দিতে হবে।

রিপোর্টার—কোন কোন রত্ন আজ বিক্রমাদিত্যের সভা অলঙ্কৃত করলেন হে? সেই কালিদাস, ভবভূতির দল, না, নতুন কেউ আমদানী হয়েছেন?

সুখময়—একেবারে খাশ এডিনবরার আমদানী। ডক্টর হীরক দে।

রিপোর্টার—বল কি হে। এই আমদানী নিয়ন্ত্রণের দিনে?

সুখময়—তুমি জানো না যে মূলধন আর কারিগর, capital & personnel আমদানীর কোন বাধা নেই।

রিপোর্টার—[হেসে] ঠিক বলেছ। হ্যাঁ, তা ঘাটা হল ত সেই পুরোন কাসুন্দি। [বক্তৃতার ভঙ্গীতে] ধর্মঘট পিতৃবিদ্বেষ, অতএব অন্যায়। কয়লার খাদে যে দুর্ঘটনা ঘটছে সেটা মালিকদের দোষ থেকে নয়, ঘটছে শ্রমিকদের মৃত্যু ইচ্ছাজাত দুর্ঘটনা বিলাস থেকে। আমাদের মুনাফার প্রবৃত্তি যেমন জন্মগত, ওদের মুনাফার শিকার হওয়ার প্রবৃত্তিও তেমনি জন্মগত। বিধাতার, sorry, ফ্রয়েডের অমোঘ বিধান। এই তো? —শিল্পের জাতীয়করণ অন্যায়...

সুখময়—না, না, ঠাট্টা নয়। ব্যবসা বাণিজ্য যদি সব রাষ্ট্রের হাতে চলে যায় তবে ব্যক্তিগত initiative নষ্ট হয়ে যাবে নাকি? ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠবে কি করে? মানুষ হবে ক্রমশঃ automaton, তাই আমরা, মানে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য লীগ, মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের দিক থেকে জাতীয়করণের বিরুদ্ধে।

রিপোর্টার—তোমরা বড়দরের কিছু দাঁও মারবার তালে আছো, তাহলে? তোমাদের এই হরির লুটের আসরে বাইরে থেকে কোন নিতাই গৌর আমদানি করতে চাও মনে হচ্ছে?

সুখময়—তুমি unparliamentary ভাষা ব্যবহার করছো। ক্রুশেডের জন্য চাই Holy-alliance—মানো ত এ কথা?

রিপোর্টার—যেমন ইরানে তুর্কীতে হয়েছে। কিন্তু শেষ সামলাতে পারবে তো? বণিকের মানদণ্ড আবার রাজদণ্ড হয়ে উঠবে না তো?

সুখময়—প্রফেসর সান্যালের মতে তোমার এটা neurotic ভয়। তোমার সাইকো এ্যানালিসিস্ দরকার।

রিপোর্টার—(হেসে) শুধু বলছি, কাগজে ত লিখছি না। সাহিত্যিক, কবি এঁদের কাউকে ডাকনি?

সুখময়—এঁদের ডাকতে হয় না—এমনিই আসেন। কবি প্রফেসর পারিজাত বসু এসেছিলেন। নোট নাও।

রিপোর্টার—নোট নিতে হবে না। এমনিই বলতে পারি, কি বললেন! "অবচেতনার চুল্লীতে, অবদমনের ভাপে, কামনা বাসনার তাপে, চোলায়িত হয় আসল কাব্য মদিরা। অসীম তার শক্তি—তবে এক আধ ফোঁটাতেই একটা খণ্ড প্রলয়.....

সুখময়—চুপ চুপ, প্রফেসর সান্যাল—

(সকলের বিলিয়ার্ড রুম থেকে পুনঃ প্রবেশ—প্রফেসর সান্যাল কথা বলতে বলতে)

শিবশংকর—মোদ্দা কথা মানবপ্রকৃতি অপরিবর্তনীয়। বেশীর ভাগই তার অজ্ঞেয়। অদম্য কামনা বাসনার লীলাভূমি এই মন। সেখানে কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে বিষভরা সরীসৃপের দল! ডাইনোসরসরা মরেনি, মরবেও না।

শিবশংকর—সুপার ইগোর অর্থাৎ সভ্যতার চাবুক লাগালে—তারা সোজাসুজি না এসে বড়জোর বাঁকা পথ নেবে। হবে neurosis। সেই ওথেলো, সেই ইয়াগো, সেই সাইলক্ চিরকাল বেঁচে থাকবে।

রিপোর্টার—[এগিয়ে এসে] স্যার, ধৃষ্টতা মাপ করবেন। শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, এ সবের কি কোন দাম নেই?

শিবশংকর—[একটু নিরীক্ষণ করে] ভাঙ্গা দেওয়ালের চুন-কামের দাম যতটুকু ততটুকু। নড়বড়ে দেওয়াল তাতে শক্ত হবে না। কাকের বাসায় পালিত হয়েও কোকিল কোকিলই থাকে। এক পরিবেশে রাখলেই আরশুলা টিয়াপাখী বনে যাবে না। জন্ম থেকেই, ঐ হীরককে জিজ্ঞেস করো, জিনিয়াসদের মগজে

থাকে theta wave, আর dullard-দের মগজে থাকে delta wave.

[সকলে হেসে উঠলেন, একে একে সবাই যথারীতি সম্ভাষণের পর বিদায় নিলেন। স্যার সূর্যনারায়ণ, রিচার্ডসন বিলিয়ার্ড রুমের দিকে চলেলেন।]

(শিবশংকর ঘরে ঢুকলেন চাদর আনতে)

ঘর

সুরেশ্বর—আপনার মেয়েটি তাহলে University-তে ভর্তি না হয়ে ছাড়ল না ?

শিবশংকর—হ'ল বটে, কিন্তু চরিত্রগঠনের জন্য সর্বাঙ্গীন শিক্ষা আমার কাছ থেকে পাবার পর। মেয়েদের কাজ বাইরে নয়, ঘরে। সে জন্য আমি তাকে ভালভাবেই তৈরী করেছি। ভবঘুরে বাউণ্ডুলে ছেলেদের সস্তা 'ইজমের' বুলিতে সে ভুলবে না। আপনি নিশ্চই জানবেন।

(একটু গর্বভরে হাসলেন)

[সব্যসাচী শিকদারের প্রবেশ। বয়স পঞ্চাশের ওপর, বেঁটে, মোটা কালো। মাথায় বিরাট টাক। কথায় পাবনা জেলার টান। প্রবীণ নেতা, লোকসভার সদস্য।]

সুরেশ্বর—সব্যসাচী বাবু যে ! আসুন, আসুন, দিল্লী থেকে এলেন কবে ? নমস্কার।

সব্যসাচী—[রুমাল দিয়ে ঘন ঘন টাক আর ঘাড় মোছা এর মুদ্রাদোষ।]

নমস্কার। বলেন কেন মশাই, পার্টির একটা জরুরী মিটিং ছিল। আবার আজই ফিরছি। নমস্কার প্রফেসর, ভালো ত ?

(শিবশংকর প্রতিনমস্কার করলেন)

সুরেশ্বর—আচ্ছা, ইন্দোনেশিয়ার লড়াই সম্বন্ধে কি ধারণা আপনাদের বলুন তো ? অনেক টাকার Shipment যাচ্ছে আমাদের, আর ও হাতে অর্ডার রয়েছে। গোলমাল বেড়ে উঠবে না তো ?

সব্যসাচী—আপনারা ত আমাদের থেকে বেশী খবর রাখেন—ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া, এ্যালজেরিয়া সর্বত্রই এক অবস্থা। তবে যুদ্ধ আর কোন দেশের মানুষ চায় না। অবশ্য ব্যবসায়ীদের কথা আলাদা।

(একটু অর্থপূর্ণ ভাবে হাসলেন)

সুরেশ্বর—না, না। আপনারা আমাদের ভুল বুঝবেন না। নিজের দেশে যুদ্ধ ঢুকুক—এ কেউই চায় না। তবে যুদ্ধের প্রস্তুতি, ঠাণ্ডা লড়াই—এগুলো থাকা দরকার। রপ্তানী বাড়ে, বিদেশী মুদ্রার অভাব খানিকটা দূর হয়। আর কোরিয়ার মত অন্য কারুর ওপর দিয়ে লড়াইটা চল্লে মন্দ কি ? তা হলে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্যে দেশ বিদেশের কাছে হাত পাততে হয় না।

সব্যসাচী—রক্ষে করুন মশাই ! আর কোরিয়া টোরিয়া চাইবেন না। একটা কিছু হলে সব যাবে। কেউ বাদ পড়বে না। একে Hydrogen বোমা তার ওপর আবার I. C. B. M. সাধারণ মানুষ কিছুতেই সেটা বরদাস্ত করবে না। মানুষ যুদ্ধ চায় না।

শিবশংকর—[চুরুটে একটা জোরালো টান দিয়ে]

Excuse me politician, মানুষ কি চায় না চায় সেটা আপনাদের থেকে আমরা কিছুটা বেশী জানি। রাজনীতি, অর্থনীতি সম্বন্ধে যা খুসি বলতে পারেন। কিন্তু মনস্তত্ব সম্বন্ধে মতামত অমন হুট করে দেবেন না। যুদ্ধের প্রয়োজনও আছে। আগাছার মত জনসংখ্যা বাড়ছে, সরকারের চৈতন্য হচ্ছে না। জন্মনিয়ন্ত্রণকে এখনো আইন করে Compulsory ঘোষণা করা হচ্ছে না। Sub-normal গুলোকে Castrate করে দেওয়া হচ্ছে না। এর ফল কতদূর মারাত্মক হতে পারে জানেন ? কয়েক বছর পরে দু'পায়ে মানুষ না মাড়িয়ে হাঁটা যাবে না। এই সমস্যার—যুদ্ধ, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ছাড়া আর কোন সমাধান আছে কি ?

সব্যসাচী—(আশ্চর্য হয়ে) তার মানে !

শিবশংকর—মানে, মানুষ মুখে যা বলে আসলে সেটা তার মনের কথা নয়। আপনারা চান আর নাই চান,

মানুষ যুদ্ধ করবেই। লড়াই মানুষের স্বভাব ধর্ম। গেল যুদ্ধের আগে ঠিক এই কথাই আইনষ্টাইনকে বলেছিলেন মহামতি ফ্রয়েড। Ah! what a prophet he was! বুঝলেন, ঝাণ্ডাধারী, শান্তিবাদীদের অবচেতন মনেও আছে সেই আদিম জিঘাংসা প্রবৃত্তি।

সব্যসাচী—অবচৈতন্যের কথা জানি না মশাই। তবে রাস্তায় বেরিয়ে দেখুন, পুরো চৈতন্য হবে। দলে দলে লোক মিছিল করে চলেছে। কেউ ওরা যুদ্ধ চায় না। এ্যালজেরিয়া দিবস পালন করছে। সামনের সারিতে আপনার মেয়েকেও দেখতে পাবেন।

শিবশংকর—(চুরুট টান মেরে দূরে ফেলে দিয়ে) আমার মেয়ে, সীমা? অসম্ভব। কোথায়? একেবারে অসম্ভব, স্রেফ বাজে কথা।

(দ্রুত শিবশংকরের প্রস্থান)

সব্যসাচী—আপনাদের প্রফেসরের খেয়ালই নেই যে দিন বদলাচ্ছে। স্ত্রী-স্বাধীনতার ব্যাপারে ফ্রয়েডিয়ানরা দেখি মনুকেও হার মানায়। একদিন খুব বড় আঘাত পাবেন এ-মেয়ের কাছ থেকে, এ আমি বলে রাখলাম মশায়।

সুরেশ্বর—ওটা ওঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রফেসর যা বললেন খুব মিথ্যে নয়। জীবন ভোরই কি আমরা লড়াই করছি না পরস্পরের সঙ্গে। প্রত্যেকে অপরকে ছাপিয়ে উঠতে চাইছি। প্রতিদ্বন্দ্বিতার লড়াই করছি সবাই। জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ হয়ত কিছুদিন থামিয়ে রাখা যায়, কিন্তু ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যুদ্ধ থামাবেন কি দিয়ে?

সব্যসাচী—কেন, যা নিয়ে লড়াই, মানে ঐশ্বর্য, সম্পদ যদি সকলে সমান ভাগে পায়, তবে লড়াই হবে কেন?

সুরেশ্বর—অসম্ভব, কোথাও তা হয়নি, হবেও না। আর এর পরেও থেকে যাবে প্রেমের জন্য লড়াই, ক্ষমতার জন্য লড়াই। ক্ষমতার লড়াইয়ে আমি আপনি সবাই জড়িত নই কি?

সব্যসাচী—ভাবিয়ে তুল্লেন দেখছি।

সুরেশ্বর—ভেবে দেখবেন। পুঁথির বুলি আউড়ে কোন লাভ নেই। আপনাদের সোস্যালিজেশন শুধু দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ দুর্বলই করবে। আসল সমস্যার সমাধান ও-দিক দিয়ে হবে না। সমাজতন্ত্র ত' দূরের কথা, গণতন্ত্রও এ দেশের জন্য নয়, যেখানে শতকরা আশি জন নিরক্ষর।

সব্যসাচী—(চিন্তিতভাবে) কিন্তু সোশ্যালিজেশনের কথা না বলে এ যুগে কোন পার্টিই যে গড়া যায় না। জনমত নিয়ে আমাদের কারবার বুঝলেন মশায়। (সুরপাল্টে) তবে হ্যাঁ, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আর সরকারের বৈদেশিক নীতিকে আমি কি রকম আক্রমণ করেছি দেখেছেন ত? পড়েছেন বাজেট সেসনে আমার বক্তৃতাটা? দেশের চাই খাদ্য আর এঁরা দিচ্ছেন লোহা। চীন আর রুশ হয়েছেন এঁদের মন্ত্রগুরু, যত সব। তবে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কিছু সরাসরি বলতে গেলে আমরাও যাবো, পার্টিও যাবে। প্রফেসর সান্যালের মত অবচৈতন্যের দোহাই ত দিতে পার্বো না।

সুরেশ্বর—(মুরুব্বিয়ানার হাসি হাসলেন) আহা সরাসরি বলবেনই বা কেন? তবে আর কিসের পলিটিসিয়ান? তবে হ্যাঁ, Public sectorকে কিন্তু আর একটু আক্রমণ করতে পারেন। অবশ্য আপনার বিবেক যদি সায় দেয়।

সব্যসাচী—(উত্তেজিত) এ শর্মা মশায় কারুর চোখ রাঙানিকে ডরায় না। আর কারুর কাছে দু'পয়সা প্রত্যাশাও করে না। জনসাধারণের পার্টি আমাদের। তাদের মঙ্গলের জন্য যা ভাল বুঝব তাই বলবো। (সুর পাল্টে) Public sector-এর আর দু'একটা কেলেঙ্কারী বেরুতে দিন না মশায়—দেখবেন কি করি। আমি তা হলে চল্লাম আজ। আজই দিল্লী ফিরতে হবে।

সুরেশ্বর—দাঁড়ান। আপনার চাঁদার চেকটা তৈরী হয়ে আছে।

(বিলিয়ার্ড রুম থেকে লনে আসলেন সূর্যনারায়ণ ও রিচার্ডসন)

[লন]

রিচার্ডসন—If you can't pursuade your Govt. to give up the goal they have chosen—I mean socialisation, you don't get any aid in building the country.

সূর্যনারায়ণ—আমরা কি চেষ্টা কম কর্চ্ছি? ভারতীয় মাটিতে socialism-এর আবাদ চলবে না। এর ঐতিহ্যই আলাদা।

রিচার্ডসন—The sanctity of private property must be preserved by all means.

সূর্যনারায়ণ—গণতন্ত্র মানেই ত' ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তি সম্পত্তি রক্ষার ব্যবস্থা।

রিচার্ডসন—Now let us make a move.

(ঘরের মধ্যে সুরেশ্বর ও সব্যসাচী)

ঘর

সব্যসাচী—ভাল কথা মনে হয়েছে মশায়। আরে আপনাদের প্রচার সচিব—কি নামটা যেন ছোকরার? ত্রিদিবেশ না—কি?

সুরেশ্বর—নিখিলেশ!

সব্যসাচী—হ্যাঁ হ্যাঁ—সেই ছোকরা, আরে মশাই—একেবারে সাংঘাতিক চীজ একখানা। আপনার বিরুদ্ধে কি সব নাকি ফাঁস করে দেবে। হাতে নাকি document আছে। আমার সঙ্গে আর কয়েক জন M.P-র সঙ্গে এর মধ্যে সাক্ষাৎও করেছে। ব্যাপার কি বলুন তো?

সুরেশ্বর—ব্যাপার আর কি? ব্ল্যাক মেল করে দু'পয়সা রোজগার করতে চায়।

সব্যসাচী—ডেকে এনে অত বড় একটা পোস্ট দিলেন—

সুরেশ্বর—বিদ্যাসাগর মশাইত' অনেক আগেই বলে গেছেন। উপকার করেছিলুম বলেই ত কিছু প্রত্যুপকার করতে চাইছে। তবে ছেলে মানুষ—কতকগুলো আজে বাজে draft হাতে পেয়ে ভেবেছে বুঝি আমাকে ও হাতের মধ্যে পেয়ে গেছে। বড় নিরাশ হতে হবে বেচারাকে।

(সুখময় এসে চেক সুরেশ্বরের হাতে দিয়ে গেল। সুরেশ্বর সব্যসাচীকে দিলেন। সব্যসাচী এদিক ওদিক তাকিয়ে চশমা পরে চেকটা দেখে নিলেন।)

সুরেশ্বর—ঠিক আছে তো?

সব্যসাচী—(অপ্রতিভভাবে) দেখলাম আবার ভুলে cross করছে কিনা। আচ্ছা সুরেশবাবু। এসবের খবর নিখিলেশ কিছু জানে না তো?

সুরেশ্বর—নিখিলেশ? আরে না, এ আমার Personal account-এর ব্যাপার। এ সম্বন্ধে কেউ কিছু জানেনা।

সব্যসাচী—সেতো নিশ্চয়ই। আমি কি বুঝি না? আচ্ছা চলি তা হ'লে মশায়, নমস্কার। আপনার public sector-এর কথা মনে থাকবে। (যেতে যেতে ফিরে এসে) আর সোস্যালিজম্ নিয়ে চিন্তা কর্বেন না। ও এখনও একশ বছরের ধাক্কা।

সুরেশ্বর—নিজের জন্য ত চিন্তা নয়। চিন্তা আপনাদের মত পাঁচজনের জন্যে। জনসাধারণকে ক্ষমতার লোভ দেখাবেন না। রক্তের স্বাদ একবার পেলে নরখাদক বাঘের চেয়েও হিংস্র হয়ে উঠবে ওরা।

সব্যসাচী—(হাসতে হাসতে) না না সে ভয় নেই। আমাদের এটা বুদ্ধ-চৈতন্যের দেশ। অহিংস বিপ্লবের জায়গা বুঝলেন তো? তা' ছাড়া বর্ণাশ্রমের পবিত্র পতাকা এখনও দেশে গাঁয়ে পতপত করে উড়ছে।

[সব্যসাচীর প্রস্থান। সুরেশ্বর কান পেতে শুনছেন। বাইরে একটা অস্পষ্ট কোলাহল ক্রমশঃ বেড়ে উঠছে। মাঝে মাঝে ধ্বনি শোনা যাচ্ছে "সাম্রাজ্যবাদ এশিয়া ছাড়"। ছাত্র-ছাত্রী ও মেহনতি মানুষের একটা মিছিল সামনের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। তাদের হাতে ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন, ব্যানার, কণ্ঠে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শ্লোগান। আবহ সংগীতে 'মার্চ—সঙ'-এর সুর। 'সাম্রাজ্যবাদ আফ্রিকা ছাড়। —এশিয়া ছাড়' —শ্লোগানগুলো ক্রমশ স্পস্ট হয়ে উঠছে। চাপা গলায় ধ্বনি উঠছে—"ডাউন ডাউন উইথ, মনপেলি ক্যাপিটাল" 'একছত্র পুজিবাদ বরবাদ—বরবাদ"।]

[শৈলেন সমাদ্দারের প্রবেশ]

শৈলেন—স্যার।

সুরেশ্বর—[রাস্তার দিকে তাকিয়েই] এঁ্যা।

শৈলেন—স্যার, Insurance company-র minute bookটা কি ঐ ফাইলে ছিল ?

সুরেশ্বর—[চমকে ফিরে তাকালেন] না, সেগুলো ত নষ্ট করে ফেলার কথা।

শৈলেন—মনে হচ্ছে নষ্ট করা হয় নি।

সুরেশ্বর—কী করে বুঝলে ?

শৈলেন—সম্পাদকের কথার আভাসে মনে হল ওদিকে কিছু কিছু খবর, বাতাসে উড়ছে।

সুরেশ্বর—আরও কিছু চায় এই ত ?

শৈলেন—নিজের জন্য নয়—উঁচুদরের অংশীদারেব জন্য। সরকারী মহলে ওর খুব যাতায়াত।

সুরেশ্বর—(আবার সামনের দিকে তাকিয়ে) ঐ দিকে দেখ শৈলেন! তোমার উঁচু মহলকে ভয় পাই না—ভয় পাই ঐ মহলকে (জনতার মিছিলের দিকে আঙ্গুল দেখালেন) তুমি যাও, ওকে আজই আমার কাছে নিয়ে আসবে রাতে (শৈলেনের ঘাড়নেড়ে প্রস্থান) আরে হ্যাঁ—সদানন্দ—! মনে আছে ত! প্রথমে অডিটর—তারপর পুরুলিয়া।

(রিচার্ডসন ও সূর্যনারায়ণের প্রবেশ)

সূর্যনারয়াণ—উঃ, এত বড় Procession আমি জীবনে কখনও দেখিনি। সারা এশিয়া আফ্রিকার সব রং-এর লোক একসঙ্গে মিশেছে। অন্ততঃ এক ঘণ্টার মত রাস্তা বন্ধ। পুলিস কি করে যে permission দেয় বুঝি না।

রিচার্ডসন—I am stranded, My chauffer has also joined the procession with the key of the car, (এই সময় মিছিলের একটা অংশ রাস্তায় দেখা গেল। শ্লোগান আরও স্পষ্ট)।

রিচার্ডসন—But what the devil do they want ?

সুরেশ্বর—(অন্যমনস্কভাবে অন্য দিকে তাকিয়ে)—সাম্রাজ্যবাদের নিপাত চাইছে।

সূর্যনারায়ণ—সাম্রাজ্য কোথায় যে নিপাত যাবে ?

রিচার্ডসন—We are liquidating the empire voluntarily.

(সুরেশ্বর এক দৃষ্টিতে মিছিলের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। অরাও একটু এগিয়ে এলেন। রিচার্ডসনের দিকে তাকালেন।)

সুরেশ্বর—(ধীরে ধীরে) আপাততঃ nation গড়তে চায়। বোধ হয় পরে চাইবে nationalisation ; socialisation, কিন্তু পাবে না !!!

রিচার্ডসন—Of course if you accept our terms !

(মিছিলটা ক্রমশঃ থেমে পড়ল। হন্তদন্ত ভাবে শিবশংকর প্রবেশ করে সুরেশবাবুকে একপাশে নিয়ে গেলেন)

শিবশংকর—সর্বনাশ হয়েছে সুরেশবাবু, পুলিস মিছিল আটকেছে, এমব্যাসীতে যেতে দেবে না।

সুরেশ্বর—এতে আর চিন্তা করবার কি আছে। ছেলেগুলো ধ্বনি দিতে দিতে হাঁফিয়ে উঠবে। তারপর যে যার বাড়ী ফিরে যাবে, গোলমাল কিছু হবে না।

শিবশংকর—(উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে) সেকথা নয়, সীমা সত্যিই রয়েছে এ মিছিলে। সদানন্দের পাশে—একবারে সামনের সারিতে। লজ্জায় যে আমি আর মুখ দেখাতে পারবো না।

সুরেশ্বর—অত উত্তেজিত হলে চলবে কেন ? হুজুগে ও-বয়সে সবাই মাতে, আমরাও মেতেছি।

শিবশংকর—আপনি বুঝতে পারছেন না ব্যাপারটা, আমার মেয়ে আমার আদর্শে অবিশ্বাসী হলে অন্যে আমায় মানবে কেন ? বাউণ্ডুলে ছোকরাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাস্তায় বেরোন অভ্যাস হলে, ওকি আর ঘরে ফিরবে বলে মনে করছেন ?

(এমনি সময় মিছিলের মধ্যে সদানন্দ ও সীমাকে দেখা গেল)

ওই যে সীমা, ঐ দেখুন ! (আরও বেশী উৎকণ্ঠিত, সুরেশ্বরবাবুর হাত চেপে ধরে)

কি করি বলুন ছেলেমেয়েগুলো সবাই যে আমাকে চেনে ? (এই সময় দেখা গেল সীমা ও নিখিলেশ একটা

ফেস্টুন উঁচু করে ধরল। স্লোগানগুলো (সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক) আরও জোরালো হয়ে উঠলো। শিবশংকর গেটের দিকে তাকিয়ে সীমাকে লক্ষ্য করে আরও উত্তেজিত হলেন।

সীমা, সীমা, (ডাকতে ডাকতে গেটের দিকে ছুটলেন।)

সুরেশ্বর—দাঁড়ান দাঁড়ান, আমি ও দেখছি।

দ্বিতীয় অংক

১ম দৃশ্য

কয়েকদিন পরের একটি বিকেল। শিবশংকরের বসবার ঘর। মাঝারি সাইজের ঘরে রাশিকৃত বই টেবিলে, আলমারীতে ঠাসাঠাসি হয়ে পড়ে আছে। কয়েকখানা চেয়ার ইতস্ততঃ ছড়ানো। ভেতরের দিকের দরজা খুলে বাইরে যাবার বেশ শিবশংকরবাবুর মেয়ে সীমা বেরিয়ে এলো। সীমার বয়স বছর বাইশেক। Universityর ছাত্রী। বেশ মিষ্টি চেহারা এবং স্বভাবটাও ঠাণ্ডা। তাকিয়ে দেখলো। খুব নোংরা হয়ে রয়েছে। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিজের মনে মনেই বল্ল।]

সীমা—নাঃ, যেমন করেই রাখি না কেন, এদের অগোছালো করতে পাঁচ মিনিটও লাগে না।

(চেয়ারগুলো সরিয়ে এনে সুশৃংখলভাবে গুছিয়ে রাখলো। টেবিলের বইগুলো গোছাতে লাগলো। এমনি সময় বাইরে থেকে নির্মলা পিসীর প্রবেশ। বছর ৪০ বয়স। সাজ পোশাকের ঘটা খুব। আধুনিক হবার উৎকট প্রচেষ্টা। ঘন ঘন পান-দোক্তা খাবার অভ্যেস আছে।)

নির্মলা—এই যে মা। দু দিন এসে ফিরে গেছি। কোথায় থাকিস—কোথায় যাস? কিছুই কেউ বলতে পারে না।

সীমা—(ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) কবে আবার তুমি এসে ফিরে গেলে? কই বামুনদি তো আমাকে কিছু বলেনি। বাবাও তো কিছু বলেনি।

নির্মলা—ও মা! দাদারও যেমন ভুলো মন! আর তিনিও তো ভারী বাড়ি থাকার মানুষ। বউদি যাবার পর থেকে এ বাড়ীর কারুর আর স্থিতিভিতি হ'লো না। (চোখ মুছলেন)

সীমা—তা তুমি এতো কষ্ট করে আসতে গেলে কেন, ফোনে খবর দিলেই তো পারতে—আমি গিয়ে দেখা করতুম।

নির্মলা—ঘেমে একেবারে নেয়ে উঠেছি। একটা পাখা দে তো মা। বস্ দেখি মা সুস্থির হয়ে, কথা আছে।

সীমা—আজকে নয় পিসীমা, রুচিদির নোটগুলো আজই আন্‌তে হবে। এগজামিন এসে গেল।

নির্মলা—বলিস কি লা! সেই ধাবধাড়া গোবিন্দপুর থেকে এলাম এই ঠিক দুপুরে—আর মেয়ে এখন ছুটছেন টহল দিতে। কি যে তোদের ঢং হয়েছে।

সীমা—(নেহাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাখাটা খুলে দিয়ে এসে বস্‌লো।) লক্ষ্মীটি পিসীমা, আজকে একটু যেতে দাও। আর কেউ ওগুলো নিয়ে গেলে আমি একদম, বুঝলে তো, জলে পড়ব। পাস করা হবে না।

নির্মলা—রাখ্ রাখ্,—পাস আর ফেল, মেয়ের মুখে খালি ঐ এক কথা। ঘর সংসার দেখা নেই। বুড়ো বাপের যত্ন আত্তি নেই—খালি চরকিবাজি, কেনো ল্যা? পাস করে কি চারটে হাত গজাবে? করবি তো সেই সবার মতো ঠাকুর চাকরের সঙ্গে ঝগড়া আর ছেলেমেয়েদের জন্যে ফুড তৈরী।

সীমা—কে বল্লে, আমি বাবার যত্ন-আত্তি করি না? বাড়ীর কাজ দেখাশোনা কে করে শুনি?

নির্মলা—(মুখে একটা পান পুরে) রাগ করিস নে মা! তাই কি আমি বল্লাম? আমি বলছিলাম কি, তিন-তিন্‌টে পাস তো দিলি। এইবার বিয়ে থা করে নিজের

ঘর সংসার গুছিয়ে নে। এই রকম ঘুর ঘুর করে বেড়ালে শান্তিও পাবি না, আবার ভাল বিয়েও হবে না। ছেলের মায়েরা বি. এ. পাস-করা বৌ আদর করেই ঘরে নেবে। কিন্তু যাঁহাতক শোনে এম. এ. পড়ছে Universityতে পড়ছে—ব্যাস্, সে যতই আধুনিকাই হোক না কেন পেছিয়ে পড়ে। ছেলেমেয়েতে অমন গলাগলি হয়ে পড়াশোনা—ও কেউই বরদাস্ত করতে পারে না।

সীমা—সে তো ঠিকই—আজ আমি আসি পিসীমা।

নির্মলা—শোনো মেয়ে, আমিও বসতে আসিনি। আমার সেই ভাস্বর পো—মণি—মনে নেই। তোকে সেই হাওড়া ময়দানে সার্কাস দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল! তার কথা আমি দাদাকে বলেছিলাম। দাদার তো অমত নেই। বল্লেন—তুমি সীমাকে বলো না।

সীমা—বলা তো হল। এবার আমি যাই এ্যাঁ?

নির্মলা—অবাক করলি তুই সীমা। কথাটার একটা জবাব দিবি তো?

সীমা—আমার যে এগজামিন পিসীমা।

নির্মলা—তোমার এগজামিন বলে ছেলেরা তো আর হা-পিত্যেশ করে বসে থাকবে না।

সীমা—কি আর করা যাবে পিসীমা? তা হলে বুঝি আইবুড়োই থাকতে হবে।

নির্মলা—হ্যাঁ আইবুড়ো থেকে ধিংগীপনা করে বেড়াও আর কি! আজ মিছিল—কাল মিটিং।

সীমা—কে বলেছে এসব কথা?

নির্মলা—কেন? সত্যি নয় এ কথা?

সীমা—সত্যি, কিন্তু এতে দোষটা কি?

নির্মলা—দোষ কি—তোমরা বাপ-বেটীতে বোঝাবুঝি কর। আমি অত জানি না।

সীমা—বাবা বলেছেন বুঝি?

নির্মলা—কেন বাবা বলবে না, শুনি? তোর বিয়ে দিয়ে সাধ-আহ্লাদ করতে আমাদের কি প্রাণ চায় না?

সীমা—বিয়ে না হ'লে মেয়েরা বুঝি বাঁচে না?

নির্মলা—শুঁটকী মাস্টারনি হয়ে বাঁচে। মাগো, আমাদের আশাকে দেখলে আমার গা ঘিন্ ঘিন্ করে। মেয়ে তো নয় যেন আখের ছিবড়ে। বিয়ে না করলে অদৃষ্টে অশেষ দুর্গতি বুঝলি? ঐ যে বলে মেয়েদের ১২ হাত কাপড়ে কাছা আঁটে না—কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয় রে। লতাকে গাছ বেয়ে উঠ্‌তেই হবে। (গলায় দরদ মিশিয়ে) তোর বাবা যে হন্যে হয়ে উঠেছে মা। ছেলেগুলোর সঙ্গে মেশা ছেড়ে দে। তার মনে যে নানান রকমের চিন্তা ঢুকেছে।

সীমা—ও! তোমরা তা হলে আমাকে সন্দেহ কর বলে বেড়ি পরাতে চাইছো?

নির্মলা—[আদর করে সীমাকে কাছে টেনে নিয়ে] আমি তোকে এতটুকু বেলা থেকে মানুষ করেছি। আমি কি তোকে সন্দেহ করতে পারি? দাদাকে চিনিস তো—ওর কথার দাম দিস্‌নে। তুই বাছা যা—কি কাজে যাচ্ছিলি যা। আমি ওপরে গিয়ে একটু গড়িয়ে নিই। বেলা পড়লে যাবোখন। তোর কোন ভয় নেই। আমি বলে দেবো'খন ও ম'ণেটা লোক সুবিধের নয়। ওখানে আমি সীমার বিয়ে দেবো না।

সীমা—আমার লক্ষ্মী পিসীমা।...(পিসিমাকে জড়িয়ে ধরলো)

নির্মলা—তবে সত্যি কথা বলি শোন্। ঐ মিটিং মিছিল কি আমরা করি নি? —ঢের করেছি। পিকেটিং করেছি, ইয়া ইয়া বিলিতি কাপড়ের গাঁট আটকে শুয়ে পড়েছি। লালমুখো ঘোড়ায় চড়া গোরাদের সামনে দাঁড়িয়ে বন্দেমাতরম্ বলেছি। করবি বই কি মা—এই তো বয়স। এ বয়সে তো হেসে খেলে বেড়াবিই, দাদার যেমন—ছেলেমেয়ে এক সঙ্গে দেখলেই সন্দেহ। আমাদেরও কি কম জ্বালিয়েছেন! আরে দাসীগিরি করার জন্য সারাজীবনই পড়ে রয়েছে। চ' মা কোথায় যাচ্ছিলি চ'। আমি আর শোব না। শুয়েছি কি মরেছি। অম্বলের ব্যথাটা চাগিয়ে উঠবে।

(মুখে একগাদা পান-দোক্তা দিলেন)

সীমা ও নির্মলার বাইরের দিকে প্রস্থান। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শিবশংকর ও হীরকের প্রবেশ। শিবশংকর অত্যন্ত উত্তেজিত।

শিবশংকর—যতসব অসভ্য ইতরের দল। এতবড় সাহস হয়েছে ওদের। সভায় ডেকে নিয়ে অপমান। সেদিনকার ছেলে ঐ সমর—আমাকে বলে কিনা……

ক্রোধে গলায় কথা আটকে গেল

হীরক—সভা সমিতিতে ও-রকম একটু আধটু হয়েই থাকে। সমর বা সদানন্দবাবু ঠিক আপনাকে অপমান করতে চান নি।

শিবশংকর—অপমান করতে চান নি—বল্লেই হলো। ফ্রয়েড অবৈজ্ঞানিক, ফ্রয়েডের নির্জ্ঞান তত্ত্বের কোন প্রামাণিক ভিত্তি নেই—এসব বলে ওরা সম্মানিত করেছে বলতে চাও? সাইকো-মাইথোলজি—বলে কিনা মনস্তত্ত্ব না পুরাতত্ত্ব!

হীরক—ওদের তো দোষ দেওয়া চলে না স্যার। ফ্রয়েড নিজেই তো ওকথা বলে গেছেন।

শিবশংকর—ফ্রয়েড নিজে! কোথায়? দেখিয়ে দাও আমাকে। আলমারীর দিকে নির্দেশ করলেন।

হীরক—ফ্রয়েড আইনস্টাইনকে যে চিঠি লিখেছিলেন—তাতে কি একথা বলেন নি যে পদার্থবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সব বিজ্ঞানই শেষ পর্যন্ত মাইথোলিজ—মানে পৌরাণিক তত্ত্বকথা!

শিবশংকর—সে কথা কি অস্বীকার করতে পারো তুমি। বিজ্ঞান আসলে তো মনের কতকগুলোসিদ্ধান্ত। ফ্রয়েডের অন্তর্দৃষ্টি সেই মনের অন্তস্থল ভেদ করেছে। তিনি হদিশ দিয়েছেন মনের গোপন আর গভীরতম রহস্য লোকের। ফ্রয়েড সত্যিকারের Genius। অদ্ভুত তাঁর অন্তর্দৃষ্টি। সেরা বিজ্ঞান এই ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞান।

হীরক—কিন্তু sir,—আধুনিক বিজ্ঞান ও-অন্তর্দৃষ্টিকে গ্রাহ্য করতে চাইছে না। সেই কথাই ত' সদানন্দবাবু বল্লেন।

শিবশংকর—চুলোয় যাক্ সদানন্দবাবুর বিজ্ঞান। কে মানছে তার আধুনিক বিজ্ঞানকে? মানুষ সহজাত প্রবৃত্তির দাস—এই সহজ সত্য কথা বলার জন্য ফ্রয়েড হলেন প্রতিক্রিয়াশীল। জন্মগত পার্থক্য অপরিবর্তনীয়—এ তত্ত্ব হ'ল অভিসন্ধিমূলক? কি অভিসন্ধি পেল ওরা এর মধ্যে?

হীরক—এ যদি বৈজ্ঞানিক সত্য হয় তবে এশিয়া-আফ্রিকার মানুষ কোন দিনই আমেরিকা-ইউরোপের মানুষের সমান হতে পারবে না। আর যারা আজ সমাজের নীচের তলায় আছে, তারা চিরদিনই সেইখানে থাকবে। ওরা তাই বলছে—ফ্রয়েডিয় তত্ত্ব সাম্রাজ্যবাদ আর ধনতন্ত্রকে জীইয়ে রাখার মন্ত্র—বিজ্ঞান নয়।

শিবশংকর—ফ্রয়েডের অপরাধ তিনি সত্য কথাটি ফাঁস করে দিয়েছেন। অঙ্গার শত ধৌতেন—বুঝলে হে! যা সত্যি—তা' সত্যি। চ্যাংড়াদের চোখ রাঙ্গানীতে সেটা মিথ্যে হয়ে যাবে না। ডারউইন্‌কে হাজার বার ফাঁসী দিলেও মানুষের জন্মইতিহাস এমন কিছু গৌরবজনক হয়ে উঠবে না। না—না—এ আমি বরদাস্ত করব না। হীরক,—তুমি একটু ব'স। আমি আসছি। একটা ফোন করতে হবে সুরেশ্বর-বাবুকে। প্রস্থান

সীমা—[নেপথ্যে] এখন তোরা যা। ঠিক ছ'টায় গাড়ী নিয়ে আসবি। আমি দিল্লীর টিকিট কাটিয়ে রাখবো। সাতখানা তো?

একগাদা ফাইল হাতে সীমার প্রবেশ। প্রথমে হীরকের উপস্থিতি চোখে পড়বে না। টেবিলের ড্রয়ারে কিছু খোঁজবার সময় হীরককে দেখতে পেয়ে কিছুটা কুণ্ঠিত হবে।

সীমা—আপনি একলা যে? বাবা কোথায়?

হীরক—তিনি এইমাত্র ভেতরে গেলেন। এখুনি আসবেন।

সীমা ফাইলগুলো কতকগুলো কাগজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল।

সীমা—তাই নাকি? আমি ভেবেছিলাম তিনি মিটিং থেকে এখনও ফেরেন নি। ওহো, ঠিক হয়েছে।…

(একটা কাগজ ফাইল থেকে নিয়ে)...আপনি ত' একজন মস্ত বড় লোক। একটা সই দিন তো? পুরো ডিগ্রীডিপ্লোমা সমেত।

হীরক—কি ব্যাপার? কিসে সই দিতে হবে?

সীমা—(একটু হেসে) ভয় নেই, বিপদে পড়বেন না। জানেন তো আলজিরিয়াতে ওরা ২২ বছরের মেয়ে জামিলাকে ফাঁসী দিতে চাইছে। দেশকে ভালবাসে—এই তার অপরাধ। আমাদের দেশের প্রতিটি মানুষের প্রতিবাদ স্বাক্ষর পাঠিয়ে আমরা জামিলার দেশপ্রেমের সমর্থন জানাতে চাই। আরও জানাতে চাই আমরা শান্তি চাই—যুদ্ধ চাই না।

হীরক—কিছু মনে করবেন না, আমি এসব ঠিক বুঝি না। এতে কি ফাঁসীর হুকুম রদ হবে মনে হয়?

সীমা—নিশ্চয়ই। আপনি দেখবেন, আমাদের প্রধান মন্ত্রীর অনুরোধ এড়াতে ওরা সাহস পাবে না। তাছাড়া এশিয়া-আফ্রিকার কোটী কোটী লোকের প্রতিবাদ—এর গুরুত্বও আজ কম নয়।

(শিবশংকরের প্রবেশ। এখন কিছুটা শান্ত)

শিবশংকর—এই যে সীমা। তোমাকে খুঁজছিলাম—কোথায় ছিলে তুমি?—কি লিখছো তুমি হীরক?... এ সব কি? (কাগজগুলো হাতে নিয়ে)...এঁ্যা, এ দেখছি...। কে ঢোকালে এ সব আমার বাড়ীতে? (সীমার দিকে তাকিয়ে)...তুমি?

সীমা—এর মধ্যে দোষের কি আছে বাবা? একটা নির্দোষ মেয়ের জীবন রক্ষার চেষ্টা।

শিবশংকর—(কাগজটার ওপর চোখ রেখে) যে কোন মানুষের জীবন রক্ষার জন্য আবেদনে আমারও সহানুভূতি আছে। কিন্তু তার সঙ্গে এসব কি? এই শান্তির জেহাদ,.....সাম্রাজ্যবাদের অন্তিম নিশ্বাস,—এটা কি প্রাণ রক্ষার আবেদন—না যুদ্ধের চরম পত্র? না—না, এসবে সই করা চলবে না তোমার হীরক। তোমারও নয় সীমা।

সীমা—আমি যে সই দিয়েছি বাবা।

শিবশংকর—(ঠাণ্ডা গলায়) সই দিয়েছো অথচ আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও করলে না? না—না—রাজনীতির দাবাখেলায় তোমার ঘুঁটী হওয়া চলবে না। স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরা মিছিল মিটিং-এ গিয়ে ঝাণ্ডা ওড়াক—এ আমি একেবারে চাই না। সেদিন তো তোমায় সব বুঝিয়ে বলেছি। সই কেটে দাও।

সীমা—আমি তো মিছিলে যাইনি তারপর থেকে। আর এতো একেবারে অন্য জিনিস।

শিবশংকর—(কণ্ঠস্বরে একটু দরদ দিয়ে) তুমি ছেলেমানুষ,—তাই মনে করছ অন্য জিনিস। এও ঐ মিছিল-ওয়ালাদের একটা চক্রান্ত। রেফিউজী আর স্টুডেন্টদের মাতিয়ে একদল লোক আজকাল করে খাচ্ছে। প্রগতিবাদের নামে জিগীর তুলে নিজেদের career গড়ার চেষ্টা, এদের সঙ্গে তোমার মেলামেশা কিছুতেই চলবে না।

সীমা—সবাই তো সই দিচ্ছে বাবা।

শিবশংকর—সবাই-এর থেকে আলাদা হতে পারাটাই কঠিন। আর তাই হবে তোমার লক্ষ্য। এখন যাও—বামুনদিকে বলতো, আমাদের জন্য দু'কাপ কপি পাঠাতে।

(ক্ষুণ্ণ মনে কাগজখানি হাতে সীমার প্রস্থান)

শিবশংকর—হীরক, তুমি অনেক দিন বাইরে ছিলে। এখানকার হালচাল সব জানো না। স্কুল-কলেজগুলো সব হয়ে উঠেছে পলিটিক্যাল জুয়াড়ীদের আড্ডাখানা। মেয়েটা দলে মিশতে শুরু করেছে। এখন একটু কড়া শাসন দরকার। অবশ্য ওর ভিত্‌টা শক্ত আছে। কাজেই সামান্য টুকটাক আঘাত দিলেই ঠিক হয়ে যাবে। পরিবেশের প্রভাব তো আর জন্মদত্ত সংস্কারকে ছাপিয়ে যেতে পারে না। (মুরুব্বিয়ানার হাসি হাসলেন) ...আর দাওয়াইও ঠিক করে রেখেছি। (ব্রজেশ্বরের প্রবেশ) এই যে ব্রজেশ্বর এসেছো!

(ব্রজেশ্বর বাগচীর পরনে চকচকে প্যাণ্ট কোট, গলায় আমেরিকান টাই.....বয়স ৩২।৩৩, একটু বাতিকগ্রস্ত। পেশা ঘটকালী। উনি বলেন, Research in Genetics)

শিবশংকর—আছো কেমন ?

বজ্রেশ্বর—ভালো আর থাকতে দিচ্ছে কোথায় ? একটা নতুন original scheme invent করেছি। মানে compatibility co-efficient বের করা। অথচ schemeটাকে কাজে লাগাতে পারছি না।

শিবশংকর—ব্যাপারটা কি ? compatibility co-efficientটা আবার কি জিনিস ? তুমি কি প্রজাপতির নির্বন্ধ—মানে ঘটকালীর অফিস তুলে দিয়েছো ?

বজ্রেশ্বর—তুলে দিয়েছি—বলেন কি ? আরও জাঁকিয়ে চালাব বলেই তো schemeটা করেছি। compatibility co-efficient বের করা মানে, বাংলায় যাকে বলে রাজযোটক নির্ধারণ। আর ঠিকুজী কুষ্ঠীতে চলবে না। স্পুটনিকের যুগে গ্রহ-উপগ্রহের ওপর মানুষের আস্থা চলে গেছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে compatibility co-efficient বের করতে হবে। তবেই আমাদের প্রজনন সমিতি জাঁকিয়ে উঠবে। —এই নামটাই বেশ আধুনিক, না স্যার ? প্রজাপতি নির্বন্ধ বড্ড সেকেলে।

শিবশংকর—স্কীমটা তোমার কি ?

বজ্রেশ্বর—প্রাঞ্জলভাবেই বুঝিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু ব্যাপার কি জানেন ? এখনও পেটেন্ট নেওয়া হয়নি। কাজেই Secrecy maintain করতে হচ্ছে।..... (হীরকের দিকে অর্থপূর্ণভাবে তাকিয়ে)..... একটা আভাস দিচ্ছি, আপনি পণ্ডিত লোক, কিছুটা বুঝবেন। পাত্র পাত্রীদের উর্ধ্বতন সাতপুরুষের ইতিহাস নিয়ে তার থেকে Dominant and Recessive qualities অর্থাৎ বর্ধমান আর ক্ষীয়মান গুণগুলো বের করে ফেলতে হবে factor analysis করে। 'জিন'-এর composition-এর একটা মোটামুটি আভাস তার থেকে পাওয়া যাবে। তারপর যথারীতি Indexing-punching করে কার্ডগুলো যন্ত্রে ফেলে দিন, আপনা থেকেই Compatibility Co-efficient এর হদিশ বেরিয়ে আসবে। ধরুন, যন্ত্রের একদিকে feed করলেন পাত্রদের কার্ড—যেমন, রাম, নল, সত্যবান, ভীমসেন, আর একদিকে feed করলেন পাত্রীদের কার্ড যথা—সীতা, দময়ন্তী, সাবিত্রী, হিড়িম্বা ! মেশিন চালিয়ে দিন। Electro-magnetic induction-এর দৌলতে আপনি এখন পাবেন জোড়া জোড়া কার্ড,—রাম-সীতা, নল-দময়ন্তী, ভীম-হিড়িম্বা—এক হয়ে গেছে। —এদের Co-efficient 100%, মানে, এরা রাজযোটক। দিন না স্যার একবার Prof. মহলানবীশকে বলে আমার এই স্কীমটার একটা গতি করে।

শিবশংকর—আঃ, কি বিপদ। তুমি আমাকে ফোনে বল্লে—হাতে ভালো পাত্র আছে—আমার মেয়ের উপযুক্ত। এখন এসে তোমার স্কীম নিয়ে পড়েছ। চুলোয় যাক্ তোমার স্কীম—পাত্র থাকে তো বল, না হলে যাও। বাজে কথা শোনবার আমার সময় নেই।

বজ্রেশ্বর—আপনি রেগে গেলেন, স্যার। একটা বৈজ্ঞানিক আলোচনা শোনবার ধৈর্য্যও আপনাদের নেই। জুলিয়ান্ হাক্স্লীকে তিন তিনখানা চিঠি দিলাম আমার association-এর Chairman হবার জন্য অনুরোধ করে। তিনি ত তার উত্তরই দিলেন না। চলি তা হলে। (প্রস্থানোদ্যত)

শিবশংকর—শোন, কোন্ এক উমাপতি লাহিড়ীর ছেলের কথা বলছিলে—ডাক্তারী পাস করেছে, কি হল।

বজ্রেশ্বর—দেখেছেন ! যে জন্যে আসা, তাই ভুলে গেছি। আর দেরী নয়, Sir ! আপনার মেয়ে আর কালো লাহিড়ীর ছেলে—ও আমি punching indexing না করেই বলে দিতে পারি Cent Percent Compatible—একেবারে রাজযোটক ছেড়ে সম্রাটযোটক।

শিবশংকর—কালো লাহিড়ী আবার কে ?

বজ্রেশ্বর—আজ্ঞে চুঁচড়োর বাজারে ঐ নামেই ত চালু উমাবাবু।

শিবশংকর—ছেলেটিও কি বাপের রং পেয়েছে ?

বজ্রেশ্বর—পেয়েছে মানে ! বাপের ওপর আরও দুপোঁচ

সরেস। এই ক'মাসে—শুধু ওষুধ কালো করেছে সাড়ে ৭ লাখ টাকার।

শিবশংকর—থাম, থাম! কি বলে চলেছ? ওষুধ কালো করা ব্যাপারটা কি। ওষুধ জাল করেছে? তুমি কি জালিয়াতের ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের সম্বন্ধ এনেছো?

বজ্রেশ্বর—আজ্ঞে না। উমাপতিবাবু জালজুয়াচুরীর মধ্যে নেই। তিনি দার্শনিক। গভীর তত্ত্ব আর অকাট্য যুক্তি তাঁর কথায়। তিনি বলেন, পেনিসিলিন বলে ময়দার গুঁড়ো বেচে মানুষ মারা পাপ। মন্দির ধর্মশালায় ক্ষয় হয় না। ওসবে তিনি নেই। আপনার যেমন ফ্রয়েড, তাঁর তেমন ম্যালথাস। Survival of the fittest! কখন কোন জিনিস দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠবে, আগে থেকে তার হদিশ পেয়ে তিনি বাজারের সমস্ত মাল এমন জায়গায় সরিয়ে ফেলেন, যেখানে সূর্যের আলোটুকু পর্যন্ত যায় না। তারপর অভাবের তাড়নায়—যেমন ১৩৫০-এ হয়েছিল—বাঁচার লড়াই যখন তীব্র হয়ে ওঠে—তিনি তখন শুধু উপযুক্তদের বাঁচবার ব্যবস্থা করে দেন। উপযুক্ত তাঁরা, যারা ৭৲ টাকার চাল ৭০৲ টাকায় কিনতে পারে।

শিবশংকর—(সহাস্যে) . শুন্‌ছো হীরক, বজ্রেশ্বরের কালোবাবুর কীর্তি?

বজ্রেশ্বর—কেন? তাঁর জীবনদর্শন মত তিনি ঠিকই করেন।

[চাকরের হাতে ট্রেতে ৩ কাপ কফি নিয়ে সীমার প্রবেশ]

শিবশংকর—বসো সীমা। তোমারও শোনা দরকার।

বজ্রেশ্বর—তিনি জাল জুয়াচুরীতে নেই। তিনি ত' আপনাকে চেনেন—দস্তুর মত শ্রদ্ধাও করেন। আপনিও তাঁকে অশ্রদ্ধা করবেন না—তাঁর ধারণা। এক মণ চাল Democratically ৫ হাজার লোককে সমান ভাগে ভাগ করে দিয়ে সকলকে মারার পক্ষপাতী তিনি নন। বরং চার হাজার ন'শ নব্বই জন মরুক—যে দশ জন উপযুক্ত—তাঁরা বেঁচে থাক। এই তো বৈজ্ঞানিক মানবপ্রীতি!

শিবশংকর—একে Aristocracyও বলা যায়। বেশ interesting—কি বল হে হীরক? তবে তোমার ঐ কালো লাহিড়ীর ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিতে পারব না। বনেদী ঘর চাই। তাছাড়া বেআইনী কারবার করে যে—তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে! সে হয় না! যে কোন দিন ওদের জেল হতে পারে।

বজ্রেশ্বর—এইবার আপনি অবৈজ্ঞানিকের মত কথা বল্লেন Sir। আইনও একটা commodity! আর ৫টা জিনিসের মত টাকা দিয়ে ত কিনতে হয়?

হীরক—কি বলছেন আপনি—ঠিক বুঝলাম না।

বজ্রেশ্বর—চেহারা দেখে মালুম হচ্ছে পোড় খান নি। বুঝতে আপনার এখনও দেরী আছে। আইনেরও আর ৫টা commodity'র মত উৎপাদন, পরিবেশন—মানে, Manufacture—Distribution আছে। বিধান সভার সভ্যরা আছেন উৎপাদনে, জজ-ম্যাজিস্ট্রেট পুলিস-পেয়াদা আছেন পরিবেশনে আর উকীলরা আছেন খদ্দের আকর্ষণে। এর প্রত্যেকটী স্টেজে একে Black করা যায়। আইনজীবীরা সত্যিকারের আইন খেয়েত বেঁচে থাকেন না। বুঝলেন কিছু?

(একটু আশ্চর্য্য হয়ে রইলো হীরক)

শিবশংকর—না, তবু মন স্থির করতে পারছি না। তোমার কথাগুলোর যুক্তি অস্বীকার করা যায় না। তবে অনেক কিছু জানতে হবে। —একেবারে upstart—বংশ গৌরব বলে কিছু আছে কি?

বজ্রেশ্বর—দাঁড়ান! আপনার quadratic equationকে, Simple equation-এ এনে দিচ্ছি। ইনিই ত পাত্রী। বলুন মিস্ সান্ন্যাল—ফ্রয়েড আর ম্যালথাস্—এদের মিলে রাজযোটক হয় কি না। সোজা উত্তর—হ্যাঁ—কি, না?

সীমা—(অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে)...আপনার প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই।

শিবশংকর—না সীমা, এতে লজ্জার কিছু নেই। তোমার মতামতটা স্পষ্ট করেই জানিয়ে দাও।

সীমা—কি সম্বন্ধে ?

শিবশংকর—কেন এই বিয়ের ব্যাপারে ? শুনলে'ত সব। আসছে আষাঢ়ে তোমার বিয়ে দেব আমি ঠিক করে ফেলেছি। এখন চুঁচড়োর লাহিড়ীদের ছেলেটীর কথা'ত সবই শুনলে—বলো এতে তোমার মত আছে কিনা ?

সীমা—ঠিক যখন করে ফেলেছ তখন আর আমার মতামতের কি দরকার ?

শিবশংকর—তোমাকে ত আর ৮ বছরে গৌরীদান করছি না। তোমার বয়স হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে। আমার কাছে শিক্ষা পেয়েছ। পাত্র পছন্দের ব্যাপারে তোমার মতামত নিতে হবে বৈকি !

সীমা—আমার মত নেই (উঠে দাঁড়াল)।

শিবশংকর—শুনলে ত বজ্রেশ্বর। এর ওপর ত আর কথা চলে না। তুমি বরঞ্চ অন্য পাত্রের সন্ধান নিয়ে এসো। দুএকদিনের মধ্যেই আসবে। এই আষাঢ়েই মনে থাকে যেন।

বজ্রেশ্বর—বেশ, সে আমি একটা ছেড়ে ১০টা সম্বন্ধে হাজির করছি। কিন্তু আমার কথাটা মনে রাখবেন দয়া করে।

শিবশংকর—কি আবার কথা তোমার ?

বজ্রেশ্বর—ঐ যে আমার Compatibility Co-efficient Scheme—রাজযোটক ?

শিবশংকর—আবার বাজে কথা। এখন যাও, আমার কাজ আছে।...

(হতাশভাবে বজ্রেশ্বরের প্রস্থান)

শিবশংকর—তুমি ভেতরে যাও সীমা। আমি একটু বেরুচ্ছি। এক্ষুনি এসে যাবো। ৭ টার আগে রায় বাহাদুর চুণীলাল আসছেন। যদিও জমিদারী চলে যাবার পর এখন অবস্থা পড়ন্ত ; তবুও বনেদী বংশ। হীরক তুমি একটু অপেক্ষা কর। সদানন্দের অভিযোগের উত্তরটা লিখতে হবে।

সীমার ভিতরের দিকে ও শিবশংকরের বাইরের দিকে প্রস্থান

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে একটা হর্ন বেজে উঠলো। সীমা হাতে ব্যাগ নিতে ভেতর দিক থেকে পা টিপে টিপে স্টেজে প্রবেশ করল। টেবিল থেকে ফাইলগুলো বেছে নিলো এবং বেরুতে যাবার সময় হীরকের দিকে তাকালো।

সীমা—শুনছেন ? (হীরক বই থেকে মুখ তুললো) বাবাকে বলবেন, আমি একটা বিশেষ কাজে বাইরে যাচ্ছি। রায় বাহাদুরদের বসিয়ে রাখেন না যেন,—আমার ফিরতে দেরী হবে।

হীরক—যদি জিজ্ঞেস করেন, কোথায় গেছেন ?

সীমা—(একটু ভেবে) বলবেন, আলজিরিয়ার ভলান্টিয়ারদের সম্বর্ধনা সভায় গেছে। আপাতত থিয়েটার রোড। সেখান থেকে অনেক জায়গায়।

হীরক—আপনার কাগজটা দিলে নামটা সই করে দিতাম। আমাকে একটা Sheet দিয়েও রাখতে পারেন। চেষ্টা করলে ২৫টা সই আমি যোগাড় করতে পারবো।

সীমা—(খুব খুশী হয়ে কাগজ বার করল) যাক্ আপনি তা হলে বাবার ধমকানিতে ঘাবড়ান নি। এই নিন্।

আবার একটা হর্ন বাজাতে সীমা হীরকের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বেরিয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শিবশংকর আর একটা দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন।

শিবশংকর—সীমা, সীমা, আমার মনিব্যাগটা দিয়ে যাও তো, কি ভুলই হচ্ছে আজকাল।

হীরক—তিনি ত নেই।

শিবশংকর—নেই ? গেল কোথায় ? দু' মিনিটও হয়নি তাকে রেখে আমি বাইরে গেছি—এর মধ্যে যাবে কোথায় ?

হীরক—তিনি বাইরে গেলেন এইমাত্র।

শিবশংকর—বাইরে গেলেন ? —কার সঙ্গে ? আমি থাকতে বল্লাম, রায় বাহাদুর আসছেন জানে—গেল কোথায় ?

হীরক—আলজেরিয়ার ব্যাপারে কোথায় যেন গেলেন। একটা গাড়ী এলো—তারপর···

শিবশংকর—আলজেরিয়া, গাড়ী! সর্ব্বনাশ—নিশ্চয়ই পালিয়েছে। মিটিং করছে, মিছিল করছে, বিয়েতে মত নেই—এইবার সব বুঝতে পেরেছি। ছেলেমেয়েকে একসঙ্গে পড়তে দিলে এ যে হতেই হবে। ড্রাইভার, গাড়ী বার কর। যেমন করে হোক ধরতেই হবে। তুমি পরে এসো হীরক।

ত্রস্তপদে নিষ্ক্রান্ত।
হীরক দাঁড়িয়ে রইল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

একই দিন অপরাহ্ন। সদানন্দের বাড়ীর বাইরের দিকের Anthropological Society-র অফিস ঘর। আলমারিতে ও র‍্যাকে কিছু কিছু Specimen রয়েছে। দেওয়ালে কয়েকখানা চার্ট টাঙানো। একটা আরাম চৌকিতে হেলান দিয়ে সদানন্দ, তাঁর ছাত্র সমরকে ডিক্টেশন দিচ্ছেন। এই ষাট বছরের অধ্যাপকের চোখে মুখে শিশুর সারল্য ও যুবকের উৎসাহ। পরণে সাদাসিদে ঘরোয়া পোষাক।

সদানন্দ—লেখো—পরস্পরের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি ছাড়া মানুষের পক্ষে একদিনও বাঁচা সম্ভব নয়। জীবন ধারনের আদিম উপকরণ উৎপাদনেও প্রয়োজন ঐক্যের। ঐক্য ও স্বাতন্ত্র্য এ দুয়ের সুসমন্বয়ে সমাজ-জীবন গড়ে ওঠে। শুধু ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে বড় করে দেখলে আমরা নিশ্চয়ই ভুল করবো।

(নিখিলেশের প্রবেশ) ২৫ বছর বয়স।
পরণে পায়জামা পাঞ্জাবী।

নিখিলেশ—স্যার!

সদানন্দ—(ড্রয়ার থেকে একটা কাগজ বের করে)—হ্যাঁ, তোমার লেখাটা পড়লাম। মোটামুটি তোমার বক্তব্য ঠিকই বলেছ। তবে যুক্তির থেকে আবেগের প্রাবল্যই যেন বেশি হয়েছে। আর এই ব্যক্তিগত আক্রমণ—নানা ওটা আমি ঠিক বরদাস্ত করতে পারি না। যুক্তির অবতারণা করে দেখিয়ে দাও যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের নামে এরা স্বৈরাচার প্রচার করছেন। ব্যক্তির কাছে তার সহজাত প্রবৃত্তির প্রেরণার চেয়ে সামাজিক মূল্যবোধ যে অনেক দামী, সেটা মনো-বিজ্ঞানের নজীর দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

নিখিলেশ—তাতে কী কোন লাভ হবে? এদের আসল উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পেরেছি একটা ফাইল আমার হাতে এসে পড়াতে। বিদেশী মূলধনের অংশীদার হয়ে দু'একটা Industryতে একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করতে চান এরা। Private Sector-এর অনুকূলে জনমত গঠনে এরা কাজে লাগাচ্ছেন এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য লীগকে।

সদানন্দ—(একটু বিস্মিত) বলো কী? আমার ধারনাটা তাহলে একেবারে মিথ্যে নয়?

নিখিল—না স্যার, বরং একটু বেশি সত্যি। আপনি ঠিকই বলেছেন ব্যবসার মনোপলি রক্ষার প্রয়োজনে এঁরা সব কিছু করতে প্রস্তুত। আর্মিকে পর্যন্ত হাত করবার জন্যে এঁরা অজস্র টাকা ঢালছেন।

সদানন্দ—দরকার হলে যাতে রাষ্ট্রযন্ত্র হাতে করতে পারে। কিন্তু এত টাকা আসছে কোথা থেকে?

নিখিল—ওই ফাইলেই তার আভাস রয়েছে স্যার। দেশের অনেক পুঁজিপতি লীগের জন্যে টাকা তো ঢালছেনই—তা' ছাড়া বাইরে থেকে নানা অবৈধ উপায়ে এঁরা টাকা আমদানী করছেন। এমন কী Ku-Klux-Klan এর পদ্ধতিতে এঁরা গুণ্ডাদেরও Organise করার চেষ্টায় আছেন। John, Birch Society-র মতো বিদেশী সংস্থার সঙ্গে এঁদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের প্রমাণ ওই কাগজে পেয়েছি।

সদানন্দ—(বেশ উত্তেজিত বোধ হোল তাঁকে) তুমি এতোদিন এসব কথা আমায় বলোনি কেন?

নিখিল—এতদিন আমি ঠিক বুঝিনি স্যার। এখন এঁদের কৌশল বুঝতে পারছি। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র বিপন্ন মানে ব্যক্তিগত মালিকানা বিপন্ন—বুঝতে পেরেই পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিয়েছি।

সদানন্দ—এ কৌশল অন্যদেশে অনেকদিন থেকেই চালু। কিন্তু আমাদের দেশে এটা অভিনব বটে। না, না, তুমি যা' বল্‌লে এ' বড় ভয়ানক কথা। আমাদের আরও বেশি তৎপর হতে হবে।

নিখিল—কিন্তু আপনার শরীর তো ভালো যাচ্ছেনা—আপনার বিশ্রাম চাই। সুরেশ্বর কোম্পানিকে শায়েস্তা করার মতো অস্ত্র আমার হাতে এসে গেছে। ও আমরাই পারবো।

সদানন্দ—যতোসব ছেলে মানুষী। শরীর আমার ঠিকই আছে। এ লড়াই তো শুধু সুরেশ্বরের সঙ্গে নয়—একজন ব্যক্তি বা একটা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও নয়। এ লড়াই প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারার বিরুদ্ধে। আমাকেও নামতে হবে বৈকি। বিশেষ করে এদের গায়ে যখন মনোবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের লেবেল দেওয়া হচ্ছে।

নিখিল—স্যার, এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য লীগের জালে ধরা পড়েছেন অনেক সাহিত্যিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিকের দল। তাদের সকলের মনোবৃত্তি আমি ঠিক বুঝতে পারিনা।

সদানন্দ—জানি। মুস্কিল করেছে তো ওরা। ওই সব বিখ্যাত পণ্ডিতের দল। বেনিয়াবাদী সুরেশ্বরকে মানুষ হয়তো ভুল বুঝবে না। কিন্তু শিবশংকরের মতো লোককে ভুল বোঝারই সম্ভাবনা।

নিখিল—প্রফেসর সান্যালকে যদি আপনি বুঝিয়ে বলেন সব কথা, তা' হলে বোধহয় কাজ হয়।

সদানন্দ—কিছু কাজ হবে না। বরঞ্চ মনে করবে আমি ওর সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হয়েছি। দেখলে না—সেদিন সেমিনারে তর্কে না পেরে ক্ষেপে বেরিয়ে এলো। খুব বড় দরের আঘাত না পেলে ওর ফ্রয়েডিয়ান অবসেসন যাবে না। কিন্তু নিখিলেশ, খুব সাবধানে তোমায় এগুতে হবে। পলিটিক্স হয়তো আমি ভাল বুঝিনা—তবে ওই ফাইলের জন্য তোমার জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হতে পারে মনে রেখো।

নিখিলেশ—সে সম্বন্ধে আমি সজাগ আছি। এখন যাচ্ছি। আফ্রিকার নেতাদের তদারকের ভার আমার ওপর। আমি ভাবছিলাম এই সব Trustee-দের হাতেই আপনি আপনার যথাসর্বস্ব তুলে দিয়েছেন। এঁরাই তো এখন Anthropological Institute-এর কর্তা।

সদানন্দ—তা' নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না। তুমি যাও।

(নিখিলেশ নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলো। সদানন্দ Dictation দিতে সুরু করলেন।)

সদানন্দ—হ্যাঁ, লেখো—'মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের এই আবিষ্কার নিঃসংশয়রূপে প্রমাণ করেছে যে মানব-চৈতন্যের উন্মেষ বস্তু থেকে। মানুষের উচ্চ মস্তিষ্ক—মানে cortex বস্তুরই এক বিচিত্র-বিন্যাস। বিশেষ অবস্থায় এই মস্তিষ্কই চৈতন্যের জনক।

(হীরকের প্রবেশ)

এই যে হীরক—এসো।

হীরক—আজকে আমার রিসার্চ স্কীমটা নিয়ে আলোচনার কথা ছিল। হয়তো একটু আগে এসে পড়েছি।

সদানন্দ—আহা তা' হোক। স্কীমটা খুবই interesting—কিন্তু আমার বিবেচনায় ও ধরনের রিসার্চের কোন প্রয়োজন নেই।

হীরক—আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, স্যার।

সদানন্দ—আদিবাসীদের মস্তিষ্কের দৈন্য তোমার electro-encephalogram-এ ধরা পড়বে কিনা জানি না। যদি ধরাই পড়ে—সেটা দিয়ে কী প্রমাণ করতে হবে?

হীরক—ঠিক কিছু প্রমাণ করতে হবে, ও-কথা আমি ভাবিনি।

সদানন্দ—আমার মনে হয় যাঁরা তোমার এই রিসার্চের খরচা জোগাচ্ছেন, তাঁরা ঠিক ভেবে রেখেছেন। জেম্‌স্‌-ফ্রয়েডের 'স্বভাবগত দৈন্য' থিওরি—এর দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা হবে। আদিবাসীদের দৈন্য যদি

কিছু থাকে, তাদের স্বভাবের দোষে নয়, প্রকৃতির জন্যে নয়—তোমার আমার অবহেলার জন্যে।

হীরক—যাদের অবহেলা করছি না—সেই সব সভ্য মানুষের মধ্যেও এত ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখ্‌তে পাই কেন?

সদানন্দ—কারণ তোমার সভ্যতার মধ্যেই ত্রুটি রয়ে গেছে। আমাদের এই সভ্যতা বঞ্চনার সভ্যতা, রেষারেষী-হানাহানির সভ্যতা।

হীরক—কিন্তু এই স্বভাব-দৈন্যতত্ত্বের প্রচারে ওদের স্বার্থটা কী—আমি ঠিক ধরতে পারছি না স্যার।

সদানন্দ—শোষণকে—অন্যায়কে বৈধতার রবার স্ট্যাম্প মারা। আমেরিকার একদল লোক আজকাল রুজভেল্টকেও Un-American বলছে। তাঁর অপরাধ—তিনি ওদের দেশের স্কাই-স্ক্রেপার তৈরির কংক্রিট মিক্‌শ্চারে নিগ্রো-শোণিতের অংশ কমাতে বলেছেন। আফ্রিকার পঞ্চাশলক্ষ সাদা মানুষ কুড়ি কোটি কালো মানুষের অছিগিরি করছে। হিটলারের আর্যশোণিত-তত্ত্ব তো তোমার অজানা নয়।

হীরক—কিন্তু আমাদের দেশ তো আমেরিকা-আফ্রিকা নয়।

সদানন্দ—জানো না, আমাদের ধনকুবেররা য়ুরোপ-আমেরিকার সাদা মালিকদের ছোটতরফ হয়ে উঠ্‌ছেন। আর আমাদের সনাতন সভ্যতায় শোষণ কিছু কম ছিল তুমি মনে করো নাকি? যজ্ঞের হবি জোটাতে অনার্যদের দোহন করতেই হোত। একদল চিরকাল ছোট থাকবেই—আর প্রভুদের সেবা করবেই—এই নাকি নিয়ম। আগে চল্‌তো ভগবানের দোহাই, আজ দরকার বিজ্ঞানের নজির। তাই তোমাকে নিয়ে সূর্যনারায়ণ-সুরেশ্বরদের এত আগ্রহ।

হীরক—ব্যাপারটা বড় জটিল মনে হচ্ছে, স্যার।

সদানন্দ—চোখ কান মেলে চলো—তা' হলে আর জটিল মনে হবে না। সুরেশবাবুদের আসল উদ্দেশ্য জন-সাধারণকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা। লিমিটেড ডেমোক্রেসি চালু করা। তারই প্রথম ধাপে তোমার ওই আদিবাসী—মানে নীচু তলার লোকদের শিক্ষা গ্রহণেরই ক্ষমতা নেই—এ প্রচারটা বিশেষ দরকার।

হীরক—কিন্তু ব্যবসায়ীরা তো প্রথমে চায় লাভ। সুরেশ্বর-বাবুদের এতে লাভটা কী হচ্ছে?

সদানন্দ—লাভ মানেই ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বাড়া নয়। শোষণ-তত্ত্বকে চালু করতে অনেক খরচই এঁরা করেন—সেটা হল capital investment! যাকে বলে মূলধন বিনিয়োগ। নীচের তলার লোকদের চৈতন্য বাড়লে তাদের শোষণ করাই যে মুস্কিল হবে।

হীরক—খানিকটা যেন বুঝতে পারছি। আর একটু ভেবে দেখতে হবে। এখন চলি, স্যার।

[প্রস্থান]

সদানন্দ—[Dictation দিতে লাগলেন] হ্যাঁ লেখো—যতদিন অল্প সংখ্যক লোক বেশির ভাগ লোকের ওপর শোষণের জন্য আধিপত্য করবে, ততদিন মানব-চৈতন্যকে অজ্ঞেয়, অপ্রমেয়, অথবা ফ্রয়েডিয় মতে অচেতন জৈবপ্রেরণা দ্বারা পরিচালিত—এরকম একটা কিছু প্রমাণ করার জন্য তারা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করবে। চৈতন্যের থেকে অবচেতনার প্রভাব বেশি—জ্ঞানের থেকে অজ্ঞানতার শক্তি বেশি, শুভ সামাজিক বুদ্ধির চেয়ে অন্ধ আবেগ বেশি সক্রিয়—এ কথা বলার অর্থ পশু শক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া। আর সমাজের শোষণ-পীড়নকে অবশ্যম্ভাবী বলে মেনে নেওয়া। ব্যক্তিস্বার্থে অন্ধ না হলে এ ধরনের হীন ও জঘন্য প্রচার কেউ করতে পারে না।

[সুখময় ও কেদার শর্মার প্রবেশ]

সদানন্দ—এই যে সুখময়, কী খবর? এঁকে তো চিনলাম না— (সমর কাগজপত্র গুটিয়ে বেরিয়ে গেল)

সুখময়—উনি বিখ্যাত লেখক কেদার শর্মা।

সদানন্দ—বসুন, বসুন—কী সৌভাগ্য, সৌভাগ্য! তা' ব্যাপার কী বলুন তো?

কেদার—দেখুন, আমার একটা লেখায় কতকগুলো নৃতত্ত্ব আর সমাজতত্ত্বের data দরকার। তাই ভাবছিলাম

আপনি যদি সাহায্য করেন। সুখময় আপনার এখানেই আসছিল—তাই ওর সঙ্গ নিলাম।

সদানন্দ—বেশ বেশ! কী ভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?

কেদার—আগে একটু ভূমিকা দরকার। দেখুন, আমার মনে হয়—জ্ঞান বুদ্ধি যতই বাড়ছে মানুষ ততই বিভ্রান্ত হচ্ছে। ভাব্‌ছে, বুঝি যন্ত্র দিয়ে মোক্ষ লাভ হবে। দেশে দেশে চলেছে যন্ত্রশক্তির প্রতিযোগিতা। আমরা—ভারতীয়েরা এই দানবীয় নেশায় মাতবো না। মানুষের ব্যক্তিত্বকে পিষ্ট হতে দেব না যন্ত্রদানবের রথের চাকায়। জগৎ বদলালেও ভারতের আত্মা বদলাবে না। আমার নায়ক বিষ্ণুদত্ত তাই হাজার ওয়াটের জ্ঞানের আলো নিভিয়ে স্মরণ নিলো শেষ পর্যন্ত নিরন্ধ্র গুহার অন্ধকারে।

সদানন্দ—পালিয়ে গিয়ে পরিবর্তন আটকাবেন কী করে?

কেদার—পালাচ্ছি না। অস্বীকার করছি যন্ত্রকে আর আর এ যুগের যান্ত্রিকজ্ঞানকে। যন্ত্র নয় মন্ত্র। বুঝলেন—বুদ্ধি নয় বোধি। স্থর-রিয়ালিজম্—এক্সিস-টেনসিয়ালিজমের কাজ নয়। শুধু খাঁটি সাত্ত্বিক পদ্ধতিতে আত্মার শুদ্ধতা রক্ষা সম্ভব। আমার নায়ক যন্ত্র দুনিয়ার এ সমস্যা মেটাতে চাইছে বাইরের আলো নিভিয়ে—তবেই জ্বলবে অন্তরের প্রজ্ঞাদীপ।

সদানন্দ—তা' এর মধ্যে নৃতত্ত্ব সমাজতত্ত্বের ঠাঁই কোথায়?

কেদার—আছে মশাই আছে! আমার এ লেখা ঠিক উপন্যাস নয়। বলতে পারেন মহাকালের ক্যানভাসে আঁকা এক বর্ণাঢ্য অবলেহ। আত্মার মহাশূন্য পরিক্রমার মহাকাব্য। বিষ্ণুদত্ত একটা বিমূর্ত গাণিতিক সঙ্কেত। আইনস্টাইনের স্থানকালে বাঁধা পড়ে না তার অবাধ সঞ্চারণ। আইনস্টাইন মাত্র লাইটের ভেলোসিটি জানতেন—কিন্তু আত্মার ভেলোসিটি কতো—তা জানতেন না বলেই তাঁর আপেক্ষিকতত্ত্ব একান্তই আপেক্ষিক। জড়বাদীদের জাড্য মাত্র।

সদানন্দ—কিন্তু আমি তো বুঝতে পারছি না আমাকে দিয়ে আপনার কী সাহায্য হবে?

কেদার—আগে ব্যাপারটা শুনুন। আমার এই উপন্যাসের কালের ব্যাপ্তি সেই প্যালিওলিথিক যুগ থেকে আজকের দিন পর্যন্ত। স্থানের ব্যাপ্তি সুমেরু, কুমেরু, ক্রীট, মিসর, মহেঞ্জোদরো, হরপ্পা থেকে আজকের মস্কো-নিউইয়র্ক-নিউ দিল্লী পর্যন্ত। নায়ক বিষ্ণুদত্ত কিন্তু অনাদি আর শাশ্বত। স্থান কালের বেড়ি দিয়ে তার আত্মাকে বাঁধা যায় না।

সদানন্দ—এখন আমাকে কী করতে হবে বলুন?

কেদার—আহা, বল্‌ছি শুনুন না। আমি দেখাতে চাই যে আমাদের সনাতন আর্যসভ্যতার কাছে সিন্ধু সভ্যতার পরাজয়ের কারণ আমাদের যন্ত্র ছিল না—আর ওরা যন্ত্র ব্যবহার করতো। ওরা নগর গড়েছিল। ঠিক সেই কারণেই ক্রীট হার মানলো গ্রীসের কাছে। আমি দেখাবো যন্ত্রের চেয়ে মন্ত্রের শক্তি বেশি। বুদ্ধির থেকে বোধির।

সদানন্দ—(একটু অসহিষ্ণু হয়ে) সে আপনি একশো বার দেখান। কিন্তু আমার কাছে ঠিক কী দরকার বুঝতে পারছি না।

কেদার—ক্রীট সভ্যতার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আর হরপ্পা যুগের যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে মোটামুটি idea না পেলে আমার নায়ককে মৌর্যযুগে নিয়ে আস্‌তে পারছি না। ফাঁকি দেওয়া আমার স্বভাব নয়। জানেন, বেদ-পুরান-উপনিষদ ইত্যাদি নিয়ে ছ'শো volume বই আমাকে পড়তে হয়েছে এর জন্যে—নোট নিতে হয়েছে তিনশো পৃষ্ঠা।

সদানন্দ—আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারলুম না। আমার সন্ধানে ও রকম পুঁথিপত্তর নেই।

কেদার—হুঁ হুঁ! আমিও তাই ভাবছিলাম। সুরেশ্বর বাবুকে বলিনি সুখময়—এ সব data এখানে মিলবে না। সাগরপারে যেতে হবে। তোমাদের ব্যক্তি

স্বাতন্ত্র্য লীগকে দরাজ হাতে খরচ করতে হবে। উপন্যাসের আঙ্গিকে এ যুগের মহাকাব্য। সামান্য কথা তো নয়। ছয় খণ্ডে সমাপ্ত—ডবল ক্রাউন, আট পেজী, তিরিশ ফর্মার এক এক খণ্ড। কম কথা তো নয়। অনেক মেহনত অনেক খরচ। আচ্ছা —চল্‌লাম। আপনার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ।

[প্রস্থান]

সদানন্দ—কী ব্যাপার বলোতো সুখময়? ভদ্রলোকের মাথায় কোন গোলমাল নেই তো?

সুখময়—আজ্ঞে না। উনিই তো আমাদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের মুখপাত্র।

সদানন্দ—তাই এই মুখবন্ধ আর যন্ত্রভীতি!

সুখময়—অনেকেই তো ভয় পাচ্ছেন। মানুষ ক্রমশ যন্ত্রের শিকার হ'তে চলেছে। একথা কী ঠিক নয় স্যার?

সদানন্দ—ঠিক উল্টো। মানুষ সত্যিকারের স্বাধীন হতে চলেছে। যন্ত্রের উন্নতি মানে কম মেহনতে বেশি উৎপাদন। যন্ত্রের উন্নতি মানে প্রকৃতির ওপর মানুষের আধিপত্য। যন্ত্রের উন্নতি হ'চ্ছে ভগীরথের শংখধ্বনি—ভাগীরথীকে মর্তে আনবার। ফ্রাঙ্কেন-স্টাইনের ভয় দেখিয়ে যন্ত্রকে নস্যাৎ করা যায়নি —যাবেও না। মানুষই তো যন্ত্র তৈরি করছে হে—যন্ত্র তো আর মানুষ তৈরি করছে না। ভয়টা কিসের? যাক, তোমার কী নিজের কোনও দরকার আছে?

সুখময়—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি বোধহয় আমাদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য লীগের নাম শুনেছেন?

সদানন্দ—[সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন]

সুখময়—সুরেশ্বরবাবু আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন ওই লীগ সম্বন্ধে দুটো কথা বলার জন্যে।

সদানন্দ—(চুপ করে রইলেন)

সুখময়—এই লীগের কর্ম পরিষদে উনি আপনাকে চান। বিশেষ করে বলে দিয়েছেন। অনুরোধ করে চিঠি ও পাঠিয়েছেন একটা। দেশের গণ্যমান্য সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক সবাই এতে যোগ দিয়েছেন।

সদানন্দ—এই কেদার শর্মাও বোধহয় তোমাদের লীগের একজন সভ্য?

সুখময়—হ্যাঁ। আরও অনেকে আছেন। কবি পারিজাত বসু। বিখ্যাত Economist অবসর প্রাপ্ত I.C.S.Dr. Sinha আছেন। আর সবার উপরে উপদেষ্টা হ'য়েছেন প্রফেসর সান্যাল। তাঁকে তো আপনি চেনেন।

সদানন্দ—দেখো সুখময়, তোমাদের ওই লীগ সম্বন্ধে আমার সামনে কোন কথা না তোলাই ভাল।

সুখময়—কেন স্যার?

সদানন্দ—আমি তোমাদের লীগের কাগজপত্তর কিছু পড়েছি—আর লেখাও কিছু কিছু দেখেছি।

সুখময়—আপনি কী আপত্তিজনক কিছু পেয়েছেন স্যার?

সদানন্দ—আপত্তিজনক ব'ললে খুব কমই বলা হবে। তোমার কেদার শর্মার কথা তো তার মুখেই শুনলাম। ডক্টর সিন্‌হার অর্থনীতি ও প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদনের--মানে private sector-এর গুণগান। আর শিবশঙ্করের মনস্তত্ত্ব তো সেই তোতাপাখীর বুলি! মানুষ বদলাবার নয়—সেখানে আমি কী করবো?

সুখময়—স্যার, আপনি আমাদের ভুল বুঝবেন না। আপনাকে দিয়ে সুরেশ্বর বাবু করাতে কিছু চাইছেন না। ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার ওপরে মাঝে মাঝে দু'একটা লেখা শুধু আমরা চাই।

সদানন্দ—(হেসে) লিখতে হবে তো ওই কেদার শর্মার মতো যে ভারতরাষ্ট্র যদি চাল-ডাল-নুন-তেলের কথা ভাবে, তবে ভারতীয় কৃষ্টির ঘটবে অধোগতি—তার ঐতিহ্যের হবে সমাধি!

সুখময়—না-না স্যার, এ আপনি কী বলছেন? আপনাকে উপদেশ দেবে এ স্পর্ধা কারুর নেই। তবে.....

সদানন্দ—তবে—সুরেশ্বরবাবুদের কাজে লাগা চাই আমার লেখা এই তো? না। তোমার অন্য কিছু বলবার থাকে তো বলো।

সুখময়—লেখাগুলোর জন্যে অবশ্যই উপযুক্ত পারিশ্রমিক আপনাকে দেওয়া হবে। আর লীগের প্রস্তাব আছে, যে আপনার অধীনে কাজ করবার জন্যে বছরে আরও দুটো ক'রে ফেলোশিপ ওঁরা দেবেন। অবশ্য এটা ইউনিভার্সিটির অনুমোদন সাপেক্ষ।

সদানন্দ—আর?

সুখময়—আর সুরেশ্বর বাবু জানেন সামান্য কয়েক হাজার টাকার জন্য আপনার 'মালতাদ্বীপের সমাজ-বিন্যাস' সংক্রান্ত গবেষণাটা আটকে আছে। আপনার অনুমতি পেলে—

সদানন্দ—ওই টাকাটা ওঁরা দিয়ে দিতে পারেন।

সুখময়—আপনি ঠিকই ধরেছেন স্যার।

সদানন্দ—আমার উত্তরটাও তুমি ঠিকই আঁচ করেছ নিশ্চয়ই?

সুখময়—আপনার মুখ থেকেই শোনা দরকার।

সদানন্দ—তোমার সব ক'টি প্রশ্নে আমার একই উত্তর —না।

সুখময়—অপরাধ নেবেন না—আমি দূত। সুরেশ্বর বাবু কী আশা করতে পারেন যে, আপনি লীগে প্রত্যক্ষভাবে যোগ না দিলেও পরোক্ষভাবে যতোটা পারেন তাঁদের সাহায্য করবেন—অন্তত নিরপেক্ষ থাকবেন।

সদানন্দ—তা' হলে সমাজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে

সুখময়—আপনার term তো শেষ হয়ে এলো। —extension-এ সুরেশ্বরবাবুর হাত অনেকখানি। আর তা' ছাড়া—আপনার Anthropological Institute-এর Audit Report নাকি ভাল নয়—

সদানন্দ—[গম্ভীর গলায়] সুখময়!—

সুখময়—মাপ করবেন স্যার। আগেই বলেছি—আমি দূত—অবধ্য।

সদানন্দ—প্রথমে দেখালে লোভ—তারপর দেখাচ্ছ ভয়। অথচ তুমি আমাকে অনেকদিন ধরেই চেনো। আচ্ছা, এখন যাও।

(সুখময়ের প্রস্থান)

(নিখিলেশের প্রবেশ)

নিখিলেশ—মিটিং খুব successful হবে মনে হচ্ছে। এখন থেকেই লোক জমতে সুরু করেছে। ঘানা, মিসর, এ্যালজেরিয়া, কম্বোডিয়া—সব delegate-রাই পৌঁছে গেছেন।

সদানন্দ—বেশ-বেশ—আমাকে তা' হলে তৈরি হতে হয়।

নিখিলেশ—এখনও ঘণ্টাখানেক সময় আছে। প্রফেসর ফয়েজকে মিউজিয়ামে রেখে এসেছি। উনি সবটা একবার ঘুরে দেখতে চাইছেন।

সদানন্দ—আহা—তা' আমাকে বলতে হয়। তুমি এখানে থাকো। আমি ওঁকে একবার সবটা ঘুরে দেখাই। বিশেষ করে—মালতা-দ্বীপের সংগ্রহগুলোতে ওঁর খুবই interest হবে আমি জানি। (সদানন্দের প্রবেশ, সীমার প্রস্থান, সঙ্গে কয়েকজন ছাত্রী)

নিখিলেশ—এই তো—এসে গেছেন। আপনার ছাত্রীরা সব তৈরি তো?

সীমা—তারা সব ঠিক আছে। আমারই ভয়ে গলা কাঁপছে। অভ্যেস নেই তো কিছু বলা—

নিখিলেশ—একবার এখানে rehearsal দিয়ে নেবেন নাকি?

সীমা—আপনার বক্তৃতার রিহার্সাল দিন বরঞ্চ—আমরা শুনি। সত্যি। কী করে না থেমে অমন বলে চলেন বলুন তো?

নিখিলেশ—ঈশ্বরদত্ত প্রতিভা! বক্তৃতা দেবার ক্ষমতাটা আমার innate—শুনবেন? গম্ভীর হন। হাসলে চলবে না।—'আহত সাম্রাজ্যবাদ অন্তিম নিঃশ্বাস ছাড়বার আগের মুহূর্তে হিংস্র অজগরের মতো পেঁচিয়ে ধরতে চায় তার লক্ষ্যভ্রষ্ট শিকারকে। মৃত্যু যন্ত্রণায় ক্ষিপ্ত হয়ে মাঝে মাঝে নিজেকেই দংশন করছে।... বন্ধুগণ!—এ হচ্ছে অজগরের মৃত্যুপাশ।

সীমা—[হাততালি] সত্যি—চমৎকার! একেবারে extempore!

নিখিলেশ—La-Tempore আফ্রিকা কবিতাটা আপনি বলে নিন না একবার।

সীমা—এখানে আরও ঘাবড়ে যাব।

নিখিলেশ—তা' হলেই হয়েছে। ওখানে যে কী হবে বুঝতেই পারছি।

সীমা—নানা—ভয় নেই! লোক হাসাবো না।

নিখিলেশ—মনে হচ্ছে আপনি ভুলেই গেছেন।

সীমা—কখ্খনো না—

নিখিলেশ—অন্ততঃ একটা stanza বলুন তা হলে।

সীমা—'উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে.....

(সমরের প্রবেশ)

সমর—নিখিলদা, স্যার কোথায়?

নিখিলেশ—কী ব্যাপার—তুমি ওরকম হাঁপাচ্ছ কেন?

সমর—পুরুলিয়া থেকে টেলিগ্রাম এসেছে—'Monia missing since last evening.'—চন্দরদা তার করেছেন। আমি দেখি স্যার কোথায়।

নিখিলেশ—দাঁড়াও। ওঁকে এখন জানিয়ে কাজ নেই। উনি ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠবেন। তার থেকে তুমি আজ রাতের ট্রেনে শম্ভু আর শিবুকে নিয়ে রওনা হয়ে যাও। এখুনি বাড়ী গিয়ে তৈরি হয়ে নাও। আমি ওদের দুজনকে মিটিং থেকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমি স্টেশনে তোমার সঙ্গে দেখা করছি।

সমর—মাস্টারমশাই যে একেবারে ভেঙে পড়বেন—কী হবে নিখিলদা?

নিখিলেশ—তুমি যে তার আগেই ভেঙে পড়লে। যাও।

(সমরের প্রস্থান)

সীমা—মনিয়া কে নিখিলবাবু?

নিখিলেশ—মাস্টারমশাইয়ের পালিতা কন্যা।

সীমা—তা' এখানে না থেকে পুরুলিয়ায় থাকেন কেন?

নিখিলেশ—সে অনেক কথা। আপনি ছেলে মানুষ, শুনে কাজ নেই।

সীমা—না, বল্‌তেই হবে—বলুন।

নিখিলেশ—আর আপনি এই missing newsটি broadcast করতে থাকুন।

সীমা—[গম্ভীর] গুজব ছড়ানো আমার পেশা নয়।

নিখিলেশ—আপনি মিছিমিছি রাগ করছেন। ঠাট্টাও বোঝেন না। আসলে মেয়েটির সম্বন্ধে প্রফেসরও বিশেষ কিছু জানেন না। ওই আদিবাসী মেয়েটিকে কয়েক বছর আগে উনি কুড়িয়ে পেয়েছিলেন ছোট নাগপুরের জঙ্গলে—মরণাপন্ন অবস্থায়। কোলে ছিল সদ্যজাত এক শিশু—তার রঙ কিন্তু কালো নয়। মেয়েটি কোন দিন মুখফুটে নিজের কথা কিছু বলেনি—আর উনিও কিছু জিজ্ঞাসা করেননি। পুরুলিয়ায় আদিবাসীদের জন্যে ওঁর একটা Home আছে। সেখানে রেখে মেয়ের মতো যত্নে উনি ওকে পালন করেছেন। অনুমান—ওই জামিলারই মতো করুণ বোধহয় ওর ইতিহাস।—যাক্, আপনি দিল্লীর টিকিট-গুলো করিয়ে রেখেছেন তো?

সীমা—[কোন কথা বললো না। ওর চোখমুখ বেদনার ছায়ায় ম্লান হয়ে এলো। এমনি সময় হন্তদন্ত হয়ে শিবশঙ্করের প্রবেশ]

শিবশঙ্কর—এই যে—ঠিক ধরেছি। পালাতে পারোনি এখনও? (নিখিলেশের দিকে তাকিয়ে)—ও। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম। তুমি এই প্রগতিবাদীদের খপ্পরে পড়েছ। University-তে ভর্তি হবার পেছনে তোমার এই অভিসন্ধি ছিল।

সীমা—আমি প্রফেসর ইবন ফয়েজের সভায় যাচ্ছি। সেখানে এ্যালজেরিয়া নিয়ে বক্তৃতা হবে।

শিবশঙ্কর—তুমি না আমার মেয়ে! পাগলামী ছেড়ে দাও সীমা। কোথায় এ্যালজেরিয়া আর কোথায় বাংলা দেশ! সেই অসভ্য কাফ্রীদের জন্যে তোমার দরদ উথলে উঠ্‌লো। আর বুড়ো বাপ তোমার কেউ নয়?

সীমা—(নিখিলেশকে) আপনি একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়ান—আমি আসছি।—(নিখিলের প্রস্থান)—বাবা, তুমি কী কাগজে পড়ো নি—কী উৎপীড়ন করছে ওরা?

জামিলার কথা তো সব কাগজেই বেরিয়েছে। অমনি হাজার হাজার কালো মেয়ের মর্যাদা নিয়ে চলেছে শ্বেত দস্তের খেলা। সব মেয়েরই তো এতে অপমান, বাবা। আর এমন কী-ই বা করেছি আমি? সামান্য কিছু চাঁদা তুলে দিয়েছি মাত্র।

শিবশঙ্কর—চাঁদাই বা তুলবে কেন? ওই কালো বর্বর কাফ্রীদের সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কী শুনি?

সীমা—তোমার পায়ে পড়ি বাবা—একটু আস্তে। কালো হলেই বর্বর হবে—তোমার এ কথা সবাই মানবে না। আর কালো না হই বাদামী তো আমি—তাই আমার গায়েও ফোস্কা প'ড়েছে!

শিবশঙ্কর—আমি শুনতে চাই না ওসব বাজে কথা। ভাবালুতার প্রশ্রয় আমি দেবো না। মেয়েদের কাজ বাইরে নয়—ঘরে। তুমি ঘরে ফিরবে—এখুনি, আমার সঙ্গে।

সীমা—(ধীরে ধীরে) তোমার তত্ত্বকথা শুনে শুনে আমার কান পচে গেছে। হাঁড়ি-হেঁসেল-ফিডিংবোতলের বাইরেও যে মেয়েদের একটা জগৎ আছে—তা তোমার জানা দরকার।

শিবশঙ্কর—এ্যাঁ? আমার জানা দরকার? আমাকে তুমি Feminine Psychology শেখাচ্ছ? তোমার জন্মদত্ত ভদ্র সংস্কার, আমার প্রতিদিনকার শিক্ষাদীক্ষা—সব মিথ্যে হয়ে গেল? ওই বাউণ্ডুলে ছোকরাদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে তোমার এতদূর অধঃপতন হয়েছে? নির্লজ্জ বেহায়া! তুমি বাপের সম্মান রেখে কথা বলতেও ভুলে গেছো?

সীমা—তুমিও ভুলে গেছো বাবা যে—ছেলে-মেয়েরা যখন বড় হয়, তাদের একটা ব্যক্তিত্ব, একটা নিজস্ব মতামত গড়ে ওঠে। আর সেই জায়গায় বারবার আঘাত করলে—তারাও একদিন সে আঘাত ফিরিয়ে দিতে পারে। (প্রস্থান)

শিবশঙ্কর—এ্যাঁ—কোথায় চল্‌লে? খবরদার নিখিল! তোমায় ইলোপমেন্টের চার্জে ফেলবো।— পুলিশ! পুলিশ!! (প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

কয়েকদিন পরের একটি অপরাহ্ন। সুরেশবাবুর বাড়ী।

[সুরেশ্বর একা দাঁড়িয়ে আছেন একখানা এশিয়ার মানচিত্রের সামনে। তাঁর চোখের সামনে মানচিত্রের রঙ ঘন ঘন বদলাচ্ছে।—কালো, সবুজ, নীল, লাল। সেণ্টারে দেওয়ালজোড়া ম্যাডোনার ছবি। পাশের ঘরে ঘন ঘন ফোন বাজছে আর সুখময়ের গলা শোনা যাচ্ছে— না, কথা হবে না তিনি অসুস্থ]

(টেলিফোনের রিসিভার হাতে সুখময়ের প্রবেশ)

সুখময়—টেলিফোন—

সুরেশ্বর—বলোনি, আমি অসুস্থ!

সুখময়—স্যার সূর্যনারায়ণ।

সুরেশ্বর—তা হলেও আমি অসুস্থ—যাও।

সুখময়—ডাঃ সেন ফোন করছিলেন, নিখিলেশকে নিয়ে এখানে আসছেন।

সুরেশ্বর—আচ্ছা যাও।

(সুখময়ের প্রস্থান। সুরেশ্বর ধীরে ধীরে এসে ম্যাডোনার ছবির সামনে দাঁড়ালেন মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার মানচিত্রের সামনে দাঁড়ালেন,

শৈলেনের প্রবেশ)

সুরেশ্বর—হুঁ, কী হোল শৈলেন? দেখা হয়েছে সম্পাদকের সঙ্গে?

শৈলেন—দেখা হয়েছে। ব্যবস্থাও সব করেছি।

সুরেশ্বর—টাকা খাওয়ার পরও ছাপলো যে ?

শৈলেন—ওঁর কোন দোষ নেই স্যার। উনি ছিলেন না। ওঁর assistant সব জানতো না। ভাবলো খুব scoop করেছি। কালই প্রতিবাদটা যাতে প্রথম পাতাতেই ছাপা হয় সে বন্দোবস্ত করে এসেছি।

সুরেশ্বর—প্রেষ্টনজীর খবর কী ? ম্যাকফারসন কী বললো ? জানো তো—বাজারেও খবর ভাল নয়।

শৈলেন—ও স্যার শেয়ার মার্কেটে জোয়ার ভাঁটা লেগেই ম্যাকফারসন আছে। ওতে দমবে না। তবে—প্রেষ্টনজী বোধহয় কোন বম্বেফার্মের হয়ে টোপ গিলেছেন। ম্যাকফারসন যতক্ষণ আমাদের হাতে, আমাদের কিছু এসে যায় না। [একটু থেমে] একটা খবর কিন্তু disappointing sir !

সুরেশ্বর—কী খবর ?

শৈলেন—সরকার নাকি দ্বিতীয় পরিকল্পনায় না হোক তৃতীয় পরিকল্পনায় ড্রাগ ইন্ডাস্ট্রিকে পাবলিক সেক্টরে আনবেই।

সুরেশ্বর—তোমাদের সরকার ততোদিনে মতিগতি বদলাতে বাধ্য হবে না।

শৈলেন—[একটু এগিয়ে গিয়ে নীচু গলায়] একটা কথা স্যার, Mcpherson ওদের হেড্ অফিসের কাগজগুলো, আর ওঁর হাতে লেখা নোটগুলো ফেরৎ চাইছেন। বলছিলেন—কোন রকমে একটু leak করলে আর রক্ষে নেই। দুজনেরই সর্বনাশ ! ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য লীগের সঙ্গে ওঁদের যোগাযোগের কোনও প্রমাণই যেন কাগজপত্রে না থাকে।

সুরেশ্বর—[শ্লেষের হাসি] কেন, ম্যাকফারসন্ কী আমাদের পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না ?

শৈলেন—তা নয়। ওদের Information Service নাকি খবর পেয়েছে ব্যাপারটা খুব গোপন নেই। ওদের সন্দেহ, সদানন্দবাবুর বন্ধু একজন বামপন্থী এম. পি র হাতে আমাদের কিছু কাগজপত্র গিয়ে পড়েছে।

সুরেশ্বর—(অসহিষ্ণুভাবে) সদানন্দের ব্যবস্থা কী করলে ? লীগকে বাঁচাতে হলে ওকে অবিলম্বে চুপ করানো চাই। ফাইলটা ওর হাতে পড়ে থাকলে ফেরৎ পাবার কোন আশা নেই।

শৈলেন—ব্যবস্থা আপনার নির্দেশ মতো সবই করা হয়েছে। পুরুলিয়ার কেসটা ভালো ভাবেই সাজানো হয়েছে। দুটো ওয়ারেন্টই নিয়ে পুলিশ অভ্যর্থনার জন্য তৈরি। বাড়ীটা এখন আমাদের possession-এ। গেটে দারোয়ান বসেছে। ওর প্রবেশ নিষেধ। তবে —সদানন্দবাবুর বাড়ীতে ফাইল নেই। তন্ন তন্ন করে সবকিছু আমি নিজে খুঁজেছি। উনি আজই ব্যাংগালোর থেকে ফিরেছেন। ফিরেই দরবার করতে আসতে বাধ্য হবেন।

সুরেশ্বর—আমিও তাই ভাবছি। মিউজিয়াম ওর প্রাণ। অন্ততঃ মিউজিয়ামের specimen গুলোর জন্যে ওকে আমার কাছে আসতেই হবে।

শৈলেন—কিন্তু সলিসিটর বলছিলেন শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টে কী দাঁড়াবে বলা যায় না।

সুরেশ্বর—শেষের কথা শেষে ভাবা যাবে। সদানন্দ আদালতে যাবে না। অন্ততঃ যাতে না যায় সে ব্যবস্থা আমি করছি। আপাততঃ তুমি দেশদূত অফিসে যাও। ফাইলের জন্যে আরও বিশ হাজার—দরকার হলে আরও বেশি হাঁকবে। তবে খুব বেশি আগ্রহ দেখাবে না।—নিখিলেশকে আমি দেখেছি।

(শৈলেন ঘাড় নেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। সুরেশ্বর চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লেন।)

(সুখময়ের প্রবেশ)

সুখময়—Sir ! এসেছেন !

সুরেশ্বর—(চমকে উঠে) —কে ?

সুখময়—সদানন্দবাবু।

সুরেশ্বর—সসম্মানে নিয়ে এস।

(সুখময়ের প্রস্থান)

সুরেশ্বর—আমি জানতাম ও আসবে।

(সদানন্দ ঢুকলেন। হাতে সুটকেশ, বগলে পোর্ট ফোলিও। অত্যন্ত শ্রান্ত চেহারা)—আসুন-আসুন—সোজা ষ্টেশন থেকেই বুঝি? আমার 'তার' তাহ'লে পেয়েছেন?

সদানন্দ—হ্যাঁ, ষ্টেশন থেকেই বাড়ী। বাড়ীতে ঢুকতে না পেরে আপনার কাছে। কী ব্যাপার বলুন তো?

সুরেশ্বর—ব্যাপারটা একটু unpleasant! ওঁরা—বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট স্যার সূর্যনারায়ণ কিছুতেই ছাড়লেন না। Extra-ordinary meeting করে special resolution নিয়ে এলেন। আপনার ব্যাঙ্গালোরের ঠিকানায় meeting এর notice পাঠানো হয়েছিল।

সদানন্দ—আমি পাইনি। বোধহয় আমি তখন সেই নতুন excavation-টার site-এ ছিলাম। special resolution-টা কী আনলেন শুনি?

সুরেশ্বর—আমাকে দোষ দেবেন না। Trustee-দের মধ্যে আমিই একমাত্র বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছি। কিন্তু আমি একা কিছুই করতে পারিনি। সবাই একেবারে মহাখাপ্পা। Special resolution-এ বলা হয়েছে যে আপনি আর ওই বাড়ীর কোন অংশ residential purpose-এ ব্যবহার করতে পারবেন না।

সদানন্দ—আমার অপরাধ?

সুরেশ্বর—যতসব ছেলেমানুষী। স্বাধীন হই আর যাই হই, আমাদের দাস মনোভাব আর গেল না। স্যার সূর্যনারায়ণ আর প্রফেসার সান্যালের অভিযোগ যে আপনি Anthropological Research Institute-এর অফিস ঘর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছেন। ওই—কে একজন এ্যালজেরিয়ান সৈনিক এসে একরাত্রি ছিল না? আসলে বাড়ীটা আপনিই দান করেছিলেন।—তা'—যতদিন না একটা বন্দোবস্ত হচ্ছে—আপনি আমার এখানেই থেকে যান।

সদানন্দ—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি চলি—

(প্রস্থানোদ্যত)

সুরেশ্বর—ওহো—আর একটা কথা আপনাকে বলা হয়নি। ওরা ডিরেক্টরের পদ থেকেও সাময়িকভাবে আপনাকে বরখাস্ত করেছে।

সদানন্দ—না করলে আমিই পদত্যাগপত্র পাঠাতাম।

(আবার ফিরলেন)

সুরেশ্বর—[অনুনয়ের সুরে] আপনার জন্যে আমি কী করতে পারি বলুন সদানন্দবাবু? মিউজিয়ামের specimen-এর অনেকগুলো আপনার ব্যক্তিগত সংগ্রহ। সেগুলো আপনি নিশ্চয়ই দাবী করতে পারেন।

সদানন্দ—[এইবার মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠলো] ওগুলো আমায় প্রাণের জিনিষ।—না থাক, দরকার নেই। Specimen ছাড়া ও বাড়ীটার দাম কিছু নেই। ওগুলোও আমি দান করলাম।

সুরেশ্বর—[সহানুভূতির সুরে] আরও দুটো বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেছে। আপনার বিরুদ্ধে একটা চার্জে বলা হয়েছে—আপনি নাকি হিসেব পত্রের অনেক গোলমাল করেছেন। আর.....

(একটু ইতস্ততঃ)

সদানন্দ—প্রথম চার্জটির আভাস আপনার সুখময় আমাকে আগেই দিয়েছিল। দ্বিতীয়টা কী শুনি?

সুরেশ্বর—দেখুন—বলতে সংকোচ হচ্ছে।...

(আরও বেশি ইতস্ততঃ)

সদানন্দ—তা'হলে নাই বল্লেন—আমি চললাম।

সুরেশ্বর—শুনেই যান। মনিয়া বলে কোন মেয়েকে আপনি জানেন কী? পুরুলিয়ায় থাকে—

সদানন্দ—হ্যাঁ জানি।

সুরেশ্বর—মাসে মাসে তার ও তার ছেলের জন্যে আপনি টাকা পাঠাতেন?

সদানন্দ—তারপর?

সুরেশ্বর—দেখুন সদানন্দবাবু, আমরা ব্যবসা করে খাই—অনেক নোঙরা জিনিস ঘাঁটাঘাঁটি করি। কিন্তু আপনার মতো লোকের পক্ষে এটা কী করে সম্ভব হোল—আমি এখনও বুঝতে পারছি না। ছেলেটা নাকি বলেছে—সে সদানন্দ রায়ের পুত্র।

সদানন্দ—[স্তম্ভিত]

সুরেশ্বর—আমরা কিন্তু জানতাম সদানন্দ রায় চিরকুমার। [ড্রয়ার খুলে একটা ছবি বের করে] এই দেখুন—মনিয়া

আর তার ছেলের ফটো। মাঝখানে দাঁড়িয়ে আপনি —ঠিক বল্‌ছি না ?

(সদানন্দ ছবিটা দেখতে লাগলেন চিন্তিতভাবে)

সুরেশ্বর—[কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ] অবশ্য প্রমাণপত্রগুলো সবই আমার কাছে। কোন member এর details জানেন না। [সদানন্দ তখনও ছবিটার দিকে তাকিয়ে চিন্তা করছেন]—আসুন একটা deal করা যাক আপনার সঙ্গে।

সদানন্দ—[সজাগ হয়ে] দুটো ছবিকে ঠিক মেলাতে পারেনি ফটোগ্রাফার। হ্যাঁ, ডিলের কথা কী বলছিলেন ?

সুরেশ্বর—[এগিয়ে এসে নীচু অথচ দৃঢ় গলায়] নিখিলেশ যে ফাইলটা আপনাকে দিয়েছে—সেটা কোন photo-stat copy না রেখে—আপনি ফেরৎ দেবেন। অবশ্য ফোটোষ্টাট সম্বন্ধে আপনার মুখের কথাই আমি বিশ্বাস করবো। তার বদলে এই resolution-গুলো আমরা withdraw করে নেবো। এমন কী committee দারুণ ভুল করেছিল এবং অনুতপ্ত—এই মর্মে আপনাকে চিঠিও একখানা দেবে। A fair deal. I believe !

সদানন্দ—হয়তো fair deal ! তবে আমি accept করতে পারছিনা সুরেশবাবু। মাপ করবেন !

সুরেশ্বর—[একটু বিচলিত] তা' হলে এই photo ও কাহিনী কোলকাতার অধিকাংশ কাগজে প্রকাশিত হবে। আদিবাসীদের সম্বন্ধে সদানন্দ রায়ের দরদের উৎসটা যে কোথায়—লোকে বুঝবে।

সদানন্দ—এতবড় মিথ্যে আপনি প্রচার করবেন—আর লোকে তাই বিশ্বাস করবে ! মিথ্যে অপবাদকে আমি ভয় পাই না, সুরেশবাবু !

সুরেশ্বর—ব্যাপারটা কোর্ট অবধি গড়াতে পারে। ভাল-বাসার লোভ দেখিয়ে যাকে ফুসলে এনেছিলেন—সেই এখন বেঁকে বসেছে।

সদানন্দ—মনিয়া আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে সাক্ষী দেবে—টাকার লোভে ? [অনেকক্ষণ ধরে হাসলেন] সুরেশ্বরবাবু ! মস্তিষ্ক আপনার উর্বর, ক্ষমতাও অসীম। তা' বলে সব কিছু কি করা সম্ভব ? না। তা' পারেন না।

সুরেশ্বর—But what about the deal ? কোর্টঘর নাই হলো। এমনি scandalটা প্রকাশ পেলে ছাত্রসমাজে কী আলোড়ন হবে ভেবে দেখেছেন কি ?

সদানন্দ—সময় মতো ভেবে দেখ্‌বো। এখন অনেক কাজ। (গমনোদ্যত)

সুরেশ্বর—ফাইলটা দেবেন না তা'হলে ! নিখিলেশকে দিয়ে আমাকে ব্ল্যাকমেল করাবেনই ঠিক করেছেন ?

সদানন্দ—[যেতে যেতে ফিরে তাকালেন] আপনাকে ব্ল্যাকমেল ? [হাসলেন] কয়লাকে আলকাতরা মাখালে কী আর বেশি কিছু কালো হয় ? তবে আপনাদের মতলবটা দেশের লোকের জানা দরকার।

সুরেশ্বর—Then let justice take its course ! শুনে যান সদানন্দবাবু ! আপনার নামে দুটো warrant নিয়ে পুলিশ বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। Institute-এর টাকা defalcation-এর চার্জে হয়তো জামিন পেলেও পেতে পারেন, কিন্তু মনিয়াকে সরিয়ে ফেলার চার্জে জামিন পাবেন কিনা সন্দেহ !

সদানন্দ—[বিস্মিত হয়ে কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারলেন না] মনিয়াকে সরিয়া ফেলা—তার অর্থ কি ?

সুরেশ্বর—অর্থ সোজা। মনিয়াকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তার মায়ের অভিযোগে পুরুলিয়ার পুলিশ আপনাকে arrest করতে এসেছে কোলকাতায়।

সদানন্দ—[পূর্ণ দৃষ্টিতে সুরেশ্বরের দিকে তাকালেন]—না, সত্যিই আপনার কেরামতি আছে। রকফেলারকেও ছাড়াতে পারতেন—তবে দিন কাল পালটেছে এই যা !

সুরেশ্বর—এখনও যদি রাজী হন আমার proposal-এ—

সদানন্দ—আমি নিজেই থানায় যাচ্ছি। আপনাদের কীর্ত্তি-কলাপের খবর অনেক দূর অব্‌দি পৌঁচেছে। শুধু সদানন্দ রায়ের মুখ চেপে ধরেই নিজেকে নিরাপদ ভাববেন না। (প্রস্থান)

[সুরেশ্বর ওর গমন পথের দিকে একদৃষ্টে খানিকটা তাকিয়ে রইলেন। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ম্যাপের সামনে গেলেন। বিড়বিড় করে বলতে লাগ্‌লেন—'কায়রো—বাগদাদ—দামাস্কাস—রেঙ্গুন…' বাইরের দিকথেকে অবিন্যস্ত বেশবাস শিবংকরের প্রবেশ। হাতে কতক গুলো কাগজ]

শিবশংকর—না সুরেশবাবু, এ সব resolution-এ আমি সই করতে পারবো না।

সুরেশ্বর—[অতি কষ্টে বিরক্তি দমন করলেন] কেন, কী হলো আবার? সদানন্দের বিরুদ্ধে চার্জ আনার ব্যাপারে আপনার উৎসাহই তো বেশি ছিল।

শিবশংকর—আমি ওকে হিংসে ছোটবেলা থেকেই করি। হ্যাঁ, এখনও I hate him from the core of my heart. কিন্তু তা' বলে—ওই মিথ্যে চার্জ?

সুরেশ্বর—মিথ্যে আপনি জান্‌লেন কী করে?

শিবশংকর—ওই মনিয়াকে আমি চিনি। ও সদানন্দের পালিতা কন্যা।

সুরেশ্বর—[একটু অপ্রস্তুত] হুঁ, বাইরে প্রচারটা সেই রকম। কিন্তু আপনি ফ্রয়েডিয় মনস্তত্ত্ববিদ হয়ে নারী-পুরুষের আসল সম্পর্কটা অস্বীকার করতে চান?

শিবশংকর—[উত্তেজিত] আপনি ফ্রয়েডকে কিছুই বোঝেন নি। আসল সম্পর্ক নির্জ্ঞান মনের ব্যাপার—তা' নিয়ে চার্জ তৈরি করা যায় না। আইন-আদালতও হয় না। আর ওই মনিয়ার ইতিহাসের আদ্যোপান্ত আমার জানা। অন্যের পাপের বোঝা সদানন্দকে বইতে হচ্ছে।

সুরেশ্বর—কিন্তু সীমাকে তো সদানন্দই বিগ্‌ড়েছে।—আপনার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়েছে। আপনার জীবনের একমাত্র অবলম্বন সীমা।

শিবশংকর—হ্যাঁ। দারুণ আঘাত দিয়েছে। But this is an ideological defeat! তাই ঠিক করেছি আরও জানতে হবে—আরও ভাব্‌তে হবে। সীমা চটকদারী প্রোপাগাণ্ডাতে ভোলবার মেয়ে নয়। মনে হচ্ছে আমারই কোথাও বোঝবার গলদ আছে। তাই ঠিক করেছি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য লীগে আর থাক্‌বো না। ডাকে আমার resignationটা পাঠিয়ে দিয়েছি।

সুরেশ্বর—[বিস্মিত] That's impossible! আপনি বোধহয় জানেন না প্রফেসর, এমন সব দলিল সদানন্দের হাতে আছে, যার জোরে ও আমাদের crush করে দিতে পারে। এখন দলে ভাঙন ধরলে—we are all doomed! Be with us professor.

শিবশংকর—না। বড় শ্রান্ত আমি।

সুরেশ্বর—দিনকতক বিশ্রাম নিন, সব ঠিক হয়ে যাবে। Resignation দেবার কী দরকার?

শিবশংকর—বিশ্বাসের মূল শিথিল হয়ে গেছে সুরেশবাবু। জৈবশক্তি দৈবশক্তির থেকে জোরালো আর কোন শক্তি আছে কিনা—ভেবে দেখ্‌তে হবে। কী যে ওরা বলে—জন-মানসের শক্তি না কী? নাঃ! আমি পারছি না সুরেশবাবু!

সুরেশ্বর—[উত্তেজিত] কিন্তু আপনি যে এ ব্যাপারে আমাদের প্রধান সাক্ষী। আপনার যাওয়া চলবে না।

শিবশংকর—আমায় যেতেই হবে। আমি বড় শ্রান্ত। আমায় যেতে দিন। (প্রস্থান)

সুরেশ্বর—দুর্বল—নিউরোটিক—নিউরোটিক!

(ঝানুমলের সঙ্গে সুখময়ের প্রবেশ)

ঝানুমল—বদ্রীনারায়ণজীর গোসা তো কম্‌ছে না বাবুজী!—সোকাল থেকে সেই যে দর পড়তে সুরু করলো—তো পড়েই যাচ্ছে। রোখা যাচ্ছে না। আপনার advice মতো কিনে তো যাচ্ছি। তবু রোখা যাচ্ছে না। কী নাকি সব কাগজে কেচ্ছা বেরিয়েছে—

সুরেশ্বর—তোমার কোন চিন্তা নেই। আমি সব ব্যবস্থা করছি। [সুখময়কে] সুখময়, রিচার্ডসনকে ফোন করেছিলে?

সুখময়—আজ্ঞে হ্যাঁ।

সুরেশ্বর—কী বল্‌লো রিচার্ডসন?

সুখময়—বল্‌লেন, অন্যান্য ডিরেক্টররা অমত করছেন। বিলেত থেকেও অনুমতি পাচ্ছেন না। আর ওভার-ড্রাফ্‌ট সম্ভব নয়।

সুরেশ্বর—আমায় ফোন দিলে না কেন?

সুখময়—উনি সময়ই দিলেন না—কেটে দিলেন লাইন। ম্যাগ্‌নাস কেমিক্যালের ওভারড্রাফ্‌টের confirmation-এর কথা তুলেছিলাম। উনি বললেন Sterling Company নিয়ে কোন চিন্তা নেই। তবে এই ধাক্কাটা যাক্‌, তারপর।

সুরেশ্বর—হুঁ। আচ্ছা, আমি দেখ্‌ছি। তুমি ঘাব্‌ড়িও না ঝানুমল। বাজার ফেরাতে বড় জোর দু'দিন। অনর্থক panic! আমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই

কেউ প্রমাণ করতে পারবে না। একখানা ফাইল থেকে কেন—একশোটা ফাইল থেকেও নয়!

সুখময়—স্যার সূর্যনারায়ণ আবার পদত্যাগের কথাটা মনে করিয়ে দিলেন।

সুরেশ্বর—বলে দিও—তাঁকে ছাড়াই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য লীগ চল্‌তে পারবে। আর ম্যাগ্‌নাস্ কোম্পানী, ভেনাস কোম্পানিতে আমাদের যত শেয়ার আছে—সমস্ত স্ক্রীপ ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দাও। ঝানুমল তুমি কিনে যাও। আরও একুশ লাখ টাকার মতো চেক কাট্‌তে পারো। বাজার উঠ বেই।

ঝানুমল—সবই বাবা বদ্রীনারায়ণের ইচ্ছা। চোল্‌ছি আমি বাজার। (ঝানুমলের প্রস্থান)

সুখময়—স্যার—ওগুলো তো ডুপ্লিকেট। অরিজিনাল সব স্ক্রীপই তো রিচার্ডসনের ব্যাঙ্কে।

সুরেশ্বর—এগুলো পাঠাবে কন্টিনেন্টাল ব্যাঙ্কে। ডি. মেলোকে এক লাখ টাকা খাইয়েছি। আরে এ তো দু'দিনের ব্যাপার! আমাদের শেয়ারের দর চড়ে গেলেই স্ক্রীপগুলো নিয়ে আস্‌বে। Transfer তো আর হচ্ছে না।

(সুরেশ্বর ও সুখময় ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রস্থান করলো। ডাঃ সেন ও নিখিলেশের প্রবেশ।)

নিখিলেশ—না, না—এ যে ভাবাই যায় না ডাঃ সেন! আপনি ছাড়া আর কেউ এ কথা বললে তার অভিসন্ধি আছে বলে মনে করতাম। এখানে আর কোনদিন আস্‌বো না ভেবেছিলাম। অথচ, অথচ আপনার কথায় আবার আস্‌তে হলো। আপনাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করি—তবুও বিশ্বাস করতে বাধ্‌ছে। আমি প্রমাণ চাই ডাঃ সেন।

ডাঃ সেন—[একটা চেয়ারে বসে দম নিলেন]—একটু ঠাণ্ডা হও বাবা—বোসো—একটু দম নাও।

নিখিলেশ—[পায়চারী করতে করতে] আমি নিখিলেশ রায় নই—শঙ্কর রায় আমার বাবা নন—পালন করেছেন মাত্র:—তাও এই সুরেশ্বরবাবুর টাকায়। আমার দেহ পুষ্ট হয়েছে এমন একজন লোকের টাকায়—যাকে আমি সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি!! বাঃ, চমৎকার নাটক!

ডাঃ সেন—সুরেশকে তোমরা যতটা খারাপ মনে করো—আসলে সে তত খারাপ নয়। ব্যবসায়ীদের খানিকটা এদিক ওদিক করতেই হয়।

নিখিলেশ—তা' হলে আপনি জানেন না ডাঃ সেন। সুরেশ্বরবাবুদের মতলব দেশকে বিকিয়ে দেওয়া। বিদেশী মূলধনের নাগপাশে জড়িয়ে ওঁরা আমাদের ডুবিয়ে দিতে চান। নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্যে ওঁরা না করতে পারেন এমন কাজ নেই। আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, শিল্পের জাতীয়করণ, সহ-অবস্থান, পঞ্চশীল নীতি—সব কিছুকে বানচাল করবার ষড়যন্ত্র করছেন ওঁরা।—দেশদ্রোহী না হয়েও ব্যবসা করা যায়।

ডাঃ সেন—কিন্তু এত যে ওর দান—শিক্ষা-সংস্কৃতি-বিজ্ঞানের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছে—হাজার হাজার বেকারের অন্ন সংস্থান হচ্ছে,—এগুলোকে তুমি উড়িয়ে দিতে চাও নাকি?

নিখিলেশ—মহানুভব ভারতসম্রাট আমাদের সুবিধার জন্যে রেল রাস্তাঘাট, পোস্ট অফিস করেছিলেন, পুলিস রেখেছিলেন আমাদের নিরাপত্তার জন্যে, চোর-ডাকাত তাড়াতে,—এ কথা একদিন জোর গলায় ইংরেজরা বলতো। আপনি ও-কথা নিশ্চয়ই মানতেন না। ওদের মতলব বুঝতেন। তেমনি জানবেন—এই আধুনিক সম্রাটদের এ-সব বদান্যতার পেছনে আছে কূটনীতি আর মতলব।

ডাঃ সেন—কিন্তু তোমার প্রতি ওর স্নেহ আন্তরিক।

নিখিলেশ—সেখানেও মতলব আছে। মতলব ছাড়া, হিসেব ছাড়া ওঁরা এক পা-ও চলেন না।

ডাঃ সেন—এ তোমার বাড়াবাড়ি। ওঁর বন্ধু শঙ্কর রায়কে নিজের ছেলে বলে তোমাকে সমাজে চালু করতে অনুরোধ করেছিল। এর মধ্যে যে কী মতলব থাকতে পারে আমি বুঝি না। প্রতি মাসে দু'শো করে টাকা ও দিয়ে এসেছে শঙ্করবাবুকে। শঙ্করবাবু মারা যাবার পরই তোমাকে অতবড় চাকরীটা দিলো—অথচ বল্‌তে

তোমার কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। এর মধ্যে মতলব দেখলে তুমি কোথায়? আমি তো এ-সবের মধ্যে দেখছি তোমার প্রতি ওর আন্তরিক স্নেহের প্রকাশ।

নিখিলেশ—(বিচলিত) আন্তরিক স্নেহের প্রকাশ! আমায় প্রমাণ দেখাবেন বলেছিলেন?

ডাঃ সেন—একটু ঠাণ্ডা হয়ে বসো বাবা—আমি আসছি। প্রমাণ নিজে না পেয়ে কী এত বড় কথাটা তোমাকে বল্‌তে পেরেছি?

[ডাঃ সেনের প্রস্থান]

[নিখিলেশ ঘড়ি দেখলো। একটু চঞ্চল হয়ে উঠলো। ফোন করলো সমিতির অফিসে। "হ্যালো···কে সমর? হ্যাঁ-হ্যাঁ—আমি নিখিলেশ। দেখো, আমি এক কাজে আট্‌কে পড়েছি—তোমরা দেরি কোর না—স্টেশনে চলে যাও।"—একটু পরে ডাঃ সেনের পুনঃ প্রবেশ।]

ডাঃ সেনঃ—এই দে'খ প্রমাণ। তুমি নিজেই পড়ে দেখো। [খাম থেকে দুখানা চিঠি বের করে দিলেন]

নিখিলেশ ঃ—(সাগ্রহে চিঠি দুখানা নিয়ে) চিঠি? কার চিঠি? —মনে হচ্ছে আমার বাবার হাতের লেখা। হ্যাঁ তাঁরই। কী লিখেছেন? কাকে লিখেছেন? আমি পড়তে পারি ডক্টর সেন?

ডাঃ সেন—আহা—তোমাকে পড়বার জন্যেই তো দিলাম। চেঁচিয়েই পড়ো। আমিও আর একবার শুনি। স্থির হয়ে বসে পড়ো—বি স্টেডি।

নিখিলেশঃ—(দ্রুত অথচ আবেগ কম্পিত কণ্ঠে পড়তে লাগলো)

শ্রদ্ধেয় সুরেশ্বর বাবু,

আপনার দয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ব্যাঙ্ক হইতেও আপনার নির্দেশসমেত চিঠি পাইয়াছি। মাসে মাসে দুইশত টাকা একটি শিশুর জন্য কোন মতেই খরচ হইতে পারে না। বুঝিলাম আপনি প্রকারান্তরে এই দরিদ্র পরিবারকে সাহায্য করিতে মনস্থ করিয়াছেন। কোনও চিন্তা নাই। সকলেই জানিবে এই শিশু আমাদের নিজস্ব সন্তান। আপনি শিশুটির জন্ম-বৃত্তান্তের জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। শিশু'মাত্রেই নির্দোষ। পঙ্ক হইতে জন্ম হইলেও পঙ্কজের গায়ে ক্লেদ থাকে না। আর এখনও তো আমাদেরই সন্তান। নাম রাখিয়াছি নিখিলেশ।.....

একান্ত বশংবদ

শঙ্করনারায়ণ রায়

(নিখিলেশের মুখ ধীরে ধীরে পাংশুবর্ণ হ'য়ে গেল। হাতটা কেঁপে উঠলো। ডাঃ সেনকে চিঠি দু'টো ফেরৎ দিলো।)

ডাঃ সেন—আর একখানা আছে বাবা—সন্দেহ মিটিয়ে নেওয়াই ভাল।

নিখিলেশ—(মাথাটা দু'হাতে চেপে রইলা কিছুক্ষণ)—না, আর দরকার নেই। সন্দেহ মিটেছে। এখন বলুন সুরেশ্বরবাবুর মতলবটা কী?

ডাঃ সেন—মতলব?

নিখিলেশ—হ্যাঁ মতলব। কী মতলবে তিনি আমাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন? কী মতলবে তিনি নিজের কাছে না রেখে, অথবা অনাথ আশ্রমে না পাঠিয়ে এই ভদ্রলোকের ওপর আমায় মানুষ করার ভার দিয়েছিলেন?

ডাঃ সেন—আহা—তোমাকে তো আগেই বলেছি—মমতা, করুণা, স্নেহ এগুলো মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি। নিজের বাড়ীতে স্ত্রীলোক ছিল না। আর অনাথ আশ্রমের ওপর ওর বিশ্বাস নেই, তাই তো শঙ্করবাবুকে তোমায় মানুষ করার ভার দিয়েছিল। সব জায়গায় মতলব খুঁজো না। (এগিয়ে এসে নিখিলেশের হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিলেন)

নিখিলেশ—আচ্ছা, মেনে নিলাম—আমাকে মানুষ করার জন্যে টাকা খরচের মধ্যে কোন মতলব ছিল না—ছিল বড় লোকের দয়াদাক্ষিণ্য। কিন্তু এতদিন গোপন রাখার পর, আজ যে আমায় জানাচ্ছেন আমি ডাস্টবিনে কুড়িয়ে-পাওয়া অবৈধ লালসার ফল, অবাঞ্ছিত মাংসপিণ্ড মাত্র,—এর মধ্যেও কী কোন মতলব নেই ডাক্তারবাবু? না, এ-ও বড়লোকের দয়া দাক্ষিণ্যের একটা নিদর্শন! (বিদ্রূপ ভরে হাসলো)

ডাঃ সেন—শোনো তা' হ'লে। তোমাকে ও কাছে রাখতে

চায়। তোমাকেও সত্যিই ভালবাসে। তুমি ওদের কন্‌সার্ন ছেড়ে চলে যাচ্ছো—সুরেশ এটা সহ্য করতে পারছে না। তোমার ভেতর সত্যি-কারের প্রতিভা আছে ওর ধারণা। সেই প্রতিভার বিকাশ ও দেখতে চায়।

নিখিলেশ—আমি যদি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য লীগের প্রচার সচিবের পদ ত্যাগ না করি—তবে আমি স্বর্গীয় শঙ্কর নারায়ণ রায়ের পুত্র। তা' না হলে আমি নামগোত্রহীন বাউণ্ডুলে। অর্থাৎ এই চিঠির জোরে সুরেশ্বরবাবু কেনা গোলাম করে রাখতে চান আমাকে!—সুন্দর মতলব!

ডাঃ সেন—আহা—তা' কেন হবে? তোমাদের ছেলে-ছোকরাদের কেমন একটা স্বভাব হয়ে গেছে, সব কিছু বাঁকা চোখে দেখা। [কাছে এসে] আমার কথা শোন বাবা—আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ এ খবর জানে না। চিঠিগুলো আমি তোমার সামনে পুড়িয়ে ফেলছি। তুমি সুরেশকে ছেড়ে যেও না। ও তোমাকে ওর কারবারের চারআনার অংশীদার ক'রে নেবে—আমাকে কথা দিয়েছে। চাও তো আজই লেখাপড়া হতে পারে। নাম-গোত্রহীন হয়ে তুমি সমাজের বাইরে ভেসে বেড়াবে—এ যে আমি ভাবতেই পারি না। (গলা ভিজে এলো)

নিখিলেশ—এতে কী আমার পরিচয় ঢাকা প'ড়ে যাবে? না। তা হয় না ডাক্তারবাবু।

(সুরেশ্বরের প্রবেশ। একটু আগে থেকেই পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে এদের কথা শুনছিলেন। চোখ-মুখ দেখে মনে হয় সান্ধ্য হুইস্কির মাত্রাটা একটু বেশি হয়েছে।)

সুরেশ্বর—কেন হ'বে না? টাকায় সব হয়। জানো তোমার মাসে আয় দাঁড়াবে কতো? টাকার পরিচয়ই মানুষের পরিচয়।

নিখিলেশ—(ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকালো। সুরেশ্বর বুঝতে পারলেন না।)—ডাক্তারবাবু আমি যাচ্ছি। আপনার স্নেহের কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে।

সুরেশ্বর—আর আমার কথা মনে থাকবে না বুঝি? যে এতদিন তোমার অন্নবস্ত্র জুগিয়েছে, স্কুল কলেজের খরচা জুগিয়েছে, তোমাকে চার আনার অংশীদার করে নিতে চাইছে—তার কথা মনে থাকবে না?

নিখিলেশ—আপনার দয়ার উপযুক্ত প্রতিদান না দেওয়া পর্যন্ত আপনাকে ভুলবো কী করে? অনাথ আশ্রমের মতো ইনভেস্টমেন্ট আপনারা কত পার্সেন্ট নিয়ে থাকেন আমি জানি। হিসেবের শেষ নয়া পয়সাটি পর্যন্ত আমি ফেরৎ দেবো—এখন যাই।

সুরেশ্বর—দাঁড়াও। (আদেশের সুরে) দর বাড়াচ্ছো? শোনো। (নিখিলেশ ফিরে তাকালো) কী চাও তুমি? না, না,—। ব'ল্‌তেই হবে, তুমি কী বড় হতে চাও না? মান-সম্মান-প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা—কিছুই চাও না? ক্ষমতাও চাও না? প্রচুর ক্ষমতা কেনবার মতো টাকা আছে আমার নিখিলেশ! আর একটা যুদ্ধ না বাধলে যতই তোমার প্রতিভা থাক—তত টাকা তুমি কোনদিন রোজগার করতে পারবে না।

ডাঃ সেন—(এতক্ষণ দূরে সরে দাঁড়িয়ে এদের কথা শুনেছিলে এবার এগিয়ে এলেন) টাকা দিয়ে অনেক ভাল কাজ করা যায় বাবা—

ডাঃ সেন—

সুরেশ্বর—পরিচয়ের জন্যে ঘাবড়াচ্ছ? আমি তোমাকে পোষ্য নিয়ে আমার পরিচয় তোমাকে দেব। তুমি যেও না—থাকো।

নিখিলেশ—আপনার প্রতি আমার ঘৃণা তাতে একটুও কমবে না। আপনার সাম্রাজ্য গড়ায় আমার সাহায্য আপনি কিছুতেই পাবেন না। টাকা দিয়ে মানুষ কেনা যায়—মনুষ্যত্ব কেনা যায় না।

সুরেশ্বর—না না—কিনতে আমি চাই না তোমাকে। নিও না তুমি টাকা। নাইবা নিলে আমার পরিচয়। তুমি থাকো—শুধু থাকো—আমার কাছে থাকো।

(এগিয়ে এসে নিখিলেশের কাঁধে হাত রাখলেন)

নিখিলেশ—চমৎকার অভিনয়! (ছাড়িয়ে নিয়ে প্রস্থান)

সুরেশ্বর—(উত্তেজিত) নিখিল—নিখিলেশ—

(পেটে হাত দিয়ে ধীরে ধীরে বসে পড়লেন। মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠলো--ডাঃ সেন ছুটে এলেন)

ডাঃ সেন—কী হলো ? সেই গ্যাস্ট্রিক পেনটা বুঝি ? কতবার বলেছি—তোমার উত্তেজনা সইবে না। চলো—ভেতরে চলো—complete rest !

সুরেশ্বর—(একটু হেসে) আরে না, না—ঠিক আছে।

(নিজেকে সামলে নিলেন)

(সুখময়ের প্রবেশ)

সুখময়—ডাঃ হীরক দে !—বল্‌ছেন খুব জরুরী।

সুরেশ্বর—আসতে দাও। (হীরক দে'র প্রবেশ)—

হীরক—আমায় বিদায় দিতে হবে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য লীগের গবেষণা বিভাগের কাজে আমি ইস্তফা দিতে চাই।

(পদত্যাগ পত্র দিলেন)

সুরেশ্বর—তোমার রিসার্চের জন্যে এই সেদিন দশ লাখ টাকা মঞ্জুর হলো। ভালো। অন্য কোথাও যদি বেশি মাইনের কাজ পেয়ে থাকো আমাদের আপত্তি নেই। তবে রিসার্চ লাইন ছেড়ে দেওয়া কী ভালো হচ্ছে ?

হীরক—আজ্ঞে না—রিসার্চ ছাড়ছি না। তবে বিষয়বস্তুটা বদলাচ্ছি। (প্রস্থান)

সুরেশ্বর—সুখময়, প্রফেসরকে ফোন করেছিলে ?

সুখময়—কয়েকবার—সব বারই 'নো রিপ্লাই' হয়েছে।

সুরেশ্বর—তুমি তোমার কাজে যাও।—নিখিলেশের—বোর্ডিঙে। বুঝলে ? সুখময়ের প্রস্থান)

ডাঃ সেন—মেয়েকে বড় ভালবাসতো সান্যাল। মেয়ের জন্যে পাগল না হয় !

সুরেশ্বর—ভুল ডাক্তার, ভুল। ও ভালবাসতো ওর মতবাদকে, বলতে পারো—নিজেকে। মতবাদের সিঁড়ি বেয়ে ও উঁচুতে উঠতে চেয়েছে—বড় হতে চেয়েছে। বড় হবার প্রেরণা যার রক্তে, তার কাছে আর সব আকর্ষণ তুচ্ছ।

ডাঃ সেন—স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা—এগুলোকে তুমি উড়িয়ে দিতে চাও নাকি ? আমায় ফাঁকি দিতে পারবে না সুরেশ। নিজের চোখেই তো দেখলাম, ওই নিখিলেশ ছেলেটির জন্যে তোমার কতখানি দরদ ! অথচ ব'লতে গেলে। ও তোমার কেউ নয়। আরে মানুষের মজ্জার মধ্যে থাকে ভালবাসার তাগিদ।

(সুরেশ্বর আলমারি থেকে সোডা ও হুইস্কি নিলেন)

ডাঃ সেন—আজ বড় বাড়াবাড়ি করছো সুরেশ। না—আর হুইস্কি চলবে না। শেষটায় একটা সর্বনাশ না ক'রে ছাড়বে না।

(সুরেশ্বর হুইস্কি ঢেলে এক চুমুকে সব খেয়ে আবার ঢাললেন)

সুরেশ্বর—এই একটা সন্ধ্যে আমার প্রেস্‌ক্রিপসন্ চলুক ডাক্তার ! কাল থেকে আবার তোমার patient হ্যাঁ—কী বল্‌ছিলে ? স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা ! সাধারণ মানুষের কাছে এগুলোর দাম থাকতে পারে। কিন্তু যে অসাধারণ—তার কাছে ওগুলো দুর্বলতা। সে গৌরীশৃঙ্গের মতো নিঃসঙ্গ আর নিরুত্তাপ !

ডাঃ সেন—তুমি যা তা বক্‌ছো। চলো, তুমি ভেতরে গিয়ে বিশ্রাম করবে চলো। আমিও যাই।

সুরেশ্বর—না না—তোমায় শুনতেই হবে। বড় হবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে বলেই জীবনে এত আকর্ষণ। একবার এ নেশায় মাতলে স্নেহ-প্রেম-ভালবাসার বাঁধন ক্রমশ আলগা হয়ে যায়। তখন আর থামবারও উপায় থাকে না। থামলেই আর একজন এগিয়ে যাবে--তোমায় ভেঙে চুরে গুঁড়িয়ে দিয়ে।

ডাঃ সেন—সুরেশ—আমার কাজ আছে। আমি যাই। বোতলটা নিয়ে যাচ্ছি। [ডাক্তার দাঁড়ালেন]

সুরেশ্বর—না ডাক্তার, এখন তোমার যাওয়া চল্‌বে না। (উঠে দাঁড়িয়ে ডাক্তারের হাত ধরে বসিয়ে দিলেন) একটা গল্প বলি শোন--

তিরিশ বছর আগের কথা। পৃথিবীময় মন্দা। সেই মন্দার বাজারে আচার্যদেবের আশীর্বাণী নিয়ে মিশন রো'তে অফিস খুললো এক ভদ্রলোক। চোখে তার বড় হবার স্বপ্ন। মূলধন—আশা, সাহস আর বিশ্বাস। সততা, সোজাবুদ্ধি আর পরিশ্রম—এই তিন হাতিয়ার নিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করেও সে ভাগ্যের দরজা খুলতে পারলো না। দেশের জমিজমা, স্ত্রীর গহনা—সবই একে একে গেল ফাট্‌কা বাজারে। স্ত্রী ছিলেন যেমন সুন্দরী তেমনি বুদ্ধিমতী।—অনেক বোঝালেন।

বললেন—'চলো, গ্রামে গিয়ে মাস্টারি করবে। দুজন তো লোক। আমাদের ভাবনা কী?" তখন স্বায়ত্তশাসনের সাথে সাথে দেশী ঠিকাদারেরা পেয়েছে নতুন রক্তের স্বাদ। তারা তখন স্বপ্ন দেখছে—যুদ্ধ বাধবে, হাওয়ায় নোট উড়বে—ফারপো-কাসানোভায় রঙের স্রোত বইবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার নেশা ওকে পুরোদস্তুর পেয়ে ব'সলো (একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে হুইস্কি পান করতে লাগলেন)।

(সুখময়ের প্রবেশ)

সুখময়—স্যার!

সুরেশ্বর—হ্যাঁ, কিছু পেলে সুখময়?

সুখময়—আজ্ঞে না, ওর বিছানাপত্তর সবই তো খুঁজে দেখলাম। হোটেলের ম্যানেজার আমায় ওর বন্ধু ব'লেই জানে। কিছু আপত্তি করেনি।

সুরেশ্বর—শৈলেন ফিরেছে 'দেশদূত' অফিস থেকে?

সুখময়—না

সুরেশ্বর—তুমি যাও—বাইরের ঘরে অপেক্ষা করো। শৈলেন এলেই পাঠিয়ে দেবে। আর কেউ এলে আমি বাড়ী নেই—বুঝলে?

(ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে সুখময়ের প্রস্থান)

সুরেশ্বর—(ডাঃ সেনকে)—শেষ পর্যন্ত দরজা খুল্‌লো। তোমরা ব'লবে ভাগ্যের—আমি বল্‌বো বুদ্ধির। শুধু ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠিটা বদলাতে হলো। ও মাপকাঠিটা তো মানুষেরই তৈরী। তবে, ওর নীতিজ্ঞানের সঙ্গে স্ত্রীর নীতিজ্ঞানের মিল হলো না। সেইখানে বাধলো সঙ্কট! (আবার হুইস্কি পান। ডাক্তার সেন উঠে দাঁড়ালেন)। হ্যাঁ-শোন, উঠলে চল্‌বে না। সত্যি-কারের যুদ্ধ বাধলো। ততদিনে কুবেরের ভাণ্ডারের চাবি এসে গেছে ওর হাতে। শেয়ার মার্কেট থেকে শিল্প-সম্রাট হবার পথে পা বাড়িয়েছে। ফোর্ড-রক-ফেলার ওর চোখের সামনে। ধাপে ধাপে ওর উন্নতি হচ্ছে। কিন্তু কুবেরদেবের চাই নিত্য নতুন উপাচারে পুজো। সেই পুজোর হোমানলে একদিন স্ত্রীকে আহুতি দিতে হলো। বড় হবার প্রবৃত্তি এমনি জোরালো!

ডাঃ সেন—কী ব'লছো তুমি সুরেশ?

সুরেশ্বর—চমকে উঠ্‌লে যে? (জড়িত স্বরে) স্ত্রীপণ রেখে যুধিষ্ঠিরকেও জুয়া খেলতে হ'য়েছিল। মহাভারত পড়নি? তবে এ বস্ত্র হরণের পালায় লজ্জা নিবারণের জন্যে কোন শ্রীকৃষ্ণের পার্ট ছিল না—এইটুকুই যা তফাৎ?

(শৈলেনের প্রবেশ)

শৈলেন—যা' ভেবেছিলাম—ফাইলটা 'দেশদূতে'র অফিসে নেই। ওদের মুখ বন্ধ থাক্‌বে নিশ্চয়ই। কিন্তু খবর পেলাম কালকেই এমন এক জায়গায় ওটা পৌঁছতে পারে, যেখান থেকে লাখ লাখ টাকা দিয়েও ওটা ছাড়িয়ে আনা যাবে না। ফাইলটা এখনও নিখিলেশের হেফাজতেই আছে।

সুরেশ্বর—[উঠে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে পায়চারী করলেন। আরও খানিকটা হুইস্কি গলায় ঢাললেন] হুঁ, আর কিছু বল্‌বে?

শৈলেন—শুনলাম নিখিলেশ আজই ফাইলটা নিয়ে দিল্লী যাচ্ছে। সদানন্দবাবুর বন্ধু এম্. পি.র হাতে পড়লে—পার্লামেণ্টে সে একটা হৈচৈ তুলে দেবে। একটা Top-level Enquiry Commission বস্‌বেই।

সুরেশ্বর—[সহসা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন] Enquiry Commission—Impossible! কিছুতেই বসতে দেওয়া হবে না। দিল্লীতে পাঠাও সুখময়কে। হিসেবের ভুল হয়ে গেছে! কিন্তু শোধরাতে হবে। At any price—at any cost! নিজের হৃদ্‌পিণ্ডের বিনিময়েও। [কিছুক্ষণ থেমে উদ্‌ভ্রান্তের মতো] ওই ফাইল আমাদের চাই, বুঝলে শৈলেন, ওই ফাইল আমাদের চাই-ই! [জনান্তিকে] হয় ফাইল—না হয় নিখিলেশকে। যাও এখুনি সোরাব খাঁ আর তেওয়ারীকে নিয়ে। সমিতির অফিসেই ওকে পাবে।

শৈলেন—প্রয়োজন হয় যদি—

সুরেশ্বর—হুঁ। প্রয়োজন হলে সবই করতে হবে। শুধু আমার নয়। তোমার-আমার-সূর্যনারায়ণ-শিবশঙ্কর

—সকলের স্বার্থের জন্যে—প্রয়োজন হলে—[একটা বিশেষ ইঙ্গিত করলেন] ও ফাইল আমার চাই-ই।

(শৈলেনের প্রস্থান)

ডাঃ সেন—তুমি কী ক্ষেপে গেলে সুরেশ ? কী বল্‌ছিলে ? প্রয়োজন হলে—তোমার একটা ফাইলের জন্যে কী করতে চাও তুমি ?

সুরেশ্বর—[হেসে] শুনেছো তা' হলে ? জীবন-সংগ্রাম বড় নিষ্ঠুর ডাক্তার। সেখানে শেষ কথা প্রয়োজন। প্রয়োজনের জন্যে একদিন নিখিলেশের মাকে আহুতি দিতে হয়েছিল—সেটা সাম্রাজ্যের আদিপর্বে। আজ হয়তো নিখিলেশের পালা—সাম্রাজ্যের বিস্তার পর্বে।

ডাঃ সেন—তুমি—তুমি ! [হতভম্ব]

সুরেশ্বর—হ্যাঁ। আমিই সেই মিশন রো'র স্টক-ব্রোকার ! ওর মা যখন আত্মহত্যা করলো, ও তখন বছর খানেকের শিশু। রেখে এলাম মিথ্যে পরিচয় দিয়ে বেনারসে শঙ্কর রায়ের হেফাজতে। রটিয়ে দিলাম আমার ছেলে মারা গেছে। বড় হয়ে পাছে সে মায়ের আত্মহত্যার রহস্য নিয়ে মাথা ঘামায়—এই ভয়ে !

ডাঃ সেন--[উত্তেজিত] উঃ ! কী সাজ্ঘাতিক, এ যে ভাবাও যায় না। তোমার সোরাবদের ফিরিয়ে আনো —তোমায় মিনতি করছি সুরেশ। তুমি তো মানুষ, এত নিষ্ঠুর তুমি হতে পারো না।

সুরেশ্বর—না, তা' হয় না। একজনের জন্যে আমরা সবাই নষ্ট হতে পারি না। না। নিখিলেশের জন্যেও না। [উঠে দাঁড়িয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে] আর সাধারণ মানুষের দুর্বলতা আমার নেই। আমি যে সাম্রাজ্য গড়ছি। আমার দিগ্বিজয়ের রথ সব কিছু ভেঙে চুরে গড়গড় করে চলেছে। থামানো যায় না।

ডাঃ সেন—দোহাই তোমার ! ওই সর্বনেশে রথ যেমন করে হোক্ থামাও। পাগ্‌লা প্রফেসরের অদ্ভুততত্ত্বের হাতিয়ার দিয়ে বিশ্ব জয় হবে না। ইতিহাসের গতি তোমরা রোধ করতে পারবে না।

সুরেশ্বর—হয়তো তোমার কথাই সত্যি। ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞান, কেইন্‌সের ধনবিজ্ঞান—আর হয়তো আমাদের বাঁচাতে পারবে না। [নিজের মনে মনে] তা ছাড়া যারা বড় হতে চায় না, যাদের লোভ নেই—তারা বোধহয় মৃত্যুকেও ডরায় না। তাদের সঙ্গে লড়াই চলে না। কিন্তু ফেরার পথ যে বন্ধ। আমাদের শেষ পর্যন্ত লড়তে হবে।

ডাঃ সেন—পারবে না, সুরেশ, পারবে না। তোমার রথই গুঁড়ো হবে। এখনও সময় আছে।

সুরেশ্বর—[দুর্বলতা দূর করার চেষ্টায়] না, না—পেছু হটা চল্‌বে না। নতুন তত্ত্বের হাতিয়ার আবিষ্কার করবে নতুন শিবশঙ্কর-হীরকের দল। তাই নিয়ে করবো বিশ্বজয়।

ডাঃ সেন—কী যা তা বকছো মদের ঘোরে। তোমার সাকরেদদের ফেরাও, সুরেশ—ছেলেটাকে বাঁচাও।

নেপথ্যে যন্ত্র সংগীত শোনা গেল। সুরেশ্বরবাবু ভুল দেখ্‌ছেন, ভুল শুনছেন। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের মিছিলের ছবি তাঁর চোখে ভেসে উঠ্‌লো। বন্ধ জানলার কাঁচের ওপর ছায়া পড়লো। যেন হাজার হাজার কালো-পীত-বাদামী রঙের মানুষ দলবদ্ধ হয়ে হাজার হাজার মুঠি আকাশে তুলেছে। তারা আর সাম্রাজ্যবাদের মুনাফার শিকার হতে চায় না। সেই সব শ্লোগান—সেই সংগীত। তবে শব্দ অনেকটা অস্পষ্ট ও চাপা সুরেশ্বরবাবু জানলার দিকে এগিয়ে গেলেন।)

সুরেশ্বর—[কেমন যেন বিভ্রান্ত বোধ করছেন] কী চায় ওরা ? সংখ্যায় এত কেন ওরা ? ওরা কী রক্তবীজের বংশধর ? অনাহার-মহামারী-যুদ্ধ—কিছুতেই কী ওরা শেষ হবে না ? ডাক্তার—ডাক্তার—আইখম্যান্‌দের খবর দাও।

ডাঃ সেন—সুরেশ—সুরেশ—কী হয়েছে তোমার ?

(কাঁধ ধরে নাড়া দিলেন)

সুরেশ্বর—[হঠাৎ যেন ঘোর কেটে গেল। ডাঃ সেনের দিকে তাকিয়ে] এ্যাঁ ? কার কথা বল্‌ছিলে ? কাকে বাঁচাবো ? ডাক্তার আমি বাঁচাতে জানি না। শুধু বাঁচতে জানি। (আবার Hallucination দেখছেন, স্থির চোখে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে] সংখ্যায় ওরা বড় বেড়েছে। কিছু ভার কমুক। বাধা দিও না।

ডাঃ সেন—আঃ। তোমার কি বোধশক্তিও লোপ পেয়েছে? নিখিলেশ যে তোমার সন্তান—তোমার একমাত্র সন্তান। [সুরেশ্বরের হাত চেপে ধরে]

সুরেশ্বর—[চমকে উঠে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে]—না-না—নিখিলেশ আমার কেউ নয়। নিখিলেশ আমার শত্রু। আমারই রক্তের মধ্যে লুকিয়েছিল আমারই ধ্বংসের বীজ। আমার মরণকাঠি আমিই এতদিন লালন করেছি। না না, ও মরবে। [পায়চারী করতে করতে হঠাৎ ম্যাডোনার ছবির ওপর দৃষ্টি পড়লো] এ কে?...এ কে? স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা—না-না, সাধারণ মানুষের দুর্বলতা আমার নেই। এ—কী? অন্ধকার হয়ে আস্‌ছে কেন? আলোগুলো নিভিয়ে দিচ্ছে কেন? আলোগুলো জ্বালিয়ে দাও—আলো জ্বালাও।

(নেপথ্যে যন্ত্র সংগীত আরও জোরালো হয়ে উঠলো। সুরেশ্বর আরও অস্থির হয়ে উঠ্‌লেন। তিনি চীৎকার করে উঠ্‌লেন)

.....সাধারণ মানুষের দুর্বলতা আমার নেই। আমি যে সাম্রাজ্য গড়ছি। আমি যে সম্রাট!

[বুকে হাত চেপে ব্যথায় ও বেদনায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন]

(ডাঃ সেন অস্থির হয়ে চেঁচাতে লাগলেন

—সুখময়, দারোয়ান,—আমার ব্যাগ—আমার ব্যাগ)—

—যবনিকা—

ভ্রম সংশোধন

১। ৯ এর পাতায় "ঘরের দৃশ্য" এর পর হবে সুরেশ্বর কি বলছে ও?

২। ১০ এর পাতায় দ্বিতীয় কলমে কবি আহা.....

আমাদের কাব্যে। এর পর "হয়ত ঠিক বোঝাতে পারছি না" হবে এবং সুখময়ের বক্তব্য হোক বুঝেছি এর পর "হয়ত ঠিক বোঝাতে পারছি না।"হবে না।

পরিভাষা

পাঠকদের অনুরোধক্রমে যানবমনে এ যাবৎ যে সমস্ত পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তার একটি সংকলন নিম্নে দেওয়া হল।

Adaptation—অভিযোজন
Afferent—অন্তর্বাহী, অন্তর্মুখ
Alimentary—খাদ্যমূলক
Analyser—বিশ্লেষণী স্নায়ু
Animism—সর্বপ্রাণবাদ
Association—অনুষংগ
Axon—দীর্ঘতন্তু

Basal Fund of reflex acts—মৌল পরাবর্ত সমষ্টি
Biocurrent—জৈবতরংগ

Catalyst—অনুঘটক
Cerebral Hemisphere—গুরুমস্তিষ্ক
Cerebral Cortex—মস্তিষ্ক বল্কল
Sub-cortex—নিম্ন-মস্তিষ্ক
Cerebellum—লঘুমস্তিষ্ক
Central Nervous System—কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বা সংস্থা
Lower part of Central Nervus System—
কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের নিম্নতর অংশ, মেরুমজ্জা
Centrifugal—কেন্দ্রাতিগ
Centripetal—কেন্দ্রাভিগামী
Choleric—হঠকারী, রগচটা
Cellular Pathology—কোষ-ভিত্তিক বিকার তত্ত্ব
Cranium—করোটিকা

Delusion—ভ্রান্তিরোগ
Dendrites—হ্রস্বতন্তু
Eccentricity—উৎকেন্দ্রিকতা
Efferent—বহির্বাহী
Emotion—প্রক্ষোভ

Equilibrium—স্থিতিসাম্য
Eugenics—সৌজাত্যবিদ্যা
Extinction—বিলুপ্তি
Excitation—উত্তেজনা
Excitatory process—উত্তেজনা-ক্রিয়া
Functional Symptoms—যন্ত্রের বিকলতাজনিত উপসর্গ
Generalisation—সামান্যীকরণ
Hallucination—
Heredity—কুল সংক্রমণ
Higher Nervous Activity—উচ্চতর স্নায়ুপ্রক্রিয়া
Inhibition—নিস্তেজনা
External inhibition—বহিরাগত নিস্তেজনা
Internal inhibition—অন্তর্জাত নিস্তেজনা
Inhibitory Zone—নিস্তেজনা গণ্ডী
Protective inhibition—প্রতিরক্ষামূলক নিস্তেজনা
Extinctive inhibition—বিলুপ্তিমূলক নিস্তেজনা
Intrapsychic conflict—আন্তর্মানসিক দ্বন্দ্ব
Instinctual activity—সহজাত আদিম জৈবক্রিয়া
Intregration—সমাসীকরণ
Internal organ—আন্তরযন্ত্র
Inert—অনড়
Ligament—বন্ধনী
Melancholic—বিষণ্ণ, বিমর্ষ
Metabolism—পরিণাম-ক্রিয়া
Motor function—চেষ্টিয় প্রক্রিয়া।
Morphology—অংগসংস্থান বিদ্যা
Mobility—গতিময়তা
Negative—নৈঞর্থক, নিস্তেজক

Obsession—আচ্ছন্নতা
Olfactory—ঘ্রাণবাহী
Organism—জীবদেহ, জীবতন্ত্র
Phelegmatic—সংযত-সুস্থির, আত্মপ্রতিষ্ঠ
Psycho-physical parallelism—
দেহ-মন সমান্তরালবাদ
Psychic Secretion—মানসিক ক্ষরণ
Progressive mascular atrophy—
পেশীতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান ক্ষয়
Positive—সদর্থক, উত্তেজক
Reflex—পরাবর্ত, প্রতিবর্তন-ক্রিয়া
Conditioned reflex—শর্তাধীন পরাবর্ত
Uncondition reflex—শর্তহীন পরাবর্ত
Motor reflex—চেষ্টিয় পরাবর্ত
Secretory reflex—ক্ষরণ পরাবর্ত
Reticular system—সূক্ষ্মজাল তন্ত্র
Reciprocal induction—পারস্পরিক আবেশ বা আবেগ
Region of Speech—(মস্তিষ্কের) বাচনক্ষেত্র
Reinforce—উজ্জীবিত করা
Receptor—গ্রাহীকেন্দ্র
Salivary gland—লালা গ্রন্থী
Sanguine—সবল-প্রাণচঞ্চল
Sensation—সংবেদন
Sensory—সংবেদীয়
Simulation—অনুকরণ
Signal—সংকেত
First Signalling System—প্রথম সাংকেতিক তন্ত্র
Second Signalling System—দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্র
Stimulus—উদ্দীপক
Synthesis—সমন্বয়
Synapse—সংযোগ সেতু
Subject—বিষয়ী
Subjective—বিষয়ীগত, আত্মবাদী
Twilight sleep—প্রদোষ-নিদ্রা
Ultra-paradoxical phase—অতি স্ববিরোধী অবস্থা
Vegetative Nervous System—অক্রিয় স্নায়ুকেন্দ্র

মানব-মনে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর

সংকলন

প্রথম সংখ্যা—আগষ্ট, ১৯৬১

সূচীপত্র

ভূমিকা ৩
মনোভূমি তথা সংস্কার
—অরুণা হালদার ৫
নারী-পুরুষের মানসিকতার পার্থক্য বিশ্লেষণ
—সবিতা মুখোপাধ্যায় ১৩
পিয়ের জেনেটর ভাববাদ সম্পর্কে
—আই, পি, পাভলভ ১৮
[উশ্রীগঙ্গোপাধ্যায় অনুদিত]
বিবাহ কালীন মনোবিকার
—ডাঃ অজিত দেব ২২
শিশুর উচ্চতর স্নায়ু প্রক্রিয়ার ক্রমবিকাশের বৈশিষ্ট্য
– লিও অরবেলি
[অরুণ চক্রবর্তী অনুদিত] . . . ২৫
যক্ষা রোগীর মন —ডাঃ সন্তোষ দাস . . ৩৩
ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত
—আব্দুল করিম ৪০
ভারতে আর্য্যসভ্যতার ক্রমবিকাশ
—ডঃ জানকী বল্লভ ভট্টাচার্য্য ৪৬
কমলাকান্তের মন
—গোপাল হালদার ৫১
পাভলভ পরিচিতি (১)
—ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৫৫

মানবমন : ১ম বর্ষ ৪র্থ বিশেষ গাঙ্গুলি সংখ্যা
আশ্বিন ১৩৬২

সূচী

১। শ্রদ্ধার্ঘ্য - ... ১
২। মানবমনের ক্রমবিকাশ - (২) - মনোবিৎ ... ৫
৩। পুরাণের নব মূল্যায়ন - সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার ... ১১
৪। মনের কথা ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ... ১৯
৫। মনোবিৎদের ডায়েরী থেকে (১) ... ২২
৬। আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়া - প্রমোদসেন গুপ্ত - ২৯
৭। যুদ্ধ, শান্তি ও মানবধর্ম : সমাজসমীক্ষা ... ৪১
পরা মানসিকতার রূপায়ণে ইতিহাসের ভূমিকা
— স্নেহময় আচার্য্য ... ৪৯
৮। শিক্ষার্থী সমাবর্তন পরীক্ষা নিরীক্ষা ও কোয়েলারের মতবাদ
— আর, পি, পাঙ্গুলি ৬০
৯। মনস্তত্ত্ব ও সুস্থ সমীক্ষা সমাজে ব্যক্তির উন্নয়ন
— তরুণ চট্টোপাধ্যায় ৬৪
১০। সম্রাট — নাটক - ধীরেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী ৭০
৭০-৭২ (১-৪২)
১১। পরিভাষা ক খ
১২। ১ম থেকে ৫ম সংখ্যার সূচীপত্র খ গ

— ০ —

বিশেষ পাভলভ সংখ্যা

দ্বিতীয় সংখ্যা—অক্টোবর, ১৯৬১

পাভলভ স্মরণে :৫
মনের কথা (১) —:৭ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
বেদনারহিত সন্তান প্রসব—:৯ ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ —:১৫ ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
প্রাচীন আর্য-সমাজে —
নারী ও পুরুষ —:২৫ ডঃ জানকী বল্লভ ভট্টাচার্য
ঘুমের শারীরবৃত্ত সম্বন্ধে —
কয়েকটি তথ্য — :৩০ আই. পি. পাভলভ
মানব-মস্তিষ্ক —:৩৫ সবিতা মুখোপাধ্যায়
পর্দার উপর মস্তিষ্কের জৈব
বিদ্যুৎ প্রবাহের ছবি —:৪২ সমর গুপ্ত
মানুষ ও স্বয়ং চালিত যন্ত্র —:৪৫ তরুণ চট্টোপাধ্যায়
শিক্ষণে মনোবীক্ষণ —:৫০ আবদুল করিম
পাভলভ পরিচিতি(২) :৫৬ ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
মনরোগের কারণ নির্ণয়(১)—:৬০ মনোবিদ

ত্রৈমাসিক

তৃতীয় সংখ্যা—জানুয়ারী, ১৯৬২

১মখণ্ড ১ম সংখ্যা

পাভলভ গবেষণাগারে দুইদিন:১—ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
পাভলভ পরিচিতি(৩) :৯—ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থায় ফ্রয়েডবাদ
ও প্রয়োগবাদ:১৫ প্রমোদ সেনগুপ্ত
মনরোগের কারণ নির্ণয়(২) :২১ —মনোবিদ
:২৬ জনাতঙ্ক—অধ্যাপিকা অমিয়া গঙ্গোপাধ্যায়
মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে :৩২ —এম, ইয়ানোফস্কায়া
[সবিতা মুখোপাধ্যায় অনুদিত]
মানসিক শ্রমের বৈপ্লবিক রূপান্তর:৩৬—তরুণ চট্টোপাধ্যায়
প্রক্ষোভ :৪০—দোসেন্ত, পে, এম, ইয়াকবসন
[অরুণ চক্রবর্তী অনুদিত]
শিল্পধর্মী ও চিন্তাধর্মী মস্তিষ্ক সম্পর্কে
:৪৬ —আই, পি, পাভলভ
মনের কথা (২) :৪৯ —অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
জীব ও জীবাণু :৫১ —ডাঃ সন্তোষ কুমার দাশ
পুস্তক পরিচয় :৫৪ —ডাঃ অরুণা হালদার
সম্পাদকীয় :৫৯

১মবর্ষ ২য় সংখ্যা

চতুর্থ সংখ্যা—এপ্রিল, ১৯৬২

সম্পাদকীয় :৭১
পাভলভ পরিচিতি(৪) :৭৩ —ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
দশচক্রের গবেষণা :৭৮ —মানসী দাশগুপ্তা
শেরিংটনের ভাববাদী চিন্তা সম্পর্কে
:৮৩ —আই, পি পাভলভ
[পরিতোষ গুপ্ত অনুমদিত
আধুনিক উপন্যাসে বিভ্রান্তি ও আতঙ্কের সুর
:৮৯ —সমালোচক ঘোষ
মনরোগের কারণ নির্ণয়(৩) :৯৩ —মনোবিদ
মানসিক ক্রমবিকাশ :১০০—ডঃ দ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়
জাতির মানসিকতার রূপায়ণে ইতিহাসের ভূমিকা
:১০৪ —আবদুল করিম
পাভলভ ও বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ :১০৮ —
জীবনদর্শন ও চিকিৎসা বিজ্ঞান :১১২ —ইউ আখ্‌মেরভ
[ডাঃ সোমনাথ মুখার্জী অনুমদিত]
আমেরিকার স্কুলশিক্ষায় প্রয়োগবাদের ফলাফল
:১১৭ —প্রমোদ সেনগুপ্ত
পুস্তক সমালোচনা :১২৬ —ডাঃ জ্যোতির্ময় শর্মা

১মবর্ষ ৩য় সংখ্যা

পঞ্চম সংখ্যা—জুলাই, ১৯৬২

সম্পাদকীয় :৯
ইয়ারকস্ ও কোয়েলারের চিন্তাধারা সম্পর্কে
:১২ —আই, পি, পাভলভ
(পরিতোষ গুপ্ত অনুদিত)
উপজাতিদের সঙ্ঘ চেতনা
:১৭ —সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার
মানবমনের সুস্থতা ও বিকার(১)
:২৫ — ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
পৃথিবীতে প্রাণের সূচনা
:২৯—জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়
মানবমনের ক্রমবিকাশ(১) :৩৪ —মনোবিদ
মাধ্যমিক শিক্ষায় আমেরিকা, ভারত ও সোবিয়েত
:৪২ —প্রমোদ সেনগুপ্ত
মনোরোগীর স্বরূপ নির্ণয়
:৬৫ —ডাঃ অজিতকুমার দেব

১মবর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

ষষ্ঠ সংখ্যা — অক্টোবর ১৯৬২

এই সংখ্যার প্রচ্ছদের পরে দ্রষ্টব্য * *

নবারুণের কয়েকটি সেরা বই

১। রবীন্দ্র শিশু সাহিত্য পরিক্রমা Rs. 5·00
—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

২। মহাশূন্যের পথে Rs, 2·50
—শ্রীশৈলেন ভট্টাচার্য

৩। ইংরেজি সাহিত্যের রূপরেখা Rs. 5·00
—অধ্যাপক গোপাল হালদার

৪। মহাকাব্য-জিজ্ঞাসা Rs. 3·50
—ডাঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য

নবারুণ প্রকাশনী

সি ৫১, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

With the best compliments from—

ANNA & COMPANY

registered office
167A PARK STREET
CALCUTTA 17

city office
11 C R AVENUE
CALCUTTA 13

TELEPHONES { 23 3889
44 2011
34 4917

সম্পাদক—ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সহঃ সম্পাদক—অরুণ চক্রবর্তী

ডাঃ জ্যোতির্ময় শর্মা কর্তৃক অভ্যুদয়, সূর্য সেন ষ্ট্রীট, কলি-৯ থেকে মুদ্রিত ও ডাঃ সোমনাথ মুখার্জি কর্তৃক

BOOKS FROM MOSCOW

Medical Science

I. P. PAVLOV
Psychopathology and Psychiatry (Selected works) 8·19

I. SECHENOV :
Selected Physiological and Psychological Works 8·62

A. IVANOV :
Essays on the Pathophysiology of the Higher Nervous Activity 2·87

Chinese Therapentical Methods of Accupuncture and Moxibuston 0·50

M. GRASHCHENKO & LISITSYN :
Achievements of Soviet Medicine 0·50

V. ZEBNIN :
Strengthen Your Heart 1·87

K. PLATONOV :
The World as a Physiological and Therapeutic Factor 9·37

Popular Science

Y. PERELMAN :
Physics for Entertainment 3·00
Astronomy for Entertainment 2·00

LEV POTKOV :
A World We Do Not See 0·94

A. FERSMAN :
Geochemistry for Everyone 4·44

N. KOLOBKOV :
Our Atmospheric Ocean 4·62

M. NESTURKH :
The Origin of Man 6·25

M. KORSUNSKY :
The Atomic Nucleus 3·00

O. SCHMIDT :
A Theory of Earth's Origin 1·25

Read & Subscribe Soviet Periodicals

SOVIET UNION (Pictorial Monthly in English, Hindi, Urdu)
Per Copy 0·75 Annual 6·75 2 Yrs, 10·00

SOVIET WOMAN (Pictorial Monthly in English & Urdu)
Per Copy 0·50 Annual 4·25 2 Yrs. 6·00

SOVIET LITERATURE (Monthly)
Per Copy 0·62 Annual 6·00 2 Yrs 9·00

SOVIET FILM (Monthly)
Per Copy 0·75 Annual 6·75 2 Yrs. 10·00

INTERNATIONAL AFFAIRS (Monthly)
Per Copy 0·75 Annual 6·75 2 Yrs. 10·00

CULTURE & LIFE (Monthly)
Per Copy 0·62 Annual 6·00 2 Yrs 9·00

NEW TIMES (Weekly)
Per Copy 0·19 Annual 6·00 2 Yrs. 9·00

MOSCOW NEWS (Weekly)
Per Copy 0·10 Annual 5·00 2 Yrs. 7·50

NATIONAL BOOK AGENCY PRIVATE LTD.

12, BANKIM CHATTERJEE STREET, CALCUTTA-12

172 Dharamtala Street, Calcutta-13

Nachan Road, Benachity, Durgapur-4